আল্লাহ্ ও তাঁর গুণাবলী

واحد ہے لاشریک ہے اور لازوال ہے
سب موت کا شکار ہیں اسکو فنا نہیں

‘এক সে এবং অংশীবিহীন, আর সে অবিনশ্বর,
সবাই মৃত্যুর শিকার শুধু লয়হীন সে নিরন্তর।’

প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্দী
হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ কাদিয়ানী (আঃ)-এর
অমৃত বাণীর ভাণ্ডার থেকে আহরিত

ভাষান্তর ঃ শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান

প্রকাশনায় ঃ
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

প্রকাশকাল ঃ ৩০ মহররম - ১৪১৯
১৩ জ্যৈষ্ঠ - ১৪০৫
২৭ মে - ১৯৯৮

মুদ্রণে ঃ
ইন্টারকন এসোসিয়েটস্
ঢাকা।

ভূমিকা

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে, সাধারণতঃ, মানুষ ধর্মের প্রতি উদাসীন হতে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে মানুষ ধর্মকে অধর্মে রূপান্তরিত করে। এই শতকের মাঝামাঝি এসে মানুষ ধর্মকে বিদায় দেয়। মানুষ বলতে থাকে, খোদা মরে গেছে। খোদা নেই। অথচ, মানবাত্মা এই প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্ট যে, সে স্বীকার করবে, আনুগত্য করবে। তাই, খোদাকে অস্বীকার করার কারণে, রাষ্ট্রকে কিংবা ব্যক্তিকে কিংবা অন্য কিছুকে খোদার আসনে বসালো মানুষ।

অতএব, এই যামানায় পতিত মানবাত্মার পুনঃ মুক্তির জন্য আল্লাহতায়ালা তাই, তাঁর প্রতিশ্রুত মসীহ বা ইমাম মাহদী (আঃ)-কে প্রেরণ করলেন। তিনি এলেন। মানবাত্মাকে পরিত্রাণের পথে পরিচালিত করলেন। তিনি খোদাতায়ালার কথা বললেন। তিনি বললেন সেই আল্লাহ্‌র কথা, — যাঁর অস্তিত্বই অস্তিত্ব, এবং বাকী সমস্ত কিছুই অস্তিত্বে এসেছে তাঁরই অস্তিত্ব থেকে। তাঁর যে খোদা, সে খোদা কবির কল্পনা-প্রসূত নয়, ভাবুকের ভাবনা—সৃষ্ট নয় ; দার্শনিকের চিন্তা-প্রসূত নয় ; বিস্ময়-উদ্ভূত নয়; কিংবা, তাঁর (আঃ) খোদা সংশয়ীর সেই খোদা নয়, যে খোদা থাকতেও পারে, না-ও থাকতে পারে।

তাঁর (আঃ) খোদা, সে-ই খোদা যিনি নবীগণের খোদা ; তাঁর খোদা সে-ই একই খোদা যিনি হাজারো, লাখো নবী-রসূলের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর খোদা সেই খোদা যিনি আদমের (আঃ) প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিলেন, যিনি ইব্রাহীমের (আঃ) প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিলেন। যিনি 'সিনাঈ থেকে এসেছিলেন, সেঈর থেকে উদিত হয়েছিলেন এবং ফারান পর্বত থেকে আপন জ্যোতিঃ প্রকাশিত করেছিলেন'। সেই মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লামের খোদার কথাই তিনি বলেছেন, যে খোদা কোরআন অবতীর্ণ করেছেন তাঁর (সাঃ) প্রতি। সেই খোদা যিনি মানুষের সাথে কথা বলেন, মানুষের প্রার্থনার উত্তর দেন, প্রার্থনা কবুল করেন। মানুষের প্রতি নিদর্শন প্রদর্শন করেন। সেই খোদার সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান, প্রকৃত উপলব্ধি বা মারেফাত দানের জন্যই তাঁর (আঃ) আগমন এই যামানায়। কেননা,

وہ لوگ جو کہ معرفتِ حق میں خام ہیں
بُت ترک کرکے پھر بھی بتوں کے غلام ہیں

'ঐ লোকেরা সত্য মারেফাতে যাদের নেই সে পরিচয়
মূর্তি ভেঙ্গে আবার তারা মূর্তিদেরই গোলাম হয়।'

অথচ, সত্য এই যে, –

واحد ہے لاشریک ہے اور لازوال ہے
سب موت کا شکار ہیں اسکو فنا نہیں

'এক সে এবং অংশীবিহীন, আর সে অবিনশ্বর,
সবাই মৃত্যুর শিকার শুধু লয়হীন সে নিরন্তর।'

এ বাণী তাঁরই – সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী আলাইহিস্ সালামের। আমরা তাঁর রচনাবলীর বিপুল ভান্ডার থেকে কিছু মুক্তো-মনি, হীরা-জহরৎ আহ্‌রণ করে সুধী ও সত্যান্বেষী মানুষের সামনে পেশ করলাম। অবশ্য, আমরা জানি বহু মানুষে এই অতি-অমূল্য রত্নরাজি গ্রহণ করতে চাইবে না। কেননা, আমাদের প্রাণাধিক প্রিয় নেতা ও প্রভু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলে গেছেন যে, তাঁর মাহ্‌দী এসে যখন ধন-সম্পদ বিতরণ করতে থাকবে, তখন অনেকে তা নিতে চাইবে না। কিন্তু, অনেকে তো নিবে। নিবেই নিশ্চয়। তাই, তাঁর এই চয়নিত রচনাবলীর বঙ্গানুবাদ আমরা আমাদের মাতৃভাষাভাষী ভাইবোনদের কাছে উপস্থাপন করলাম।

আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদেরকে এই তৌফিক দান করুন, আমাদের প্রতি এই কৃপা ও অনুগ্রহ করুন, যেন আমরা তাঁকে চিনতে পারি, জানতে পারি। এবং তাঁর অনুগ্রহে তাঁর সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য লাভ করতে পারি। এবং এই উদ্দেশ্য, যা কিনা মানব জীবনের আসল উদ্দেশ্য, তা সাধন করতে পারি। আল্লাহ্ করুণ, এমনিই হোক। এই পুস্তক প্রকাশে সহযোগিতাকারী সকলের কল্যাণ হোক।

বঙ্গানুবাদ করেছেন জনাব অধ্যাপক শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান প্রুফ দেখেছেন জনাব আব্দুল্লাহ ইউসুফ মোহাম্মদ, জনাব মোহাম্মদ মতিউর রহমান এবং অনুবাদক। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁদেরকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমিন।

খাকসার

তাং – ১৬ মে, ১৯৯৮ইং

আলহাজ্ব মীর মুহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

"সেই যে খোদা যিনি সমস্ত নবীগণের উপরে প্রকাশিত হয়ে আসছিলেন, যিনি হযরত মূসা কলীমুল্লাহ্ (আঃ)-এর উপরে তূর পাহাড়ে প্রকাশিত হয়েছিলেন, যিনি হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর উপরে সেঈর পাহাড়ের উর্ধ্বে উদিত হয়েছিলেন এবং যিনি হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপরে জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত করেছিলেন ফারান-এর গিরি 'পরে, সেই সর্বশক্তিমান পবিত্র খোদা-ই আমারও উপরে তাঁর জ্যোতিঃ প্রকাশিত করেছেন। তিনি আমার সাথে কথা বলেছেন। তিনি আমাকে বলেছেন, **সেই যে সর্বোচ্চ অস্তিত্ব যাঁর উপাসনার জন্য তামাম নবীগণকে প্রেরণ করা হয়েছিল, সে আমি-ই**। আমি-ই একমাত্র স্রষ্টা এবং অধিপতি, আমার কোন শরীক নেই এবং আমি জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুবরণ থেকে পবিত্র"। (যামিমাহ্ রিসালাহ্ জিহাদ, পৃঃ ৮)।

(২)

"সেই পবিত্র জীবন, যা পাপ থেকে মুক্ত থাকলে পাওয়া যায়, তা এক দ্যুতিময় লাল মুক্তো বা পদ্মরাগ মণি যা এখন কারোর কাছেই নেই। তবে, হ্যাঁ, খোদাতাআলা সেই দ্যুতিময় পদ্মরাগ মণি আমাকে দিয়েছেন; এবং তিনি আমাকে প্রত্যাদিষ্ট 'মা'মুর' করেছেন যেন আমি দুনিয়াকে সেই দ্যুতিময় পদ্মরাগ মণি লাভের পথ দেখিয়ে দেই। আমি দৃঢ় আস্থার সঙ্গে ঘোষণা দিচ্ছি যে, এই পথে চললে প্রত্যেক ব্যক্তিই নিশ্চয় সেই মুক্তো লাভে সমর্থ হবে। এবং এই মুক্তো যে মাধ্যমে ও যে পথে লাভ করা যায় তা এক-ই, যাকে বলা হয়, খোদাকে চেনার সাচ্চা মা'রেফাত বা সত্য জ্ঞান ও উপলব্ধি। প্রকৃত প্রস্তাবে, এই প্রশ্নটি একটি অত্যন্ত কঠিন ও নাজুক প্রশ্ন। কেননা, এটি একটি কঠিন বিষয় সম্পর্কিত প্রশ্ন (মস্আলা)। ফিলোসফার বা দার্শনিকরা (যেমন আমি পূর্বেই বলে এসেছি) আসমান ও যমীনের প্রতি লক্ষ্য করে এবং বিশ্বজগতের সৃষ্টির সুন্দর শৃংখলা, বিন্যাস ও নিয়ন্ত্রণ অবলোকন করে শুধু এতটুকুই বলতে পারেন যে, একজন সৃষ্টিকর্তা থাকাই সম্ভব। কিন্তু, আমি তাদেরকে এর চাইতেও উর্ধ্বের স্তরে উন্নীত করছি এবং নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি যে, খোদা বাস্তবিকই আছেন"। (মলফুযাত, খ. ৩, পৃঃ ১৬)।

(৩)

"**আমাদের খোদা-ই আমাদের বেহেশ্ত**। আমাদের সব চাইতে বড় আনন্দ আমাদের খোদাতেই। কেননা, আমরা তাঁকে দেখেছি এবং তাঁর মধ্যেই সমস্ত সৌন্দর্য অবলোকন করেছি। এই সম্পদই গ্রহণের যোগ্য, যদি তা প্রাণেরও

বিনিময়ে পাওয়া যায়। এবং এই পদ্মরাগ মণি ক্রয় করারই যোগ্য, যদি তা নিজের সমগ্র অস্তিত্বের বিনিময়েও পাওয়া যায়। হে বঞ্চিতগণ! এই ঝর্ণার কাছে দৌড়ে এসো, ইহা তোমাদেরকে পরিতৃপ্ত করবে। এ হচ্ছে জীবনের ঝর্ণা, এ তোমাদেরকে বাঁচাবে। আমি কী করি! আমি কেমন করে এই সুখবর হৃদয়গুলোতে প্রবেশ করাই! আমি কোন্ সে ঢেঁড়া পিটিয়ে বাজারে ও বন্দরে ঘোষণা করি যে, এই তো তোমাদের খোদা, যাতে করে লোকেরা তা শোনে! এবং আমি কোন্ সে ঔষধ দিয়ে চিকিৎসা করি, যাতে লোকেদের কান খোলে!" (কিশ্‌তী-এ-নূহ্‌, পৃঃ ৩০)।

(৪)

"খোদা যমীন ও আসমানের নূর-আলো। অর্থাৎ প্রত্যেক আলো, তা সে পর্বতের শৃঙ্গের উপরেই হোক আর উপত্যকাতেই হোক, তা আত্মার ভেতরেই হোক, আর দেহেই হোক, ব্যক্তিক হোক আর নৈর্ব্যক্তিক হোক, এবং তা জাহেরী হোক আর বাতেনী হোক, মনের মধ্যেই হোক আর বাইরে হোক, তা সবই তাঁরই ফয়েয বা কল্যাণের দান। এতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হচ্ছে যে, জগতসমূহের প্রভু-প্রতিপালকের অর্থাৎ রব্বুল আলামীনের ফয়েযে আম বা সাধারণ কল্যাণ ও কৃপা সমস্ত কিছুকেই পরিবেষ্টন করে আছে। কেউই তাঁর কৃপা ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত নয়। তিনিই যাবতীয় কৃপা ও কল্যাণের উৎস, সকল আলোর চূড়ান্ত কারণ, তামাম রহমতের উৎস-প্রস্রবণ। তাঁরই সত্য অস্তিত্ব সমগ্র বিশ্ব জাহানের ভরসা এবং ছোট বড় সমস্ত কিছুর আশ্রয়স্থল। তিনিই সেই, যিনি প্রতিটি জিনিসকে অনস্তিত্বের অন্ধকার গহ্বর থেকে বের করে এনেছেন এবং অস্তিত্বের পরিচ্ছদে ভূষিত করেছেন। তিনি ছাড়া এমন আর কোন অস্তিত্ব নেই, যা স্বয়ং নিজের থেকেই বিদ্যমান ও অনাদি ও প্রাচীন এবং যা তাঁর থেকে কৃপা ও কল্যাণপ্রাপ্ত নয়। বরং, ভূমণ্ডল ও আকাশমণ্ডল, মানব ও প্রাণীকুল, প্রস্তর ও বৃক্ষরাজি এবং সকল আত্মা ও দেহ, সবই তাঁরই কৃপা ও কল্যাণরাশি থেকে অস্তিত্ব লাভ করেছে"। (বরাহীনে আহ্‌মদীয়া, পৃঃ ১৮১, পাদটীকা)।

(৫)

"ইসলামের খোদা হচ্ছে সেই খোদা যিনি কানুনে কুদরত বা প্রাকৃতিক নিয়ম-এর আয়নায় এবং ফিৎরত বা স্বভাবের গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হচ্ছেন। ইসলাম কোন নতুন খোদাকে পেশ করেনি, বরং সেই খোদাকেই পেশ করেছে যাকে পেশ করে চলেছে মানুষের হৃদয়ের আলো, মানুষের বিবেক এবং যমীন ও আসমান"। (তবলীগে রেসালত, খঃ ৬, পৃঃ ১৫)।

(৬)

"সেই শক্তিমান এবং সত্য এবং কামেল খোদাকে আমাদের আত্মা এবং আমাদের অস্তিত্বের প্রতিটি অণু-পরমাণু সিজ্‌দা করে চলেছে, যাঁর হস্ত দ্বারাই প্রকাশিত হয়েছে প্রত্যেকটি আত্মা এবং সৃষ্টির প্রত্যেকটি পরমাণু তাদের সমস্ত শক্তি ও বৃত্তিসহ। এবং যাঁর অস্তিত্বের কারণেই কায়েম রয়েছে বাকী সমস্ত কিছুর অস্তিত্ব। কোন কিছুই তাঁর জ্ঞানেরও বাইরে নেই, তাঁর নিয়ন্ত্রণেরও বাইরে নেই, তাঁর সৃষ্টিরও বাইরে নেই। এবং হাজারো দরূদ ও সালাম এবং হাজারো রহমত ও বরকত সেই পবিত্র নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর উপরে, যাঁর মাধ্যমে আমরা সেই যিন্দা খোদাকে পেয়েছি, যে খোদা নিজে কথা বলে নিজের অস্তিত্বের নিদর্শন আমাদেরকে দেখিয়ে থাকেন। এবং যিনি অতি অসাধারণ নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করে তাঁর চিরন্তন ও কামেল শক্তি ও ক্ষমতাসমূহের জ্যোতির্ময় চেহারা দেখিয়ে থাকেন। অতএব, আমরা এমন এক রসূলকে পেয়েছি যিনি আমাদেরকে খোদা দেখিয়েছেন। এবং আমরা এমন খোদাকে পেয়েছি যিনি তাঁর কামেল শক্তির দ্বারা প্রত্যেকটি জিনিসকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কুদরত বা ক্ষমতার মধ্যে কতই না মহিমা বিদ্যমান, তাঁর কুদরত ব্যতিরেকে কোন কিছুই অস্তিত্বের রূপ লাভ করেনি। কোন কিছুই তাঁর সাহায্য ছাড়া টিকে থাকতে পারে না। তিনিই আমাদের সত্য খোদা, তিনি অন্তহীন কল্যাণের অধিপতি, অন্তহীন ক্ষমতার অধিকারী। তিনি অনন্ত সৌন্দর্যের আকর। তিনি অনন্ত কৃপা ও করুণার উৎস। তিনি ছাড়া আর কোনও খোদা নেই"। (নাসীমে দাওয়াত, পৃঃ ৩)।

(৭)

"খোদাতালার সত্তা অদৃশ্য থেকেও অদৃশ্য এবং অতিক্রান্ত থেকে অতিক্রান্ত এবং অত্যন্ত গোপন, যাকে শুধু মানবীয় যুক্তির বা আকলের দ্বারা আবিষ্কার করা কোনমতেই সম্ভব নয়। কোন প্রকার যুক্তিই তাঁর সত্তা প্রমাণের পক্ষে অকাট্য বলে বিবেচিত হতে পারে না। কেননা, আকল্‌ বা যুক্তির দৌড় ও বিচরণের সীমা শুধু এতটুকুই প্রসারিত যে, এই বিশ্বজগতের প্রতি তাকিয়ে মনে হবে যে, এর কোন স্রষ্টা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু, প্রয়োজনকে অনুভব করা এক কথা, আর সেই নিশ্চিত জ্ঞানের স্তরে উত্তীর্ণ হওয়া যে, যে খোদার প্রয়োজনীয়তা বোধ করা হচ্ছে সেই খোদা সত্যসত্যই অস্তিত্ববান, ভিন্ন কথা। যেহেতু, যুক্তি-বুদ্ধির পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া ক্রটিপূর্ণ এবং অসম্পূর্ণ এবং সন্দেহযুক্ত, এবং যেহেতু প্রত্যেক ফিলোসফি বা দর্শন কেবল যুক্তির মাধ্যমে খোদাকে সনাক্ত করতে পারে না ; বরং সেইসব লোকেরা যারা শুধু যুক্তির সাহায্যেই খোদাকে চিনতে চায়, তারা অবশেষে নাস্তিক হয়ে যায়। তখন, যমীন ও আসমানের সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করলেও তাদের

কোনও ফায়দা হয় না। তারা খোদাতাআলার লোকদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা শুরু করে দেয়। তারা একটা যুক্তি দেখাতে থাকে যে, পৃথিবীতে এমন হাজারও জিনিস পাওয়া যায় যেগুলোর অস্তিত্ব আমাদের কোনও কাজেই আসে না। এবং যেগুলোর সৃষ্টি হওয়া থেকে এমন কোন যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, আসলেই কোন স্রষ্টা আছেন। বরং সেগুলো এমনিতেই অস্তিত্ববান এবং সেগুলো বৃথা এবং অনাবশ্যকও বটে।

আফসোস! ঐ মূর্খেরা জানে না যে, **জ্ঞানের শূন্যতা থেকে অস্তির শূন্যতা প্রমাণিত হয় না** (অর্থাৎ, একটা কিছুকে না জানলেই সেটা নাই হয়ে যায় না)। এই ধরনের লোক এই যামানায় লাখো লাখো সংখ্যায় পাওয়া যাবে যারা নিজেদেরকে মনে করে যে, তারা খুব বুদ্ধিমান, বড় ফিলোসফার, তারা তাই খোদাতাআলার অস্তিত্বকে সরাসরি অস্বীকার করে। আর যদি মহামহিম স্রষ্টার অস্তিত্বের পক্ষে কোন যুক্তিগ্রাহ্য সুস্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা তাদেরকে পরাস্ত বা দোষী সাব্যস্ত করা যেত, তাহলে তারা অমন নির্লজ্জভাবে হাসি-ঠাট্টার সাথে খোদাতাআলার অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারতো না। অতএব, **কোন ব্যক্তি ফিলোসফির নৌকোয় চড়ে সংশয়ের তুফান থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে না। বরং, সে ডুবে মরবেই**। এবং সে কোনক্রমেই খাঁটি তৌহীদের শরবত পানে তৃপ্ত হতে পারবে না। এখন ভেবে দেখো যে, এইরূপ চিন্তা কত বেশী ভ্রান্ত ও দুর্গন্ধময় যে, নবী সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর উছিলা ছাড়াই তৌহীদ লাভ করা যায়, এবং এর ফলে মানুষ পরিত্রাণ লাভ করতে পারে । হে মুর্খেরা! খোদার অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস পূর্ণ না হলে, তৌহীদের প্রতি বিশ্বাস কীভাবে দৃঢ় হবে? সুতরাং নিশ্চয় জেনে রাখো যে, প্রকৃত তৌহীদ কেবল নবীর মাধ্যমই লাভ করা সম্ভব। যেমন, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম আরবের নাস্তিক, প্রকৃতি-পূজারী ও ভ্রান্ত ধর্মাবলম্বীদেরকে হাজারো আসমানী বা স্বর্গীয় নিদর্শন দেখিয়ে তাদেরকে খোদাতাআলার অস্তিত্বে পূর্ণ বিশ্বাসী হতে বাধ্য করেছিলেন। এবং এখনও পর্যন্ত আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম -এর সাচ্চা ও পূর্ণ আনুগত্যকারীরা নাস্তিক ও প্রকৃতি বা সৃষ্টির উপাসকদের সামনে ঐ সমস্ত নিদর্শন প্রদর্শন করে চলেছেন। কথা এটাই সত্য যে, **যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ জীবন্ত খোদার জীবন্ত ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত শয়তান তার হৃদয় থেকে নিক্রান্ত হয় না; এবং খাঁটি তৌহীদও তার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয় না; এবং সে খোদার অস্তিত্বের প্রতিও অটল বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না। এবং এই যে পবিত্র ও কামেল তৌহীদ, তা লাভ করা যায় কেবল আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের মাধ্যমেই**"।

(হকীকাতুল ওহী, পৃঃ ১১৭-১১৮)।

"স্মরণ রেখো যে, মানুষের কোন ক্ষমতা নেই যে, মানুষ খোদাতাআলার সকল সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম কার্য সম্পর্কে অবহিত হয়, বরং খোদাতাআলার কাজ তো সবই মানবীয় বুদ্ধি এবং চিন্তা এবং কল্পনারও বহু উর্ধ্বে। মানুষের তো এতটুকু জ্ঞানের বড়াই করা উচিত নয় যে, সে কার্য-কারণ প্রক্রিয়ার বা ধারাবাহিকতার একটা সীমা পর্যন্ত জেনে ফেলেছে। কেননা, মানুষের এই জ্ঞান তো নিতান্তই সীমাবদ্ধ। এবং তা বড় জোর হতে পারে সমুদ্রের একবিন্দু পানির কোটি ভাগের এক ভাগের সমান। সত্য কথা হচ্ছে, খোদাতাআলা নিজে যেমন সীমাহীন, তেমনি তাঁর কাজও সীমাহীন। তাঁর কোন কাজের মৌলিকত্ব সম্পর্কে জানা মানবীয় ক্ষমতার বাইরে ও উর্ধ্বে। তবে হ্যাঁ, আমরা তাঁর চিরন্তন গুণাবলীর দিকে তাকিয়ে শুধু এতটুকু বলতে পারি যে, খোদাতাআলার গুণাবলী যেহেতু নিষ্ক্রিয় থাকে না, সেহেতু খোদাতাআলার সৃষ্টির মধ্যে একটা না একটা প্রজাতির সূচনা বা আদিম সৃষ্টির ধারা কার্যকরী আছে ; অর্থাৎ সৃষ্টির শ্রেণীসমূহের মধ্যে কোন না কোন ধারা লক্ষ্য করা যায়, অর্থাৎ, খোদাতাআলার সৃষ্টি জগতে প্রজাতিসমূহের মধ্য থেকেও সব সময়েই কোন না কোন প্রজাতির অস্তিত্ব প্রকাশ পাচ্ছেই। তাই, ব্যক্তিক আদিমত্ব এক্ষেত্রে বাতিল হয়ে যায়। এতদ্‌সত্ত্বেও খোদাতাআলার লয়কারী ও ধ্বংসকারী গুণাবলীও সর্বদা সক্রিয় রয়েছে এবং এগুলিও কখনই নিষ্ক্রিয় থাকে না। নাদান দার্শনিকেরা যদি পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর জড় ও জৈব সমস্ত সৃষ্টিকে নিজেদের বিজ্ঞানের অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর আওতাভুক্ত করে নেয়ার এবং সেগুলির সৃষ্টির সূত্র প্রতিষ্ঠার জন্য জোর প্রচেষ্টাও চালায়, তবু তারা এক্ষেত্রে ব্যর্থই থেকে যাবে, অক্ষম থেকে যাবে। তারা নিজেদের পদার্থ সম্পর্কিত গবেষণার ফলে যা কিছু আহরণ করতে এবং জমা করতে সমর্থ হয়েছে তা-ও তো সবই অসম্পূর্ণ, সবই ত্রুটিযুক্ত। এবং এটাই সেই কারণ যেজন্য তারা তাদের নিজেদের তত্ত্বের প্রতি বরাবর আস্থাশীল বা কায়েম থাকতে পারেনি। এবং বারবার সেগুলির মধ্যে পরিবর্তন সাধন করতে হচ্ছে। কে জানে আরও কত পরিবর্তন সাধন করতে হবে। যেহেতু, তাদের যাবতীয় গবেষণার অবস্থা হচ্ছে, তারা তাদের সমস্ত উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে কেবল তাদের বুদ্ধি ও চিন্তার উপরেই নির্ভরশীল, এবং যেহেতু খোদার পক্ষ থেকেও কোন প্রত্যক্ষ সাহায্য তারা পায় না, সেহেতু তারা অন্ধকার থেকেও বেরিয়ে আসতে পারে না। আসলে কোন ব্যক্তিই খোদাকে চিনতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিগূঢ় জ্ঞান বা মাগফেরাতের সেই সীমা পর্যন্ত পৌঁছে, যেখানে পৌঁছলে সে বুঝতে পারে যে, খোদাতাআলার এমন অসংখ্য কার্যাবলী রয়েছে যা কিনা মানববুদ্ধি, জ্ঞান ও চিন্তা-চেতনার বাইরে ও বহু উর্ধ্বে। এবং এই যে নিগূঢ় জ্ঞান, তা লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত মানুষ হয় নাস্তিক বা প্রকৃতি পূজারী বা কোন সৃষ্টির উপাসক হয়ে পড়ে, নয়তো সে খোদার অস্তিত্বের প্রতিই

অবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। আর যদিবা খোদাকে সে মানেও তাহলে স্রেফ সেই খোদাকেই মানে, যে খোদা তার নিজস্ব যুক্তি-বুদ্ধিজাত একটা ফল মাত্র। এবং এই খোদা সেই খোদা নয়, যে খোদা আপন তাজাল্লী বা জ্যোতির্ময়তার স্ফুরণ দ্বারা নিজের সত্তাকে নিজেই প্রকাশ করে থাকেন। এবং তাঁর ক্ষমতা বা কুদরতের রহস্যাবলী এত গভীর ও বিশাল যে, মানববুদ্ধি তার কূল-কিনারা পায় না। যখন থেকে খোদা আমাকে এই জ্ঞান দিয়েছেন যে, খোদাতাআলার ক্ষমতাবলী বা কুদরতসমূহ বিস্ময়ের পর বিস্ময়ে ভরা এবং গভীরতা থেকেও গভীর এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্ম এবং ধ্যান ও ধারণারও বহির্ভূত, তখন থেকেই আমি ঐ লোকগুলোকে, যারা নিজেদেরকে ফিলোসফার বলে জাহির করে তাদেরকে পাক্কা কাফের বলে মনে করি, গোপন নাস্তিক বলে মনে করি। আমার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ এবং আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই যে, **আমি খোদাতাআলার বহু বিস্ময়কর কুদরত এমনভাবে প্রত্যক্ষ করেছি যে, সেগুলিকে নাস্তি থেকে অস্তি ছাড়া অন্য আর কোনভাবেই আখ্যায়িত করা সম্ভব নয়। যেমন, আমি এই শ্রেণীর নিদর্শনের কোন কোন দৃষ্টান্তের কথা কোন কোন সময় বর্ণনাও করেছি। কুদরতের এই লীলা যে দেখেনি, সে কী দেখেছে?** আমরা তেমন কোন খোদাকে মানি না, যার কুদরত বা ক্ষমতা স্রেফ আমাদের যুক্তি-বুদ্ধি ও চিন্তা-চেতনার বা কল্পনার সীমার মধ্যেই আবদ্ধ, এর বাইরে তার কিছুই নেই। বরং, আমরা সেই খোদাকেই মানি যাঁর কুদরত বা ক্ষমতা তাঁর সত্তার মতই অসীম এবং অকল্পনীয় এবং অন্তহীন"।

(চশ্‌মা মা'রেফাত, পৃঃ ২৬৮-২৬৯)।

(৯)

"কোরআন শরীফের মধ্যে এমন সব শিক্ষাদান করা হয়েছে যা খোদাতাআলার প্রিয় বানাবার প্রচেষ্টা চালায়। তা কখনো তাঁর রূপ ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করে, আর কখনো বা তাঁর কৃপা ও কল্যাণরাজির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কেননা, কারো প্রতি হৃদয়ে ভালবাসার সৃষ্টি হয় তার রূপ সৌন্দর্যের কারণে এবং তার কৃপা-কল্যাণের কারণে। তাই, লিখিত হয়েছে যে, খোদা তাঁর সকল সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে এক ও অংশীবিহীন-ওয়াহেদ ও লা-শরীক। তাঁর মধ্যে কোন প্রকার ত্রুটি নেই। তিনি সমস্ত পূর্ণ বা কামেল গুণাবলীর সমষ্টি, সমস্ত পবিত্র কুদরত বা শক্তির আধার। সমস্ত সৃষ্টির উৎস। যাবতীয় কল্যাণের প্রস্রবণ। এবং তিনি প্রত্যেক পুরস্কার ও শাস্তির মালিক। সব কিছুই তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করে। তিনি নিকটে তথাপি দূর। তিনি দূর তথাপি নিকটে। তিনি সব কিছুর উর্ধ্বে, কিন্তু এ-ও বলা যায় না যে, তাঁর নীচে আরও কিছু আছে। তিনি সব কিছু থেকে অতীব গোপন, কিন্তু এ কথাও বলা যায় না যে, তাঁর চাইতে অধিক প্রকাশিত কিছু আছে। তিনি জীবন্ত তাঁর আপন সত্তায় এবং সব কিছু তাঁর

থেকেই অস্তিত্ববান। তিনি সমস্ত কিছুরই ভরসা বা নির্ভরস্থল, কিন্তু কোন কিছুই তাঁর জন্য ভরসা বা নির্ভরস্থল নয়। কোন কিছুই এমন নেই যা তাঁকে ছাড়াই নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়েছে, কিংবা তাঁকে ছাড়া নিজে নিজেই জীবিত রয়েছে। তিনি সব কিছুকেই পরিবেষ্টন করে আছেন, কিন্তু বলতে পারি না যে, তার পরিধি কত প্রসারিত। তিনি আসমান ও যমীনের প্রত্যেকটি জিনিসের নূর, আলো। প্রতিটি আলো তাঁরই হস্ত থেকে বিচ্ছুরিত এবং তাঁরই সত্তার প্রকাশ। তিনি সকল জগতের প্রতিপালক, পরওয়ারদেগার। এমন কোন আত্মা নেই যা তাঁর পরওয়ারেশ বা প্রতিপালন থেকে বঞ্চিত এবং নিজে নিজেই অস্তিত্ববান। কোন আত্মারই এমন কোন শক্তি নেই, যা সে তাঁর থেকে লাভ না করে নিজে নিজেই অস্তিত্ববান হয়েছে। তাঁর রহমতসমূহ দুই প্রকারের ঃ

(১) এক হচ্ছে সেই রহমতসমূহ যা কোন কর্মীর কর্মের ফল নয়, বরং সবই আদিকাল থেকেই প্রকাশিত। যেমন, পৃথিবী ও নভোমণ্ডল, সূর্য এবং চন্দ্র এবং নক্ষত্ররাজি, পানি ও অগ্নি ও বায়ু এবং এই জগতের সমস্ত কিছু যা সৃষ্টি করা হয়েছে আমাদের আরামের জন্যে; এবং তেমনিভাবে, অন্য যে সকল জিনিসের প্রয়োজন ছিল আমাদের, তা সমস্ত কিছুই আমাদের জন্মের পূর্বেই সরবরাহ করা হয়েছে আমাদের জন্যে। এবং এ সমস্ত কিছুই করা হয়েছে সেই সময়ে যখন আমাদের নিজেদের না কোন অস্তিত্ব ছিল, না আমাদের কোন কর্ম বা আমল ছিল। কে বলতে পারে যে, সূর্যকে আমারই কর্মের ফলস্বরূপ সৃষ্টি করা হয়েছে, পৃথিবীকে আমার সৎকর্মের ফলেই সৃষ্টি করা হয়েছে। সংক্ষেপে, এ হচ্ছে সেই রহমত, যা মানুষ ও তার কর্মের পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। যা কারো কোন কর্মের ফল নয়।

(২) দ্বিতীয় প্রকারের রহমত হচ্ছে সেই রহমত যা কর্মের ফলস্বরূপ প্রকাশ পায় এবং এর কোন বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

কোরআন শরীফে বর্ণনা করা হয়েছে যে, খোদাতাআলার সত্তা প্রত্যেক প্রকারের দোষত্রুটি থেকে পবিত্র এবং প্রত্যেক প্রকারের ক্ষতি থেকে মুক্ত। এবং তিনি চান যে, মানুষও তাঁর শিক্ষা অনুসরণ করে দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র হোক। তাই তিনি বলেছেন ঃ

وَمَنْ كَانَ فِي هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى

"যে ব্যক্তি ইহজগতে অন্ধ থাকবে সে পরজগতেও অন্ধ হবে" (১৭ঃ৭৩)। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ইহজগতে অন্ধ থাকবে এবং সেই অনুপম সত্তাকে দেখতে পাবে না, সে মরণের পরেও অন্ধই হবে এবং অন্ধকার তার থেকে দূরীভূত হবে না। কেননা, খোদাকে দেখার ইন্দ্রিয়সমূহ ইহজগতেই পাওয়া যায় এবং যে ব্যক্তি এই ইন্দ্রিয়সমূহকে এই দুনিয়া থেকে সঙ্গে করে নিয়ে না যাবে, সে আখেরাতেও খোদাকে দেখতে পাবে না। এই আয়াতে খোদাতাআলা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, মানুষের কোন্ উন্নতি তিনি চান। এবং মানুষ তাঁর শিক্ষা অনুসরণ করলে কত উর্ধ্বে উন্নীত হতে পারে। অতঃপর, তিনি কোরআন শরীফে সেই

শিক্ষা পেশ করেছেন যার মাধ্যমে এবং যার উপরে আমল করলে এই দুনিয়াতেই দীদার-এ-ইলাহী বা খোদার দর্শন লাভ করা সম্ভব হতে পারে। যেমন, তিনি বলেছেনঃ

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١١﴾

"সুতরাং যে ব্যক্তি তার প্রভু-প্রতিপালকের সহিত সাক্ষাৎ বা দীদার লাভ করবার আশা রাখে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রভু-প্রতিপালকের এবাদতের মধ্যে যেন কাউকেও শরীক না করে"। (১৮ ঃ ১১১)।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি চায় যে, এই দুনিয়াতেই তার সেই খোদার দীদার লাভ হোক যিনি সত্যিকার খোদা ও সৃষ্টিকর্তা, তাহলে তার উচিত এমন সব সৎকর্ম করা যার মধ্যে কোন প্রকারের কোন ক্রটি ও কালিমা থাকবে না। অর্থাৎ, তার আমল বা কর্ম এমন হতে হবে যে, তার মধ্যে না থাকবে কোন লোক দেখানোর ভাব বা ইচ্ছা, না তার দ্বারা তার মনে এমন কোন অহংকার সৃষ্টি হবে যে, 'আমি এ-ই হয়েছি, সে-ই হয়েছি। এবং তার সেই আমল না ক্রটিযুক্ত হবে, না অসম্পূর্ণ থাকবে। না তার মধ্যে এমন কোন দুর্গন্ধ মিশ্রিত থাকবে যা কিনা তার ব্যক্তিগত ভালবাসার পরিপন্থী হবে। বরং, তা হতে হবে আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততায় পরিপূর্ণ। এবং সঙ্গে সঙ্গে এ-ও হতে হবে যে, তা যেন সর্বপ্রকারের শিরক্ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয় ; না সূর্য, না চন্দ্র, না আকাশের তারা, না বাতাস, না আগুন, না পানি, না পৃথিবীর অন্য কোন বস্তুকে উপাস্য করা হয় ; এবং না পৃথিবীস্থ্ উপায় উপকরণকে এমন ইজ্জত বা গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং সেগুলোর প্রতি এমন ভরসা করা হয় যাতে মনে হয় যে, ওগুলি খোদারই অংশীদার। এবং না নিজের হিম্মত ও প্রচেষ্টাকে কিছু একটা মনে করা হয়। এবং না নিজের হিম্মত ও প্রচেষ্টাকে কিছু একটা মনে করা হয়। কেননা, এটাও বিভিন্ন প্রকার শির্কের মধ্যে এক প্রকার শির্ক। বরং সমস্ত কিছু, সমাধান করা পর এটাই মনে করতে হবে যে, আমি কিছুই করিনি। এবং না নিজের জ্ঞানের জন্য গর্ব করা যাবে, না নিজের কোন কাজের জন্য আনন্দ-উল্লাস। বরং, নিজেকে একজন অজ্ঞ বলেই জানবে, দুর্বল জানবে এবং খোদাতাআলার আস্তানায় সর্বদা আত্মনিবেদিত থাকবে এবং প্রার্থনার সঙ্গে তাঁর কৃপা ও করুণাকে নিজের প্রতি আকর্ষণ করবে। এবং সেই ব্যক্তির ন্যায় হয়ে যাবে যে দারুণভাবে পিপাসার্ত এবং হাত-পা না থাকা এক অসহায় ব্যক্তি, এবং তদবস্থায় তার সামনেই ফুটে ওঠলো এক প্রস্রবণ যার পানি অত্যন্ত সাফ ও সুমিষ্ট। সে তখন মাটিতে বুক ঘঁষে ঘঁষে অতিকষ্টে সেই প্রস্রবণের কাছে গিয়ে পৌঁছুলো এবং নিজের ঠোঁট দু'টিকে প্রস্রবণের পানির 'পরে রাখলো এবং মুখ তুললো না, যতক্ষণ না সে পরিতৃপ্ত হলো।

কোরআন করীমে আমাদের খোদা তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে বলছেন,

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿٢﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٣﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٤﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٥﴾

"বল, তিনিই আল্লাহ্ এক-অদ্বিতীয়, আল্লাহ্ স্বনির্ভর ও সর্বনির্ভরস্থল। তিনি কাউকেও জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি। এবং তাঁর সমতুল্য কেউ

নেই"। (১১২ঃ ২-৫)। অর্থাৎ তোমার খোদা হচ্ছেন সেই খোদা যিনি তাঁর সত্তায় এবং গুণাবলীতে এক-অদ্বিতীয়। না কোন সত্তা তাঁর সত্তার ন্যায় চিরন্তন ও চিরস্থায়ী অর্থাৎ অনাদি ও অনন্ত; না কোন কিছুর গুণাবলী তাঁর গুণাবলীর ন্যায় (অনুপম)। মানুষের জ্ঞান কোন শিক্ষকের মুখাপেক্ষী এবং তা সীমাবদ্ধ। কিন্তু, তার জ্ঞান কোন শিক্ষাদাতার মুখোপেক্ষী নয় এবং তা কল্পনাতীতভাবে সীমাহীন। মানুষের শ্রবণ শক্তি বাতাসের মুখাপেক্ষী এবং সীমিত। কিন্তু, খোদার শ্রবণশক্তি তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষমতার অন্তর্গত এবং তা সীমিত নয়। মানুষের দর্শনশক্তি সূর্য কিংবা অন্য কোন আলোকের মুখাপেক্ষী। এবং তা সীমিত। কিন্তু, খোদার দর্শনশক্তি তাঁর ব্যক্তিসত্তার আলো থেকেই (শক্তিমান) এবং তা সীমিত নয়। তাঁর সমস্ত গুণাবলী অতুল ও অনন্য। তাঁর যেমন কোন মেছাল বা তুলনা নেই, তেমনি তাঁর গুণাবলীরও কোন তুলনা নেই। তাঁর যদি কোন একটি গুণও ক্রুটিযুক্ত হয়, তাহলে তাঁর সমস্ত গুণাবলী ক্রুটিযুক্ত হবে। এজন্যই তাঁর একত্ব বা তৌহীদ প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না, যতক্ষণ না তিনি তাঁর সত্তার মতই তাঁর সমস্ত গুণবালীতেও অতুল ও অনন্য হবেন। এছাড়া, উল্লিখিত আয়াতসমূহে এ কথাও বলা হয়েছে যে, খোদা না কারো পুত্র, না কেউ তাঁর পুত্র। কেননা, তিনি তাঁর সত্তায় স্বনির্ভর। তাঁর না কোন পিতার প্রয়োজন, না পুত্রের। এই-ই হচ্ছে তৌহীদ যা কোরআন শরীফ শিক্ষা দিয়েছে এবং যা ঈমান-এর ভিত্তি"। -(লেকচার লাহোর, পৃঃ ৯-১৩)

(১০)

'খোদা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন, আমি যেন আমার জামায়াতকে এই কথা জানিয়ে দেই যে, যারা ঈমান আনে, তারা যেন এমন ঈমান আনে যার সঙ্গে দুনিয়াবী কোন কিছুর সংশ্রব না থাকে। এবং সেই ঈমানের মধ্যে যেন কপটতা এবং কাপুরুষতার লেশ মাত্র না থাকে। এবং সেই ঈমান যেন আনুগত্যের কোন স্তর থেকেই বঞ্চিত না থাকে। এই শ্রেণীর লোকেরাই খোদার পসন্দের লোক। এবং খোদা বলেন যে, এরাই তারা যাদের পদক্ষেপ আন্তরিকতার পদক্ষেপ।

হে শ্রোতাগণ! শোন, খোদা তোমাদের কাছে কী চান ? শুধু এতটুকুই যে তোমরা তাঁর হয়ে যাও। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না, না আকাশে, না পৃথিবীতে। আমাদের খোদা তো সেই খোদা যিনি এখনো জীবন্ত আছেন, যেমন তিনি জীবন্ত ছিলেন অতীতে। তিনি এখনো কথা বলেন, যেমন তিনি কথা বলতেন অতীতে। তিনি এখনো শুনে থাকেন, যেমন তিনি শুনতেন অতীতে। এইরূপ ধারণা ভ্রান্ত যে, এই যামানায় তিনি শুনেন তো বটে, কিন্তু বলেন না। বরং, তিনি শুনেনও, বলেনও। তাঁর সমস্ত গুণাবলী চিরন্তন ও চিরস্থায়ী। তাঁর কোন গুণ অকেজো নয়। এবং কখনও আকেজো হবেও না। তিনি তো সেই ওয়াহেদ ও লা–শরীক-সেই এক ও অংশীবিহীন যাঁর কোন পুত্র নেই। কোন স্ত্রী

নেই। তিনি সেই অতুলনীয়, বেমেছাল যাঁর কোন দ্বিতীয় নেই। কোন ব্যক্তি কোন গুণে তাঁর মত সম্পূর্ণরূপে গুণান্বিত নয়, তাঁর কোন সমকক্ষ নেই। তাঁর গুণাবলীতে কেউ অংশীদার নেই। তাঁর কোন ক্ষমতায় কোন কমতি নেই। তিনি নিকট, দূর হওয়া সত্ত্বেও, এবং তিনি দূর, নিকট হওয়া সত্ত্বেও। তিনি রূপকভাবে আহলে কাশ্ফ বা দিব্যদর্শনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের প্রতি নিজেকে প্রকাশিত করেন, কিন্তু এজন্য তাঁর না কোন দেহ আছে, না কোন আকার। তিনি সমস্ত কিছুর উর্ধে, কিন্তু বলতে পারি না যে, তাঁর নীচে আরও কিছু আছে। তিনি আরশ-এর উপরে আছেন, কিন্তু বলতে পারি না যে, যমীনের উপরে নেই। তিনি সমস্ত সর্বোত্তম গুণাবলীর আধার এবং সমস্ত প্রকৃত প্রশংসার প্রকাশিত রূপ। তিনি সমস্ত সৌন্দর্যাবলীর উৎস-প্রস্রবণ এবং সমস্ত ক্ষমতার সমষ্টি। তিনি যাবতীয় কৃপা ও কল্যাণের উৎস এবং সমস্ত কিছু তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তন করে। তিনি প্রত্যেকটি রাজ্যের বা রাষ্ট্রের অধিপতি এবং প্রত্যেকটি পারফেক্ট গুণের অধিকারী। তিনি প্রত্যেক ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতা থেকে মুক্ত। এবং তিনি এ ব্যাপারে এমন এককরূপে বিশিষ্ট যে, পৃথিবীবাসী এবং নভোমন্ডলবাসী সবাই শুধু তাঁরই উপাসনা করবে। এবং কোন কিছুই তাঁর ক্ষমতা বহির্ভূত নয়। সমস্ত আত্মা ও তাদের শক্তিসমূহ, এবং সমস্ত অণু-পরমাণু ও তাদের শক্তিসমূহ সব কিছুই তাঁর সৃষ্টি। তাঁকে ছাড়া কোন কিছুই প্রকাশিত হয় না। তিনি তাঁর ক্ষমতাসমূহে এবং তাঁর শক্তিসমূহে এবং তাঁর নিদর্শনসমূহে নিজের সত্তাকে নিজেই প্রকাশিত করেন। আমরা তাঁর মাধ্যমেই তাঁকে পেতে পারি। এবং তিনি সাধুগণের প্রতি সর্বদাই আপন অস্তিত্ব প্রকাশিত করে থাকেন। এবং তাঁদেরকে আপনার শক্তি বা কুদরত প্রদর্শন করেন। এবং এরই মাধ্যমে তাঁকে সনাক্ত করা যায়, চেনা যায়, এবং এরই মাধ্যমে তাঁর পসন্দকৃত মনোনীত পথও সনাক্ত করা যায়, চেনা যায়।

তিনি দেখেন দৈহিক (বা ভৌতিক) চক্ষু ছাড়াই। তিনি শোনেন দৈহিক কান ছাড়াই। এবং তিনি কথা বলেন দৈহিক কোন জিহ্বা ছাড়াই। এমনিভাবে, নাস্তি থেকে অস্তি-তে আনা তাঁরই কাজ। যেমন, তোমরা দেখে থাক যে, স্বপ্নের মধ্যে কোন বস্তুর অস্তিত্ব ছাড়াই তিনি একটা জগৎ সৃষ্টি করে থাকেন এবং প্রত্যেকটি অবাস্তব বা মৃত ও অস্তিত্বহীন বস্তুকে অস্তিত্ববান করে দেখান। আর এটাই হচ্ছে তাঁর সব ক্ষমতার নমুনা। মূর্খ সে, যে তাঁর ক্ষমতাসমূহকে অস্বীকার করে। অন্ধ সে, যে তাঁর ক্ষমতার গভীরতার খবর রাখে না। তিনি সব কিছু করেন এবং করতে পারেন, শুধু সেই বিষয় ছাড়া যা তাঁর মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এবং যা তাঁর অঙ্গীকারের পরিপন্থী। তিনি এক-ওয়াহেদ তাঁর আপন সত্তায় এবং গুণাবলীতে এবং কর্মকান্ডে এবং শক্তিসমূহে। তাঁর কাছে পৌঁছার বাকী তামাম দরজাই বন্ধ হয়ে গেছে একমাত্র এই দরজা ছাড়া, যা খুলে দিয়েছে ফুরকানে মজীদ।" - (আল্ ওসীয়্যত, পৃঃ ১৪-১৭)

'আল্‌হামদুল্লিাহ্'। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র। সকল প্রশংসা সেই মা'বূদে বরহক্ক্-এর, সেই সত্যে উপাস্যের, যাঁর সত্তায় সন্নিবিষ্ট সমস্ত পূর্ণ ও পারফেক্ট গুণাবলী, নাম যাঁর **আল্লাহ্**। আমরা পূর্বেই বর্ণনা করে এসেছি যে, কোরআন শরীফের বাগধারায় 'আল্লাহ্' হচ্ছে সেই কামেল ও পারফেক্ট সত্তার নাম যিনি হচ্ছেন মা'বূদে বরহক্ক্ এবং পূর্ণ ও সর্বোত্তম গুণাবলীরও আধার এবং সকল দোষত্রুটি থেকেও সম্পূর্ণ মুক্ত এবং এক ও অংশীবিহীন-ওয়াহেদ ও লা-শরীক। এবং সমস্ত কৃপা ও কল্যাণের উৎস-প্রস্রবণ। কেননা, খোদাতাআলা তাঁর পবিত্র বাণী কোরআন শরীফে তাঁর নাম 'আল্লাহ্'-কে অন্য সকল নাম ও গুণাবলীর আধার সাব্যস্ত করেছেন। এবং কোনখানেই অপর কোন নামকেই এই মর্যাদা দেন নি। আল্লাহ্ নামটি সকল প্রকার প্রশংসার সমষ্টিরূপ হওয়ার কারণে অন্যান্য সকল গুণেরই আধার হয়েছে, যেগুলি নিহিত রয়েছে ঐ নামেরই মধ্যে। এবং যেহেতু তা নামসমূহের সমষ্টি এবং সকল গুণাবলী দ্বারা গুণান্বিত, সেহেতু এর তাৎপর্য এটাই যে, এর ব্যাপকত্বের অভ্যন্তরে তামাম পূর্ণ ও পারফেক্ট গুণাবলী সন্নিবেশিত রয়েছে। অতএব, **আল্‌হামদুলিল্লাহ্**- এর সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য হচ্ছে, সকল প্রকারের প্রশংসা—তা সে প্রকাশ্যই হোক আর গোপনই হোক, ব্যক্তিগত ঔৎকর্ষ সম্পর্কিত হোক আর প্রাকৃতিক বিস্ময়াদি সম্পর্কেই হোক, তা সবই 'আল্লাহ্'-এর জন্য খাস বা বিশিষ্ট। এবং এর মধ্যে অপর আর কোন শরীক বা অংশীদার নেই। এছাড়া, যতটা সম্ভব প্রকৃত প্রশংসা এবং সর্বোত্তম গুণাবলীর কথা যা কোন জ্ঞানী-জনের জ্ঞান উপলব্ধি করতে পারে, তার সমস্ত সৌন্দর্যই আল্লাহ্‌তাআলার মধ্যে মজুদ রয়েছে। এবং এমন কোন সৌন্দর্য নেই,যে সৌন্দর্য মানববুদ্ধি প্রকাশ করতে পারে বা ধারণা করতে পারে অথচ সেই সৌন্দর্য থেকে হতভাগ্য মানুষের মতই আল্লাহ্‌তাআলা বঞ্চিত রয়েছেন। বরং, কোন জ্ঞানী ব্যক্তি এমন কোন সৌন্দর্যই পেশ করতে পারবেন না, যা খোদাতাআলার মধ্যে পাওয়া যাবে না। মানুষ যতটা সম্ভব বেশী থেকে বেশী সৌন্দর্যাবলীর কল্পনা করতে সক্ষম তা সবই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। এবং তাঁর সত্তা ও গুণাবলী ও প্রশংসা সমগ্র রূপেই পরিপূর্ণ ও উত্তম এবং তা সবই সর্বপ্রকারের দোষ- ত্রুটি থেকে পবিত্র।

এখন দেখো! এ এমন এক সত্যতা যদ্দারা সত্য ও মিথ্যা ধর্মের পার্থক্য প্রকাশিত হয়ে পড়ে। কেননা, সকল ধর্মকে নিয়ে চিন্তা করলে এটা পরিষ্কার বুঝা যাবে যে, ইসলাম ছাড়া দুনিয়াতে এমন আর কোন ধর্ম নেই যা খোদাতাআলাকে তামাম দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র এবং সমস্ত পূর্ণতম প্রশংসায় প্রশংসিত বলে মনে করে। সাধারণ হিন্দুরা তাদের দেবতাদেরকে খোদাতাআলার রবুবিয়্যত বা

প্রতিপালকত্বের শরীক বা অংশীদার বলে মনে করে এবং খোদার কার্যাবলীর মধ্যে তাদের (দেবতাদের) প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ বা অংশগ্রহণ রয়েছে বলে বিশ্বাস করে। বরং, এ-ও মনে করে যে, তারা (দেবতারা) খোদার ইচ্ছা-অঙ্গীকারকেও বদলাতে পারে এবং তাঁর (খোদার) নিরূপিত তক্দীরকেও ওলট-পালট করে দিতে পারে। এছাড়া হিন্দু লোকেরা কোন কোন মানুষ এবং জন্তুর সম্পর্কে, এমন কি, কোন কোন অপবিত্র এবং নোংরা ও বিষ্টাখোর পশু যেমন, শূকর ইত্যাদি সম্পর্কেও এই ধারণা পোষণ করে যে, যুগে যুগে তাদের পরমেশ্বর এই শ্রেণীর যোনিতে যোনিতে জন্মগ্রহণ করে করে সেই সকল অকল্যাণ এবং পাপ-যোনিতে পঙ্কিলতায় জড়িত হয়ে আসছিলেন, যা কিনা সেগুলিরই বাস্তব অবস্থা। এছাড়া তিনি অন্য সকলের মতই ক্ষুধা ও তৃষ্ণা, দুঃখ, ও বেদনা, ভয় ও চিন্তা, ব্যাধি ও মৃত্যু, লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা, অসহায়তা ও দুর্বলতার শিকারে পরিণত হয়ে হয়ে আসছিলেন। অতএব, এথেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, ঐ জাতীয় বিশ্বাস খোদাতাআলার গুণাবলীকে নস্যাৎ করে দেয়। এবং তাঁর চিরন্তন ও চিরস্থায়ী গৌরব ও মহিমাকে দারুণভাবে ম্লান করে দেয়।

এবং আর্যসমাজীরা, যারা ওদের ধর্মীয় ভাই, তারা এই ধারণা রাখে যে, তারা ঠিক ঠিক বেদের রাস্তা অনুসরণ করেই চলে। তারা খোদাতাআলার সৃষ্টি করবার ক্ষমতাকেই অস্বীকার করে। তারা সমস্ত আত্মাকে খোদার স্বয়ম্ভু সত্তার মতই অ-সৃষ্ট মনে করে এবং মনে করে যে, আত্মাগুলি ওয়াজেবুল অজুদ বা অপরিহার্য অস্তিত্ব (Necessary Being) বা স্ব-অস্তিত্ববান এবং আদি থেকেই স্বতঃই সত্তাবান। অথচ, সুস্থ-বুদ্ধি খোদাতাআলা সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে এটাকে একটা ত্রুটি মনে করে যে, তিনি সৃষ্টির মালিক হওয়া সত্ত্বেও কোন কিছুর স্রষ্টা ও প্রতিপালক নন। এবং বিশ্ব-জগতের জীবন তাঁর সাহায্য ও আশ্রয়ের উপর নির্ভরশীল নয়, বরং তা স্ব-নির্ভর এবং স্ব-অস্তিত্বশীল। যদি সুস্থ-বুদ্ধির সামনে এই দুটি প্রশ্ন পেশ করা হয় যে, সর্বশক্তিমান খোদাতাআলার সমগ্র প্রশংসাবলীর ক্ষেত্রে একথা কি সত্যিই যথার্থ ও যথোপযুক্ত যে, তিনি স্বয়ং তাঁর অসীম শক্তির দ্বারা সমগ্র সৃষ্টিকেই অস্তিত্বে আনয়ন করেছেন এবং সেই সমস্ত কিছুরই প্রতিপালক ও স্রষ্টা হয়েছেন, এবং সারাটা সৃষ্টির ধারা তাঁরই প্রতিপালকত্ব বা রবুবিয়্যতের উপরেই নির্ভরশীল, এবং সৃষ্টি করবার গুণ ও ক্ষমতা তাঁরই পারফেক্ট বা কামেল সত্তার মধ্যেই বিদ্যমান, এবং তিনি জন্ম ও মৃত্যুর ক্ষতি বা প্রভাব থেকে পবিত্র (অর্থাৎ জন্ম ও মৃত্যু থেকে মুক্ত)? কিংবা, খোদাতাআলার মহামহিমার ক্ষেত্রে একথা কি যথোপযুক্ত যে, এই যে বিশাল বিশ্বজগত, যার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ তাঁর হাতে, তার কোন কিছুই তাঁর সৃষ্টি নয়, এবং তাঁর সাহায্য ও আশ্রয় বা ছাহারার উপরে নির্ভশীল নয়, এবং সেগুলির অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী নয়, এবং তিনি না সেগুলির স্রষ্টা ও প্রতিপালক, না তাঁর মধ্যে

স্রষ্টাত্বের গুণ ও শক্তি বিদ্যমান, এবং না তিনি জন্ম ও মৃত্যুর ক্ষতি ও প্রভাব থেকে মুক্ত ?

তাহলে, যুক্তি বা আকল্ কখনই এই ফতওয়া বা সিদ্ধান্ত দেয় না যে, যিনি এই বিশ্বজগতের মালিক তিনি এই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা নন, এবং হাজারো বিস্ময়কর গুণাবলী যা আত্মাসমূহ ও দেহসমূহের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, তা সবই আপনা আপনি সৃষ্টি হয়েছে এবং সেগুলির কোন সৃষ্টিকর্তা নেই। এবং খোদা যিনি ঐ সমস্ত কিছুরই মালিক বলে নিজেকে দাবী করেন তিনি নাম-কা-ওয়াস্তে এক মালিক মাত্র। এছাড়া, (যুক্তি বা আকল্) এই সিদ্ধান্তও দেয় না যে, সৃষ্টি করার মত তাঁর (খোদাতাআলার) কোন ক্ষমতাই নেই, এবং তিনি দুর্বল, অসহায় ও ত্রুটিপূর্ণ কিংবা, তিনি নাপাক ও নোংরা ভক্ষণকারীর ন্যায় নীচ ও কদর্য অভ্যাসের অধিকারী কিংবা তিনি মৃত্যু, শোক, দুঃখ, অকর্মণ্যতা ও অজ্ঞতার অধীন। বরং, যুক্তি (Reason) পরিষ্কার এই সাক্ষ্য দান করে যে, খোদাতাআলাকে ঐ সব নীচ বৈশিষ্ট্যাবলী এবং দোষ-ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে ; এবং পূর্ণ-পরিশুদ্ধতা বা পূর্ণ পারফেকশানের দাবী হচ্ছে পূর্ণ ক্ষমতারও অধিকারী হওয়া। আর যদি খোদাতাআলা পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী না হন অর্থাৎ যদি তিনি অপর কোন কিছু সৃষ্টি করতে না পারেন, যদি নিজের সত্তাকে কোন প্রকারের ক্ষতি থেকে বাঁচাতে না পারেন, তাহলে বুঝতে হবে যে, তিনি পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারীও নন। আর. পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী না হলে তো তিনি পূর্ণ প্রশংসারও যোগ্য নন। আর এটাই হচ্ছে হিন্দু ও আর্যদের অবস্থা।

এবং খৃষ্টানরা যা কিছু খোদাতাআলার গৌরব প্রকাশ করে থাকে, তা এমন একটা বিষয় যে, তা একটি মাত্র প্রশ্নের মাধ্যমেই বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝতে সক্ষম। অর্থাৎ, যদি কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা যায় যে, কি? এটা কি ঠিক যে, যে খোদার সত্তা পূর্ণ বা কামেল এবং চিরন্তন এবং গনী বেনিয়াজ বা স্বয়ংসম্পূর্ণ, যিনি তাঁর সমস্ত মহিমান্বিত কর্মকাণ্ড, যা তিনি আদি থেকেই সম্পাদন করে আসছেন এবং যা সম্পাদনে তিনি নিজে নিজেই যথেষ্ট; এবং যিনি একাকী কোন পিতা বা পুত্রের প্রয়োজনীয়তা ছাড়াই স্বয়ং সমগ্র জগতকে সৃষ্টি করেছেন ; স্বয়ং সকল আত্মা ও দেহকে তাদের প্রয়োজনীয় তাবৎ শক্তি দান করেছেন; স্বয়ং সমগ্র সৃষ্টির রক্ষাকর্তা ও স্থিতিদাতা ও নিয়ন্ত্রণকর্তা, এমনকি তাদের অস্তিত্ব প্রাপ্তির পূর্বেই তাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুকেই নিজের রহমানিয়ত-এর গুণের কারণে সৃষ্টি করে রেখেছেন; এবং কোন কর্মীর কোন কর্মফলের অপেক্ষা না করেই সূর্য এবং চন্দ্র এবং অগণিত নক্ষত্ররাজি, এবং পৃথিবী ও পৃথিবীর হাজারো নেয়ামত মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন শুধু আপনার দয়া ও কৃপাবশে; এবং এ সমস্ত কিছুই তিনি সম্পন্ন করেছেন কোন পুত্রের মুখাপেক্ষী না হয়েই;- তাহলে, তিনি- সেই কামেল খোদা এই আখেরী যামানায় এসে কী করে তাঁর সমস্ত গৌরব ও শক্তিকে নিঃশেষ করে দিয়ে ক্ষমা ও পরিত্রাণ দানের জন্য এক পুত্রের মুখাপেক্ষী হয়ে

গেলেন? এবং সেই পুত্রটিও এমন দুর্বল পুত্র যে, পিতার সঙ্গে যার কোন সাদৃশ্যই নেই; যে তার পিতার মত না আসমানের কোন কিছু সৃষ্টি করেছে, না পৃথিবীর এমন কোন বস্তু, যা থেকে তার ঈশ্বরত্বের একটা প্রমাণ পাওয়া যেত। বরং মার্ক লিখিত সুসমাচারের ৮ অধ্যায়, ১২ আয়াতে তার দুর্বল অবস্থার এই বর্ণনা দেওয়া আছে যে, সে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেছিল, 'এ যুগের লোকেরা নিদর্শন দেখতে চায় কেন। আমি তোমাদেরকে সত্যসত্যই বলছি যে, এ যুগের লোকেদের জন্য কোন নিদর্শনই প্রদর্শিত হবে না'। এবং তার ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সময়েও ইহুদীরা বলেছিল যে, সে যদি আমাদের সামনে জিন্দা হয়ে যায়, তাহলে আমরা ঈমান আনবো। কিন্তু সে তাদেরকে জীবিত হয়ে ওঠা দেখায়নি। এবং নিজের খোদায়ী এবং খোদায়ী শক্তির সামান্যতম প্রমাণও পেশ করতে পারেনি। আর যদি কিছু মো'জেযা সে দেখিয়েও থাকে, তবে তা দেখানোর পূর্বে বহু নবী অনুরূপ মো'জেযা অনেক দেখিয়ে গেছেন। এমনকি, সে যুগে একটা পুকুরের পানিতেও অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটতে দেখা গিয়েছিল। (দ্রঃ যোহন লিখিত সুসমাচার, পঞ্চম অধ্যায়)। সংক্ষেপে, সে তার খোদা হওয়ার স্বপক্ষে কোনও প্রমাণ পেশ করতে পারেনি। যেমন তা বর্ণিত আছে উল্লিখিত আয়াতেও। বরং এক দুর্বল নারীর গর্ভে জন্ম লাভ করে (খৃষ্টানদের বর্ণনা মতে) সে সারাটি জীবনভর লাঞ্ছনা, অবমাননা ও অসহায় অবস্থার মধ্যে কালাতিপাত করেছে, যা কিনা মানুষের মধ্যে থেকে সেইসব মানুষের কপালে জোটে যারা দুর্ভাগা, যারা হতভাগ্য। আবার সে একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত গর্ভাশয়ের অন্ধকারে কয়েদী থেকে নাপাক-প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে পয়দা হয়েছে। এবং জন্ম গ্রহণের সমস্ত অবস্থার কষ্টই তাকে পোহাতে হয়েছে। এবং মানবীয় দুঃখ-দুর্দশা এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে এমন কিছু বাকী ছিল না, যার ফলে ঐ পুত্র পিতার বদনামকারী হওয়ার দোষ থেকে মুক্ত থাকতে পারতো। আবার সে নিজেই নিজের পুস্তকে নিজের অজ্ঞতা, জ্ঞানহীনতা, ক্ষমতাহীনতা এবং সৎলোক না হওয়ার কথা স্বীকার করেছে। অথচ, এত সব সত্ত্বেও ঐ বিনীত বান্দাকে খামাখাই খোদার পুত্র বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সে তো অন্যান্য বুযর্গ নবীগণের তুলনায় এল্‌মী ও আমলী বা জ্ঞানের ও কর্মের মর্যাদায় অপেক্ষাকৃত কম মর্যাদাসম্পন্ন ছিল। এবং তার শিক্ষাও ছিল ত্রুটিযুক্ত শিক্ষা। এবং তা-ও ছিল মূসায়ী শরীয়তের একটা শাখা মাত্র। তাহলে, এটা কি করে সম্ভব যে, সর্বশক্তিমান খোদাতাআলা, যিনি চিরঞ্জীব ও চিরন্তন, তাঁর প্রতি এই কলঙ্ক আরোপ করা যাবে যে, তিনি সর্বদা তাঁর আপন সত্তায় পূর্ণ- পারফেক্ট এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও, অবশেষে, একজন দুর্বল পুত্রের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছিলেন এবং নিজের সমস্ত গৌরব ও মহিমা ও মর্যাদাকে সাকল্যে হারিয়ে বসেছিলেন? আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না যে, কোন জ্ঞানী মানুষ ঐ পূর্ণ ও পারফেক্ট বা কামেল সত্তা-যিনি সমস্ত কামেল বা সর্বোত্তম গুণাবলীর আধার -তাঁর সম্পর্কে এই ধরনের কোন অবমাননাকর অবস্থার কথা কল্পনা করতে পারে। – (বারাহীনে আহ্‌মদীয়া , পৃঃ ৪১৩-৪১৯, পাদটীকা -১১)

'একথা কোন বিতর্ক ছাড়াই কবুল করার যোগ্য যে, সেই সত্য এবং কামেল খোদা যার উপরে ঈমান আনা প্রত্যেক বান্দার জন্য ফরয-অপরিহার্য কর্তব্য, তিনি হচ্ছেন **রব্বুল আলামীন** – জগতসমূহের-প্রভু প্রতিপালক। এবং তাঁর রবুবিয়্যত বা প্রতিপালকত্ব বিশেষ কোন জাতির জন্য সীমাবদ্ধ নয়। এবং তা না কোন বিশেষ যামানা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, না কোন বিশেষ দেশ পর্যন্ত। বরং তিনি সকল জাতির ও গোত্রের প্রতিপালক এবং সকল যুগের প্রতিপালক। এবং সকল স্থানের প্রতিপালক। সকল দেশসমূহের তিনিই প্রতিপালক এবং তিনিই সমস্ত কৃপা ও কল্যাণের উৎস - প্রস্রবণ। যাবতীয় দৈহিক ও আত্মিক শক্তি তাঁরই দান। তাঁরই দ্বারা সমগ্র বিশ্বজগত লালিত ও পালিত এবং তিনিই সমস্ত কিছুর ছাহারা – সহায় ও আশ্রয়।

খোদাতায়ালার সাধারণ কৃপা ও কল্যাণ সকল জাতি এবং সকল দেশ এবং সকল যামানাকে পরিবেষ্টন করে আছে। এটা এজন্যই হয়েছে যাতে কোন জাতির অভিযোগ করার কোন সুযোগ না থাকে, এবং কেউ একথা না বলতে পারে যে, খোদা অমুক অমুক জাতির প্রতি অনুগ্রহ করেছেন তো বটে, কিন্তু আমাদের প্রতি করেননি। কিংবা, অমুক জাতি তাঁর কাছ থেকে হেদায়াত লাভের জন্য কিতাব পেয়েছে, কিন্তু আমরা পাইনি। কিংবা, অমুক যামানায় তিনি ঐশীবাণী বা ওহী ও ইল্‌হাম এবং অলৌকিক নিদর্শন বা মো'জেযার মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশিত করেছিলেন, কিন্তু আমাদের যামানায় গুপ্তই থেকে গেছেন। কাজেই, তিনি আম ফয়েয অর্থাৎ সাধারণ কৃপা প্রদর্শন করে ঐ সমস্ত অভিযোগ খণ্ডন করেছেন, মিটিয়ে দিয়েছেন। এবং এমনভাবে আপন উন্নত আখলাক বা চারিত্র্য প্রদর্শন করেছেন যে, দৈহিক ও আত্মিক কৃপারাজি থেকে কোন জাতিকেই বঞ্চিত রাখেননি এবং কোন যামানাকেও হতভাগ্য রাখেন নি।' – (পয়গামে সুলেহ্‌, পৃঃ ১০-১১)।

(১৩)

'খোদাতালা তাঁর বিনীত বান্দাদেরকে তাঁর পূর্ণ মা'রেফাত-এর জ্ঞান দান করার জন্য নিজের গুণাবলীকে কোরআন শরীফের মধ্যে দু'ভাবে প্রকাশ করেছেন।

(১) প্রথম, সেই পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন, যার মধ্যে তাঁর গুণাবলীর সঙ্গে রূপকের আকারে সৃষ্টির গুণাবলীর সাদৃশ্য বর্তমান। যেমন তিনি করীম রহীম – মহানুভব ও দয়াবান। তিনি উপকার করেন, আবার ক্রোধও প্রকাশ করেন। এবং তাঁর মধ্যে ভালবাসাও রয়েছে। তাঁর (কুদরতের) হাতও আছে, চোখও আছে এবং তাঁর পা বা পায়ের নলাও আছে। এবং তাঁর কানও আছে। এবং আদি থেকেই সৃষ্টির ধারা তাঁর সাথে সাথেই চলে আসছে। কিন্তু, কোন কিছুরই তাঁর

মোকাবেলায় একক ব্যক্তিগত অস্তিত্ব নেই ; আছে প্রজাতিগত সহ-অস্তিত্ব। যদিও তা খোদার সৃজনকারী গুণের জন্য জরুরী বিষয় নয়। কেননা, যেমন খাল্‌ক অর্থাৎ সৃষ্টি করা তাঁর গুণসমূহের অন্তর্গত, তেমনি কখনও এবং কোন যামানায় একত্ব এবং নিঃসঙ্গতা প্রকাশও তাঁর গুণাবলীর অন্তর্গত। এবং তাঁর কোন গুণই স্থায়ীভাবে অকেজো হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তবে, হ্যাঁ সাময়িকভাবে নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে। সংক্ষেপে খোদা মানুষ সৃষ্টি করে তার প্রতি তাঁর সেই সব সাদৃশ্যসূচক গুণ প্রকাশিত করেছেন, যে গুণাবলীর সঙ্গে মানুষ দৃশ্যতঃ অংশীদারিত্ব রাখে। যেমন, স্রষ্টা হওয়া। কেননা, মানুষও তাঁর সীমা পর্যন্ত অনেক কিছুর স্রষ্টা বা রূপকার হতে পারে। এমনিভাবে, মানুষকে করীম বা মহানুভব বলা যেতে পারে, কেননা, সে তার সীমা পর্যন্ত 'করম' বা মহানুভবতার গুণ নিজের মধ্যে ধারণ করে। একইভাবে মানুষকে রহীমও বলা যেতে পারে, কেননা সে তার সীমা পর্যন্ত রহম বা দয়ার ক্ষমতা নিজের মধ্যে ধারণ করে। এবং তার মধ্যে ক্রোধেরও শক্তি আছে। এছাড়া চোখ, কান ইত্যাদিও রয়েছে মানুষের। সুতরাং, এই সকল সাদৃশ্যসূচক গুণের কারণে কারও মনে এই সন্দেহ সৃষ্টি হতেও পারে যে, হয়ত মানুষ এই সকল গুণাবলীর কারণে খোদারই সদৃশ, এবং খোদাও মানুষের সদৃশ। এজন্যই খোদাতায়ালা এই সব গুণের মোকাবেলায় কোরআন শরীফের মধ্যে তাঁর তান্‌যিহী অর্থাৎ অতিক্রান্ত (Transcendental) গুণাবলীর কথাও বলেছেন। অর্থাৎ এমন সব গুণের বর্ণনা করেছেন যাথেকে প্রমাণিত হয় যে, খোদার সত্তা ও গুণাবলীর সাথে মানুষের কোন প্রকার অংশীদারিত্ব নেই। মানুষের সাথেও তাঁর কোন অংশীদারিত্ব নেই। না তাঁর সৃষ্টি করা, মানুষের সৃষ্টি করার মত। না তাঁর রহম (দয়া) মানুষের রহম-এর ন্যায়। না তাঁর ক্রোধ মানুষের ক্রোধের ন্যায়। না তাঁর ভালবাসা মানুষের ভালবাসার ন্যায়। না তিনি মানুষের মত কোন স্থান-এর মুখাপেক্ষী। এবং এই বর্ণনা অর্থাৎ খোদা যে তাঁর গুণাবলীতে মানুষের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তার বর্ণনা কয়েক জায়গায় পরিষ্কারভাবে দেওয়া আছে কোরআন শরীফে ঃ যেমন. এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ লَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

অর্থাৎ, কোন কিছুই তার সত্তা ও গুণে খোদার শরীক নয়, এবং তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা –(৪২ঃ১২)। আর এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۗ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۗ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

'আল্লাহ্ – তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই ; তিনি চিরঞ্জীব (এবং জীবনদাতা), চিরস্থায়ী (এবং স্থিতিদাতা) : তাঁকে না তন্দ্রা স্পর্শ করতে পারে

এবং না নিদ্রা। যা কিছু আকাশমন্ডলীতে আছে এবং যা কিছু পৃথিবীতে আছে সবই তাঁর। কে আছে (এমন) যে, তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে শাফায়াত (সুপারিশ) করতে পারে ? তাদের সামনে যা কিছু আছে এবং তাদের পিছনে যা কিছু আছে (তা) সবই তিনি জানেন, তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না, কেবল তা ব্যতিরেকে যা তিনি চান। তার জ্ঞান (এবং শাসনক্ষমতা) আকাশমন্ডলীকে এবং পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে আছে। সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না ; বস্তুতঃ তিনি অতীব উচ্চ, মহিমান্বিত।' – (২:২৫৬)।

অর্থাৎ, সত্য অস্তিত্ব ও সত্য স্থায়িত্ব এবং সমস্ত সত্যিকারের গুণাবলী খাসভাবে একমাত্র খোদারই জন্যে ; এবং এসবের মধ্যে তাঁর কোন শরীক নেই। সত্তাগতভাবেই তিনি সদা-জীবিত এবং বাকী সমস্ত কিছু তাঁর থেকেই জীবিত, এবং তিনি তাঁর সত্তায় স্বয়ং চিরস্থায়ী এবং বাকী সমস্ত কিছুর স্থায়িত্ব তাঁরই সহায়তায় সম্ভব। মৃত্যু যেমন তাঁকে প্রভাবিত করতে পারে না, তেমনি তাঁর ইন্দ্রিয়ের সাময়িক বিরতি, যেমন নিদ্রা বা তন্দ্রা, তা-ও তাঁকে প্রভাবিত করতে পারে না। কিন্তু, অন্যদের উপরে মৃত্যু যেমন আসে, তেমনি আসে নিদ্রা ও তন্দ্রাও। পৃথিবীতে যা কিছু তোমরা দেখতে পাও কিংবা আসমানে দেখতে পাও, সবই তাঁরই এবং তাঁর থেকেই প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত। কে আছে এমন যে, তাঁর হুকুম ছাড়াই তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে ? তিনি তা সব কিছুই জানেন যা মানুষের সামনে ও পিছনে আছে। অর্থাৎ তাঁর জ্ঞান প্রকাশ্য এবং গোপন সব কিছুকেই পরিবেষ্টন করে আছে। এবং কেউই এমন নেই যে তাঁর জ্ঞানের কোন কুল-কিনারা করতে পারে, অবশ্য যতটুকু তিনি চান ততটুকু ছাড়া। তাঁর শক্তি ও জ্ঞান সমগ্র পৃথিবী ও আসমানসমূহে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। তিনি সব কিছুরই অবলম্বন। কিন্তু এমন নয় যে, কোন কিছু তাঁরও অবলম্বন আছে। তিনি আসমান ও যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সমস্ত কিছুর রক্ষণাবেক্ষণে ক্লান্ত হন না। তিনি এ কথার বহু উর্ধে যে, তাঁর প্রতি দুর্বলতা এবং অসহায়তা এবং শক্তিহীনতা আরোপ করা যায়।

আরও এক স্থানে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ

'নিশ্চয় তোমাদের প্রভু সেই আল্লাহ্ যিনি আকাশমন্ডল ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে ; অতঃপর তিনি অধিষ্ঠিত হয়েছেন 'আরশ'-এর উপরে' . . . . ১০ঃ৪)।

তোমাদের প্রতিপালক হচ্ছেন সেই খোদা যিনি যমীন ও আসমানকে ছয় দিনে পয়দা করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের উপরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। অর্থাৎ যমীন ও আস্মান এবং সেগুলির মধ্যে যা কিছু রয়েছে তা সবই সৃষ্টি করবার পর এবং তাশ্‌বিহী বা সাদৃশ্যসূচক (অর্থাৎ, Immanent বা অনুস্যূত) গুণাবলী প্রকাশিত করবার পর, পুনরায় 'তান্‌যিহী' (অর্থাৎ, Transcendental বা অতিক্রান্ত) গুণাবলীকে প্রমাণিত করার জন্য স্বীয় অতিক্রান্ত ও ঐকল্য-এর

মোকাম বা অবস্থানের প্রতি নিজেকে নিবিষ্ট করেছেন। তাঁর এই মোকাম অতিক্রান্ত থেকে অতিক্রান্ত (Beyond of beyond) এবং সৃষ্টির নৈকট্য ও সন্নিধান থেকে বহু বহু দূর। এই যে অতি সমুন্নত মোকাম তাকেই **'আরশ'** নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, প্রথমে সমগ্র সৃষ্টি ছিল অস্তিত্বহীন এবং খোদাতালা তাঁর সেই অতিক্রান্ত থেকে অতিক্রান্ত বা 'ওরাউল ওরা' অবস্থানে বা মোকামে আপন জ্যোতির্ময়তা প্রকাশিত করছিলেন, যার নাম **আরশ**। অর্থাৎ সেই যে মোকাম তা প্রত্যেক জগৎ থেকে উন্নত এবং ঊর্ধে, এবং তাঁরই প্রকাশ ও আলোকের বিম্ব। সেখানে তাঁর সত্তা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। অতঃপর, তিনি পৃথিবী ও আকাশমন্ডলী এবং এসবের মধ্যে যা কিছু রয়েছে, সৃষ্টি করলেন। এবং যখন সৃষ্টি-জগৎ প্রকাশিত হয়ে গেল, তখন তিনি আবারও আপন সত্তাকে গোপন করে ফেললেন এবং চাইলেন যে, এই সৃষ্টির মাধ্যমেই তাঁকে সনাক্ত করা হোক। কিন্তু, একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, ঐশী গুণাবলী বা সিফাতে ইলাহীয়া কখনই চিরস্থায়ীভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় না, এবং খোদা ছাড়া কোন কিছুই একক ব্যক্তিগত অস্তিত্ব নেই, আছে প্রজাতিগত সহ-অস্তিত্ব। এবং খোদার কোন গুণের স্থায়ী নিষ্ক্রিয়তা নেই বটে, কিন্তু সাময়িকভাবে নিষ্ক্রিয় থাকার প্রয়োজন রয়েছে। এবং যেহেতু, সৃষ্টি করার গুণ ও ধ্বংস করার গুণ পরস্পর বিরোধী, সেহেতু ধ্বংস করার গুণ যখন পূর্ণরূপে ক্রিয়াশীল হয়, তখন সৃষ্টি করার গুণ একটা দওর বা মেয়াদকাল পর্যন্ত নিষ্ক্রিয় থাকে। সংক্ষেপে, শুরুতে ছিল খোদাতায়ালার ঐকল্য (ওয়াহ্দাত) গুণের ক্রিয়াশীলতার কাল। আমরা বলতে পারি না যে, এই মেয়াদ কাল কতবার প্রকাশিত করা হইয়াছিল। বরং, বলতে হয় যে, এই মেয়াদকাল বা দওর অতি-প্রাচীন ও সীমাহীন। যাহোক, অন্যান্য সকল গুণের উপর ঐকল্য বা ওহাদাত গুণের মেয়াদকাল বা দওর-এর অগ্রাধিকার রয়েছে। সুতরাং এই প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, শুরুতে খোদাতায়ালা একলাই ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে কেউই ছিল না। অতঃপর খোদা যমীন ও আসমান এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সব সৃষ্টি করলেন। এবং এই সূত্রেই তিনি তাঁর এই নামগুলি প্রকাশ করলেন যে, তিনি করীম ও রহীম, তিনি ক্ষমাকারী ও তওবা কবুলকারী। কিন্তু, যে ব্যক্তি পাপে রত থাকে, পাপ পরিহার করে না, তাকে তিনি শাস্তি না দিয়ে ছাড়েন না। তিনি তাঁর এই নাম-ও প্রকাশ করেছেন যে, তিনি তওবা বা অনুতাপকারীকে ভালবাসেন, এবং তাঁর ক্রোধ বা গযব কেবল সেই সকল লোকের উপরেই পতিত হয় যারা যুলুম ও অন্যায় ও পাপকার্য থেকে বিরত হয় না।

... ...

এই সমস্ত গুণাবলীই তাঁর সত্তার সঙ্গে যথোপযোগী, এগুলি মানুষের গুণ-এর মত নয়। তাঁর চক্ষু কোন দেহ বা দৈহিক নয়। তাঁর গুণ মানুষের কোন গুণ-এর মত নয়। যেমন, মানুষ তার ক্রোধের সময় প্রথমে নিজেই ক্রোধজনিত কষ্ট পায়, উত্তেজনা ও ক্রোধের দরুন তৎক্ষণাৎ তার হৃদয়ের প্রশান্তি দূর হয়ে জ্বলন সৃষ্টি হয় এবং তার মস্তিষ্কে চাপ সৃষ্টি হয় এবং তার গোটা অবস্থার মধ্যেই এক প্রকার পরিবর্তন দেখা দেয়। কিন্তু খোদা এই সকল পরিবর্তন থেকে মুক্ত। তাঁর

ক্রোধের অর্থ এটাই যে, যে ব্যক্তি অপকর্ম থেকে বিরত না হয়, তার উপর থেকে তিনি তাঁর সাহায্যের ছায়া অপসারণ করে নেন এবং তাঁর আদিম প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী তার সঙ্গে ঠিক তেমনই ব্যবহার করেন, যেমন ব্যবহার করে কোন ক্রোধান্বিত ব্যক্তি। একারণেই, রূপকভাবে, খোদার এইরূপ ব্যবহারকেই বলা হয় তাঁর ক্রোধ বা গযব। তেমনিভাবে, তাঁর ভালবাসা মানুষের ভালবাসার মত নয়। কেননা, মানুষ ভালবাসার কারণেও কষ্ট পায়। তার ভালবাসার পাত্র পৃথক বা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে তার প্রাণ কষ্টে পতিত হয়। কিন্তু খোদা এই সব কষ্ট থেকে পবিত্র। তেমনিভাবে, তাঁর নৈকট্য মানুষের নৈকট্যের মত নয়। কেননা, মানুষ যখন একজনের নিকটস্থ হয়, তখন সে তার পূর্ববর্তী অবস্থান পরিত্যাগ করে। কিন্তু, খোদা নিকট হওয়া সত্ত্বেও দূর এবং দূর হওয়া সত্ত্বেও নিকট। সংক্ষেপে, খোদাতায়ালার প্রত্যেকটি গুণ মানুষের গুণাবলী থেকে আলাদা। এর মধ্যে সাদৃশ্য শুধু শব্দের বা কথার, এর বেশী নয়। এজন্যই, খোদাতায়ালা কোরআন শরীফে বলেছেনঃ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ অর্থাৎ কোন কিছুই স্বীয় সত্তায় ও গুণাবলীতে খোদাতায়ালার মত নয়।' (৪২ঃ১২) (চশ্‌মা মারেফাত, পৃঃ. ২৬০ – ২৬৪)।

(১৪)

'খোদা কখনই নিষ্ক্রিয় হবেন না। তিনি সর্বদাই স্রষ্টা' সর্বদাই রিয্‌কদাতা, সর্বদাই প্রতিপালক, সর্বদাই রহ্‌মান – (অসীম ও অযাচিত দাতা) সর্বদাই রহীম (বারবার দানকারী) রয়েছেন এবং থাকবেনও। আমার মতে, এমন এক মহামহিমান্বিত অসীম ক্ষমতাধর ও সর্বাগুণাধার সম্পর্কে কোন বিতর্ক সৃষ্টির অর্থই পাপে পতিত হওয়া। খোদা এমন কোন কিছুই জোর করে চাপিয়ে দেন নি, যার কোন দৃষ্টান্ত তিনি দেন নি।'– (মালফুযাত, খ. ৪, পৃ. ২৪৭)।

(১৫)

'মনে রাখতে হবে যে, তারকারাজি যেমন সব সময় পর্যায়ক্রমে উদিত হয়ে থাকে, তেমনি খোদাতায়ালার গুণাবলীও উদিত হয়ে থাকে। কখনো মানুষ খোদার গৌরব ও স্বয়ং সম্পূর্ণতার গুণাবলীর প্রতিচ্ছায়ার নীচে আসে, আবার কখনো সৌন্দর্যের গুণাবলীর প্রতিচ্ছায়া তার উপরে পতিত হয়। এরই প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহতায়ালা বলেছেনঃ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ۝ (প্রতিদিন তিনি নব নব মহিমায় প্রকাশিত হন – (৫৫ঃ৩০)। অতএব, যদি এইরূপ ধারণা পোষণ করা হয় যে, পাপীদেরকে দোযখে দেওয়ার পর দয়া ও অনুকম্পার গুণগুলি চিরতরে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে এবং কখনই আর সেগুলির আলো বিচ্ছুরিত হবে না তাহলে, তা নিতান্তই অজ্ঞতার কথা হবে। কেননা, ঐশী গুণাবলীর পক্ষে নিষ্ক্রিয়তা সম্ভব নয়। বরং খোদাতায়ালার মৌলিক গুণাবলী হচ্ছে, ভালবাসা ও দয়া। এবং এগুলিই হচ্ছে সমস্ত গুণাবলীর জননী ; এগুলিই কখনও কখনও মানুষের সংশোধনের জন্য গৌরব ও গযব-এর গুণরূপে প্রকাশিত হয়। এবং যখন সংশোধন হয়ে যায়, তখন ভালবাসা তার আপনার রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয়। এবং সর্বদা ভালবাসার রূপ নিয়েই ক্রিয়াশীল থাকে। খোদা এমন কোন রগচটা

মানুষের মত নন, যে অহেতুক শাস্তি দেওয়াতেই আনন্দ পায়। তিনি কারো প্রতি যুলুম করেন না, বরং মানুষ নিজেই নিজের উপরে যুলুম করে। তাঁর প্রতি ভালবাসাতেই সব পরিত্রাণ, এবং তাঁকে পরিত্যাগ করাতেই সব শাস্তি।' – (চশ্‌মা মসীহি, পৃ. ৫১. ৫২)।

(১৬)

জানা প্রয়োজন যে, যে খোদার প্রতি কোরআন শরীফ আমাদেরকে আহ্‌বান করে তার মধ্যে তাঁর এই সব গুণাবলী লিখিত আছে ঃ

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۔ (الحشر: ٢٣)

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔

اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ
الْمُتَكَبِّرُ (الحشر: ٢٤)

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ
الْحُسْنٰى ۔ (الحشر: ٢٥)

يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ
الْحَكِيْمُ ۔ (الحشر: ٢٥)

عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۔ (البقرة : ١٤٩)

رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ (الفاتحة: ٢-٤)

اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۔ (البقرة: ١٨٧)

اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ۔ (اٰل عمران: ٣)

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ
وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۔ (الاخلاص)

অর্থাৎ সেই খোদা যিনি **ওয়াহেদ ও লা-শরীক** – এক ও অংশীবিহীন, তিনি ছাড়া আর কেউ উপাসনা ও আনুগত্য লাভের যোগ্য নেই। এটা এজন্যই বলা হয়েছে যে, যদি তিনি লা-শরীক না হন, তাহলে এমনও হতে পারে যে, তাঁর ক্ষমতার উপরে দুশ্‌মনের ক্ষমতা বিজয় লাভ করবে। এমনটি হলে তো তাঁর খোদায়ীই বিপদাপন্ন হয়ে পড়তো। এই যে বলা হয়েছে ঃ তিনি ব্যতীত কেউ উপাসনার যোগ্য নেই, এর তাৎপর্য হচ্ছে – তিনি এমন পারফেক্ট বা কামেল খোদা যাঁর গুণাবলী ও সৌন্দর্য ও কামালাত এত উচ্চ ও মহিমান্বিত যে, যদি সমগ্র বিশ্বজাহানের পূর্ণ গুণাবলীসম্পন্ন একজন খোদা নির্বাচন করার প্রয়োজন পড়ে, এবং হৃদয়ের মধ্যে উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্ট, উচ্চ থেকে উচ্চ কোন খোদার গুণাবলীর ধারণা করা যায়, তাহলে তিনিই হবেন সবার চাইতে বড়, যার চাইতে বড় আর কেউ হতে পারবে না। এবং তিনিই সেই খোদা যাঁর উপাসনায় অন্য কাউকে শরীক করাটা যুলুম করা হবে। আবার বলা হয়েছে ঃ তিনি **'আলেমুল গায়েব'** – অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত। অর্থাৎ, নিজের সত্তাকে কেবল নিজেই জানেন। তাঁর সত্তাকে কেউ পরিবেষ্টিত করতে পারে না। আমরা সূর্য এবং চন্দ্র এবং প্রতিটি সৃষ্টির আগাগোড়া দেখতে পারি, কিন্তু খোদার আগাগোড়া দেখা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আবার বলা হয়েছে ঃ তিনি সব দৃশ্য বিষয়ে পরিজ্ঞাত **'আলেমুশ্ শাহাদাত'**, অর্থাৎ, কোন কিছুই তাঁর দৃষ্টির অন্তরালে নেই। এটা সঙ্গত হতে পারে না যে, তিনি খোদা হবেন অথচ সৃষ্টিজগত সম্পর্কে গাফেল থাকবেন। তিনি এই বিশ্বজগতের প্রত্যেকটি অণু-পরমাণুর উপরে নযর রাখেন, কিন্তু মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়। তিনি জানেন যে, কখন তিনি এই শৃংখলাকে চূরমার করে দিবেন এবং কেয়ামত বা বিচার অনুষ্ঠিত করবেন। এবং তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না যে, কখন তা অনুষ্ঠিত হবে। অতএব, তিনিই সেই খোদা যিনি এই সমস্ত সময় সম্পর্কে অবগত। আবার বলা হয়েছে ঃ তিনি **'আর রহমান'** – অসীম ও অযাচিতভাবে দানকারী। অর্থাৎ, তিনি প্রাণিকুলের অস্তিত্ব এবং তাদের কর্মের পূর্বেই স্রেফ আপনার করুণাবশে, কোন প্রকার গরজ ছাড়াই এবং কারো কোন কর্মের বা কর্মের প্রতিফলের অপেক্ষা ছাড়াই, তাদের আরাম-আয়েশের জন্য সমস্ত ছামান ও সরঞ্জাম সরবরাহ করেন। যেমন, সূর্য এবং ভূমন্ডল এবং অন্যান্য সমস্ত কিছুকে আমাদের অস্তিত্ব এবং আমাদের কর্মের অস্তিত্বের পূর্বেই আমাদের জন্য সৃষ্টি করে রেখেছেন। এই দান-এর নামই খোদাতায়ালার কিতাবে – 'রহমানিয়্যত'। এবং এই কাজের প্রেক্ষিতেই খোদাতায়ালা নিজেকে বলেছেন – 'রহমান'। আবার বলা হয়েছে ঃ **'আর রহীম'**। অর্থাৎ, সেই খোদা উত্তম কাজের অধিক উত্তম পুরষ্কার দিয়ে থাকেন। এবং কারো পরিশ্রমকে নষ্ট করে দেন না। এবং এই কাজের প্রেক্ষিতে নিজেকে বলেছেন – রহীম। এবং এই গুণকে বলা হয় – 'রহীমিয়্যত'। আবার বলা হয়েছে **'মালেকে ইয়াওমেদ্দীন'**। অর্থাৎ সেই খোদা প্রত্যেকের প্রতিফল নিজের হাতে রেখেছেন। তাঁর এমন কোন কর্মকর্তা নেই যাকে তিনি যমীন ও আসমানের হুকুমত বা শাসন-কর্তৃত্ব সমর্পণ করেছেন ঃ এবং নিজে আলাদা হয়ে বসে রয়েছেন ; এবং নিজে আর কিছুই করেন না, এবং সেই কর্মকর্তাই সব

পুরস্কার ও শাস্তি দিয়ে থাকেন কিংবা আগামীতে দিবেন। আবার বলেছেন – **'আল্ মালেকুল কুদ্দুস'**। সেই খোদা হচ্ছেন বাদশাহ্ বা সম্রাট, যাঁর উপরে ক্রটির কোন চিহ্ন নেই। এটা তো জানা কথাই যে, মানবীয় বাদশাহাত বা সার্বভৌমত্ব ক্রটি থেকে মুক্ত নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ যদি সব প্রজারা দেশত্যাগ করে অন্য দেশে চলে যায়, তাহলে তো আর বাদশাহী কায়েম থাকবে না। কিংবা, যদি প্রজারা দুর্ভিক্ষ-পীড়িত হয়, তাহলে রাজস্ব আসবে কোত্থেকে। কিংবা যদি প্রজারা বিবাদ শুরু করে দেয় এবং বলে যে, তুমি আমাদের থেকে কোন দিক দিয়ে বড় (অর্থাৎ যদি সম্রাটের সার্বভৌমিকত্বই চ্যালেঞ্জ করে বসে) তাহলে, কিভাবে সে তার সার্বভৌমত্বের যোগ্যতা প্রমাণ করবে ? কিন্তু, খোদাতায়ালার বাদশাহী বা সার্বভৌমত্ব এরূপ নয়। তিনি এক মুহূর্তেই সমস্ত রাজ্যকে ধ্বংস করে দিয়ে নতুন জগৎ সৃষ্টি করতে সক্ষম। যদি তিনি এই রূপ স্রষ্টা ও সর্বশক্তিমান না হতেন, তাহলে, যুলুম ছাড়া তাঁর বাদশাহী চলতো না। কেননা, সেক্ষেত্রে, দুনিয়াকে তিনি একবার ক্ষমা করে দিয়ে ও পরিত্রাণ দিয়ে পুনরায় আর একটি দুনিয়া (শাসন করবার জন্য) কোথায় পেতেন ? কিংবা, পরিত্রাণ বা নাজাতপ্রাপ্ত লোকদেরকে কি পুনরায় পৃথিবীতে পাঠাবার জন্য ধরে ধরে আনতেন এবং অত্যাচারের পথ অবলম্বন করে ক্ষমা ও নাজাতপ্রাপ্ত সব মানুষগুলোকে ফেরৎ নিয়ে আসতেন ? এমনটি হলে তো তাঁর খোদায়ী বা ঈশ্বরত্ব সম্পর্কেই প্রশ্ন উঠতো, এবং তিনি দুনিয়াবী বাদশাহগণের মতই এক ক্রটিযুক্ত বাদশাহ বলে পরিগণিত হতেন। যারা সবাই দুনিয়ার জন্য আইন প্রণয়ন করে, কথায় কথায় বিগড়ে যায় বা রূপ বদলায়, এবং নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের সময় যখন দেখে যে, যুলুম বা নির্যাতন ছাড়া উপায় নেই, তখন স্বচ্ছন্দে যুলুম করাই শুরু করে দেয়। দৃষ্টান্তস্থলে, রাষ্ট্রীয় আইনে এটা বৈধ যে, একটি জাহাজকে বাঁচাতে গিয়ে প্রয়োজনে একটি নৌকার আরোহীদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া যাবে বা ডুবিয়ে মারা যাবে। কিন্তু, খোদার ক্ষেত্রে তো এমন অসহায় অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে না। অতএব, খোদা যদি সর্বশক্তিমান এবং শূন্য থেকে সৃষ্টিকারী না হতেন তাহলে তিনি দুর্বল রাজাদের মতই ক্ষমতার পরিবর্তে নির্যাতনের মাধ্যমে কাজ করতেন, এবং বিচার করতেন, করে খোদায়ীকেই বিদায় দিতেন। কিন্তু, খোদার যে জাহাজ তা তো পূর্ণ ক্ষমতা ও সঠিক সুবিচারের উপরেই চলমান রয়েছে। আবার বলেছেন ঃ **'আস্‌সালাম'**। অর্থাৎ, সেই খোদা যাবতীয় দোষক্রটি এবং দুর্ভোগ ও দুঃখ-যন্ত্রনা থেকে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত এবং অনুরূপ সুরক্ষাদাতাও বা সালামতী দানকারীও। এই কথারও অর্থ সবারই জানা। কেননা, তিনি যদি নিজেই দুঃখ-মুসিবতে নিপতিত হতেন, তাহলে, মানুষের হাতেই মারা পড়তেন এবং তাঁর সব ইচ্ছা অঙ্গীকারেই তিনি ব্যর্থ হয়ে যেতেন। তখন, তাঁর এই কুদৃষ্টান্ত দেখে কী করে হৃদয় সান্ত্বনা পেতো যে, এই ধরনের এক খোদাই আমাদেরকে দুঃখ-মুসীবত থেকে উদ্ধার করবে। কাজেই আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন ঃ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ ۖ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿٧٣﴾ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٧٤﴾

'নিশ্চয় তোমরা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যাদেরকে ডাকছো, তারা তো আদৌ একটা মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, যদি তারা এই উদ্দেশ্যে সকলে একত্রিত হয়েও যায়। এমনকি, মাছি তাদের নিকট থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নিয়ে গেলে, তারা তা-ও তার কাছ থেকে ছাড়িয়ে আনতে পারে না। নিঃসন্দেহে প্রার্থী এবং প্রার্থিতবস্তু উভয়ই দুর্বল ॥ তারা আল্লাহ্‌র (গুণাবলীর) যথোচিত আন্দাজ করেনি। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ পরম ক্ষমতাবান, মহা পরাক্রমশালী।' (২২ঃ৭৪-৭৫)

অর্থাৎ, যে লোকগুলোকে তোমরা খোদা বানিয়ে বসে আছে, তারা তো এমন যে, তারা যদি সবাই মিলে একটা মাছিও সৃষ্টি করতে চায়, তবে তারা তা-ও সৃষ্টি করতে পারবে না। যদি তারা সবাই একে অপরকে সাহায্য সহযোগিতা করে, তবুও না। বরং, মাছি যদি তাদের কোন জিনিষ অকস্মাৎ নিয়ে যায়, তাহলে তাদের শক্তি হবে না যে, মাছির কাছ থেকে সেই জিনিষ ছাড়িয়ে নিয়ে আসে। তাদের উপাস্যরা জ্ঞানের দিক দিয়ে কতই না দুর্বল, এবং ক্ষমতার দিক থেকেও কতই না কমজোর ! কী ? খোদা কি এমন হতে পারেন ? খোদা তো তিনিই যিনি সকল ক্ষমতাবানদের থেকে ক্ষমতাবান এবং সকলের উপরে বিজয় লাভকারী। তাঁকে না কেউ ধরতে পারে, না মারতে পারে। ঐ জাতীয় ভ্রান্তির মধ্যে যারা পতিত হয়, তারা খোদার মর্যাদা জানে না, এবং জানে না যে, খোদা কেমন হওয়া উচিত। আবার বলা হয়েছে যে, **খোদা হচ্ছেন আমান বা শান্তি ও নিরাপত্তা দানকারী** এবং তাঁর কামালাত বা উৎকর্ষতা এবং তৌহীদের সমর্থনে যুক্তি-প্রমাণ দানকারী। এটা এই কথার দিকে ইঙ্গিত করে যে, সত্য খোদাকে মান্যকারীরা কখনও কোন মজলিসে বা সভায় লজ্জিত হবেন না, এবং খোদার সামনেও লজ্জিত হবেন না। কেননা, তাদের কাছে শক্তিশালী যুক্তি-প্রমাণ থাকে। কিন্তু, বানাওটী খোদার মান্যকারীরা বড়ই বিপাকে বা মুসীবতের মধ্যে থাকে। তারা যুক্তি-প্রমাণ পেশ করার পরিবর্তে বেহুদা কথাবার্তাকে রহস্য বলে চালাতে চায়, যেন তারা হাসির পাত্রে পরিণত না হয়, এবং এতদ্দ্বারা তারা তাদের প্রমাণিত ভ্রমগুলিকেও অন্তরাল করতে চায়।

আবার বলা হয়েছে ঃ **আল্‌ মুহায়মেনুল আযীযুল জব্বারুল মুতাকাব্বের'** অর্থাৎ তিনি সকলের রক্ষাকারী এবং সকলের উপরে বিজয়ী এবং নষ্ট ও বিকৃতকে পুনর্গঠনকারী, এবং তাঁর সত্তা অতীব উন্নত – সুপ্রীম। আবার বলেছেন ঃ **'হুয়াল্লাহোল খালেকুল বারীউল মুসাব্বেরু লাহুল আসমাউল হুসনা।'** অর্থাৎ তিনি এমন খোদা যে, তিনি দেহসমূহের সৃষ্টিকর্তা। এবং আত্মাসমূহেরও সৃষ্টি কর্তা। এবং তিনি গর্ভাশয়ে রূপ ও আকার দানকারী। সকল সুন্দর সুন্দর নাম – যতটা কল্পনা করা সম্ভব- সবই তাঁর নাম। আবার বলেছেন ঃ **'ইউসাব্বেহু লাহু মাফিস্‌ সামাওয়াতে ওয়াল আরদে ওয়া হুয়াল আযীযুল হাকীম'**। অর্থাৎ, আসমানের লোকও পবিত্রতার সঙ্গে তাঁর নাম স্মরণ করে, যমীনের লোকও। এই আয়াতে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রে (কোথাও কোথাও) আবাদী বা জনবসতি রয়েছে এবং ঐ সকল লোকও খোদাতায়ালার হেদায়াত-এর অনুসারী। আবার বলেছেন ঃ **'আলা কুল্লে শাঈয়েন কাদীর'**। অর্থাৎ খোদা অতীব শক্তিমান। এটা এবাদতকারীদের জন্য সান্ত্বনার

কথা। কেননা, খোদা যদি দুর্বল হন এবং সর্বশক্তিমান না হন, তাহলে খোদার কাছে কী-ই বা আশা করা যাবে ! আবারও বলেছেন ঃ **'রব্বুল আলামীন'**, **'আর রহমানুর রহীম,' মালেকে ইয়াওমেদ্দীন ; উজীবু দাওয়াতাদ্ দায়ে এযা দায়ানে'**। অর্থাৎ সেই খোদা জগতসমূহের লালন ও পালনকর্তা। তিনি রহ্মান' 'রহীম' এবং স্বয়ং প্রতিফল প্রদানের দিবসের মালিক। এই এখ্তিয়ারকে তিনি অন্য আর কারো হাতেই সোপর্দ করেননি। তিনি সকল আহ্বানকারীর আহ্বান শোনেন এবং উত্তর দেন। অর্থাৎ তিনি প্রার্থনা কবুল করেন। আবারও বলেছেন ঃ **'আল্ হাইয়্যুল কাইয়্যুম'** অর্থাৎ সর্বদাই স্থায়ী এবং সকল প্রাণীর প্রাণের ও সকলের অস্তিত্বের আশ্রয়। এটা এজন্যই বলেছেন যে, তিনি যদি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী না হন, তাহলে তাঁর জীবনেরও এই আশঙ্কা থেকে যাবে যে, পাছে না তিনি আমাদের আগেই মারা যান ! আবারও বলা হয়েছে যে, সেই খোদা একলা খোদা। না তিনি কারও পুত্র, না কেউ তাঁর পুত্র। এবং না কেউ তাঁর সমকক্ষ, এবং না কেউ তাঁর অনুরূপ।' – (ইসলামী উসূল কি ফিলোসফী, পৃ. ৫৮-৬২)।

(১৭)

খোদাতায়ালার উচ্চ মর্যাদার মৌলিক গুণ চারটি। এই গুণগুলি হচ্ছে অন্য গুণাবলীর জননী – উম্মুস্ সেফাত। এবং প্রত্যেকটি গুণ আমাদের মানবীয়তা বা বাশারিয়্যত-এর কাছে এক চাহিদা রাখে। উক্ত চারটি গুণ হচ্ছে ঃ **রবুবিয়্যত, রহ্মানিয়্যত, রহীমিয়্যত এবং মালেকিয়্যত ইয়াওমেদ্দীন**।

(১) **রবুবিয়্যত ঃ (প্রভুত্ব ও প্রতিপালকত্ব)** ঃ এই গুণ আপন কৃপা ও কল্যাণরাজি প্রকাশিত করার জন্য নাস্তি (Nothingness) – অথবা নাস্তি-সদৃশ অবস্থার চাহিদা রাখে। এবং সৃষ্টির সমস্ত কিছুই – তা সে জড় হোক আর প্রাণী হোক – সবই এরই কারণে অস্তিত্ব লাভ করে।

(২) **রহ্মানিয়্যত ঃ (অসীম ও অযাচিত দানশীলতা)** ঃ এই গুণ আপন কৃপা ও কল্যাণময়তা প্রকাশিত করার জন্য নিরংকুশ নাস্তির চাহিদা রাখে। অর্থাৎ, সম্পূর্ণ সেই নাস্তিত্বের–যার সময়ে অস্তিত্বের কোন প্রভাব ও প্রকাশ হবে না। এবং এর যে সম্পর্ক তা শুধু প্রাণিকুলের সঙ্গে, অন্য আর কিছুর সঙ্গে নয়।

(৩) **'রহীমিয়্যত' ঃ (বার বার প্রতিফল দানকারী পরম দয়াময়)** ঃ এই গুণ আপন কৃপা ও কল্যাণসমূহ প্রকাশিত করার জন্য যুক্তি-বুদ্ধিসম্পন্নদের কাছ থেকে নাস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের একারার বা স্বীকৃতির চাহিদা রাখে এবং এ শুধু মানুষের সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত।

(৪) **'মালিকে ইয়াওমেদ্দীন' ঃ (বিচার-দিবসের অধিপতি)** ঃ এই গুণ আপন কৃপা ও কল্যাণরাজি প্রকাশিত করার জন্য অতি বিনীত প্রার্থনা ও কাকুতি-মিনতির চাহিদা রাখে। এই গুণ কেবল সেই সকল মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে যারা ভিখারীদের ন্যায় সেই এককত্বের (সেই এক খোদার) আস্তানায় লুটিয়ে পড়ে এবং কৃপা ও করুণা প্রাপ্তির আশায় সততা ও আন্তরিকতার অঞ্চল পাতিয়ে

দেয়। এবং নিজেদেরকে খালি হাত অবস্থায় দেখেই তাঁর মালিকত্বের (মালিকিয়্যতের) প্রতি ঈমান আনে।

এই হচ্ছে সেই চারটি গুণ যা দুনিয়াতে ক্রিয়াশীল রয়েছে। এর মধ্যে রহীমিয়্যত-এর যে গুণ তা প্রার্থনা করতে বলে, এবং মালিকিয়্যত-এর গুণ ভয় ও ত্রাসের আগুনে দহন করে করে নির্মল বিনয়ের জন্ম দান করে। কেননা, এই গুণ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, খোদাতায়ালা পুরস্কার দান করার মালিক, এবং কারো কোন অধিকার বা হক্ক নেই যে, সে দাবী করেই কোন কিছু আদায় করে। এবং মাগফেরাত ও নাজাত বা ক্ষমা ও পরিত্রাণও কেবল তাঁর ফযল বা অনুগ্রহেই সম্ভব'–(আইয়ামুস সুলেহ্ পৃ. ১৩–১৪)।

(১৮)

'সূরা ফাতিহা'-এর মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর চারটি গুণের কথা বলেছেন ঃ (১) 'রব্বুল আলামীন' (২) 'রহ্‌মান' (৩) 'রহীম' এবং (৪) 'মালেকে ইয়াওমেদ্দীন'। এবং এই চারটি গুণের মধ্য থেকে 'রব্বুল আলামীন'–কে সবার আগে স্থান দিয়েছেন। অতঃপর, বলেছেন 'রহমান' গুণের কথা। তারপর, 'রহীম' গুণের বর্ণনা দিয়েছেন। সব শেষে উল্লেখ করেছেন 'মালেকে ইয়াওমেদ্দীন'-এর কথা। এখানে বুঝতে হবে যে, খোদাতায়ালা কেন এই তরতীব বা অনুক্রম (তাঁর গুণের বর্ণনায়) অনুসরণ করেছেন । এর গূঢ় তাৎপর্য এটাই যে, এই চারটি গুণের স্বাভাবিক তরতীব এ রকমই। এবং এগুলি এই তরতীব অনুসারেই স্বকীয় অবস্থায় প্রকাশিত হয়ে থাকে। এর বিস্তারিত বর্ণনা হচ্ছে, – দুনিয়ার উপরে খোদাতায়ালার কৃপা ও বদান্যতা বা ফয়েযান হচ্ছে চার প্রকার যা চিন্তা করলে প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই বুঝতে পারে।

প্রথম যে কৃপা ও বদান্যতা তা হচ্ছে, সর্বতঃ সাধারণ (All general) কৃপা ও বদান্যতা অর্থাৎ **'ফয়েযানে আ'অম'**। এ হচ্ছে সেই নিরংকুশ বদান্যতা ও কৃপা, যা অবিরাম উর্ধ্ব আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত প্রাণী ও জড় সমস্ত কিছুর জন্য বিনা ব্যতিক্রমে জারি রয়েছে। প্রতিটি বস্তুর অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বের রূপ লাভ করা এবং সেই অস্তিত্বের পূর্ণ পরিণত অবস্থা লাভ করা এই কৃপা ও বদান্যতার কারণেই সম্ভব হয়। এবং কোন বস্তু, তা সে প্রাণী হোক জড়ই হোক, এর বাইরে নেই। এর মাধ্যমেই সমস্ত আত্মা এবং সমস্ত দেহ অস্তিত্ববান হয়েছে এবং হয়ে থাকে। এবং সমস্ত কিছুই প্রতিপালন পেয়েছে এবং পেয়ে থাকে। এই ফয়যান বা কৃপা ও বদান্যতাই সারা সৃষ্টির প্রাণ। যদি তা এক মুহূর্তের জন্যেও ছিন্ন হয়, তাহলে সমগ্র সৃষ্টির পরিসমাপ্তি ঘটে যাবে। যদি তা আদৌ না-ই হতো, তাহলে বিশ্বজগতের কোন কিছুই সৃষ্টি হতো না। এরই নাম কোরআন শরীফে বলা হয়েছে – রবুবিয়্যত (প্রভুত্ব ও প্রতিপালকত্ব)। এবং এরই কারণে খোদার নাম হয়েছে 'রব্বুল আ'লামীন' (জগতসমূহের প্রভু ও প্রতিপালক)। যেমন তিনি এক জায়গায় বলেছেন ঃ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ

অর্থাৎ, তিনি (আল্লাহতায়ালা) সকল কিছুর 'রব্ব্' - (প্রভু ও প্রতিপালক) - (৬ঃ১৬৫)। এবং সৃষ্টির মধ্য থেকে কোন কিছুই তাঁর রবুবিয়্যতের বাইরে নয়। তাই, খোদাতায়ালা সূরা ফাতেহার মধ্যে সমস্ত ফয়েযান-এর গুণাবলীর মধ্য থেকে সর্ব প্রথম 'রব্বুল আলামীন' গুণের বর্ণনা করেছেন। এবং বলেছেন ঃ 'আল্‌হামদুলিল্লাহে রব্বিল আলামীন' (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি জগতসমূহের প্রভু ও প্রতিপালক)। এ কথা এজন্যই বলেছেন যে, সমস্ত কৃপাময় গুণাবলীর মধ্যে স্বাভাবিক অগ্রাধিকার রয়েছে 'রবুবিয়্যত' গুণেরই। প্রকাশিত হওয়ার দিক থেকেও অন্য সব প্রকাশিতব্য গুণের মধ্যে এই গুণ-ই সর্ব প্রথম এবং কৃপাময় গুণাবলীর মধ্যে 'আ'অম' বা সর্বতঃ - সাধারণ। কেননা, এই গুণ নির্বিশেষে সর্ব কিছুতেই পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে, তা সে জীব ও প্রাণীই হোক আর জড়ই হোক।

দ্বিতীয় প্রকারের কৃপাময়তা ও বদান্যতা যা দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রকাশিত হয় তাও সাধারণ (General) কৃপা ও বদান্যতা **'ফয়েজানে আম'**। এর মধ্যে এবং 'ফয়েযানে আঅম-এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে- ফয়েযানে আঅম হচ্ছে এক আঅম রবুবিয়্যত (সর্বতঃ সাধারণ প্রতিপালকত্ব) যার মাধ্যমে সমগ্র সৃষ্টি প্রকাশিত ও অস্তিত্ববান। কিন্তু এই যে, কৃপা ও বদান্যতা, যার নাম 'ফয়েযানে আ'অম' তা এমন এক বিশেষ ঐশী প্রাচুর্য, যা দান করা হয় কেবল জীব ও প্রাণী জগতকে। অর্থাৎ, সাকল্য প্রাণিকুলের প্রতি যে বিশেষ ঐশী মনোনিবেশ তাকেই বলা হয় সাধারণ কৃপা বা ফয়েযানে আম। এই ফয়েযান-এর সংজ্ঞা হচ্ছে, এইগুণ কারো কোন হক্ক বা অধিকার ছাড়াই সকল প্রকারের জীব ও প্রাণীর জন্যই তাদের প্রয়োজন অনুসারে জারি রয়েছে। এ কারো কোন কর্মের ফল নয়। এবং এই ফয়েযান বা কৃপার কল্যাণে প্রত্যেকটি জীব ও প্রাণী জীবিত থাকে, খায়-দায়, পান করে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পায় এবং প্রয়োজনীয় সব কিছুই লাভ করে। এবং এই গুণের কারণেই প্রত্যেকটি জীব ও প্রাণীর জন্য, তাদের প্রজাতির জন্য এবং তাদের টিকে থাকার জন্য যা যা প্রয়োজন সব কিছুই সরবরাহ করা হয়। এবং এই ফয়েযানের কারণে আত্মাগুলির গঠন ও উন্নতির জন্য যা কিছু দরকার তা সবই দেওয়া হয়েছে এবং দেওয়া হয়ে থাকে। তেমনিভাবে, যে আত্মাগুলির বাহ্যিক উন্নতি ছাড়াও আধ্যাত্মিক উন্নতির বা তরবীয়্যতের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, অর্থাৎ যারা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের যোগ্যতা রাখে, তাদের জন্য আদি থেকেই প্রয়োজনের সময়ে ঐশীবাণী (কালামে ইলাহী) অবতীর্ণ হয়েছে এবং অবতীর্ণ হয়ে আসছে। সংক্ষেপে, 'রহ্‌মানিয়্যত'-এর এই ফয়েযানের কারণেই মানুষের কোটি কোটি প্রয়োজন পূর্ণ হয়। আবাস ও আরামের জন্য ভূ-পৃষ্ঠ, আলোকের জন্য চন্দ্র সূর্য, নিঃশ্বাস গ্রহণের জন্য বাতাস, পান করার জন্য পানি, খাবার জন্য নানা প্রকারের খাদ্য, রোগের চিকিৎসার জন্য লক্ষ লক্ষ ঔষধ এবং পরিধানের জন্য নানা ধরনের পোষাক-পরিচ্ছদ, এবং হেদায়াত বা সৎপথ লাভের জন্য ঐশী পুস্তকাদি সবই মজুদ রয়েছে। এবং এই দাবী কেউই করতে পারবে না যে,

এগুলি তার কর্মের ফল বা তার কর্মজনিত কল্যাণ লাভের কারণে সৃষ্টি হয়ে গেছে। এবং সে তার কোন পূর্বজন্মে (?) এমন কোন সৎকর্ম করেছিল যার ফলে এই সকল অসংখ্য নেয়ামত খোদাতায়ালা মনুষ্যজাতিকে পুরষ্কার দিয়েছেন। অতএব, এটাই প্রমাণিত যে, এই ফয়েযান যা কিনা হাজারো উপায়ে আত্মাধারীদের বা জীবও প্রাণীকুলের আরামের জন্য অস্তিত্বে আনা হয়েছে, তা সবই এমন দান যে, তাতে কারো অধিকার বর্তায় না এবং তা কারো কর্মেরও ফল নয়, তা শুধু ঐশী রহমতের এক প্রকার জোশ বা প্রেরণাসঞ্জাত, যাতে করে প্রত্যেকটি প্রাণী তার লক্ষ্যে পৌঁছে যায় এবং তার স্বভাবে যা কিছুর প্রয়োজনীয়তা দেওয়া আছে তা পূর্ণ হয়ে যায়। অতএব, এই ফয়েযান-এর আওতায় ঐশী এনায়েত বা বদান্যতার কাজ হচ্ছে, মানুষ এবং অন্য সব প্রাণীর প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা এবং তাদের সর্ব প্রকারের খবর রাখা বা তত্ত্বাবধান করা, যাতে তারা নষ্ট হয়ে না যায়। এবং তাদের যোগ্যতাসমূহের বিকাশ অপূর্ণ থেকে না যায়। এই ফয়েযান বা দাতা ও কৃপাময়তার গুণ যে খোদাতায়ালার সত্তাতেই বিদ্যমান, তা প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করা যায়। কেননা, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই একথা অস্বীকার করতে পারবে না যে, এই বিশ্বজগতে চন্দ্র, সূর্য, যমীন এবং অন্যান্য মৌলিক পদার্থ ইত্যাদি যা কিছু রয়েছে, যার উপরে সকল প্রাণীর জীবন নির্ভরশীল, তা সবই এই ফয়েযান বা কৃপাময়তা থেকেই প্রকাশিত। এবং প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণকারী- তা সে মানুষ হোক আর পশু হোক, বিশ্বাসী হোক আর অবিশ্বাসী হোক, সৎ হোক আর অসৎ হোক, সবাই বিনা ব্যতিক্রমে, প্রয়োজন মত আলোচ্য এই কৃপা থেকেই কৃপামন্ডিত হচ্ছে। এবং কোন প্রাণীই এথেকে বঞ্চিত নয়। এবং এই ফয়েযান-এর নাম কোরআন শরীফে বলা হয়েছে 'রহ্মানিয়্যত'। যেমন বলা আছে - আল্‌হামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামীন – আর রহ্মান। এই গুণ-এর প্রতি কোরআন শরীফে আরও কয়েক জায়গায় ইঙ্গিত করা হয়েছে ঃ

দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঃ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمٰنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴿٦١﴾

تَبٰرَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرٰجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا ﴿٦٢﴾

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَّذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿٦٣﴾

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُونَ قَالُوا سَلٰمًا ﴿٦٤﴾

'এবং যখন তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা রহমান (আল্লাহ্)-কে সিজদা কর, তখন তারা বলে, 'রহমান আবার কে ? আমরা কি তাকেই সিজদা করবো যার সম্বন্ধে তুমি আমাদেরকে হুকুম দিচ্ছ ?' বস্তুতঃ, এই কথা তাদের ঘৃণাকে আরও বৃদ্ধি করে ॥'

'তিনি পরম কল্যাণের অধিকারী সত্তা যিনি আকাশে (নক্ষত্ররাজির জন্য) কক্ষ পথ সমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে প্রদীপ্ত সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন ॥'

'এবং তিনিই সেই সত্তা যিনি রাত্রি ও দিবসকে একে অপরের পশ্চাদ্ধাবন করে সৃষ্টি করেছেন সেই ব্যক্তির উপকারের জন্য যে উপদেশ গ্রহণ করতে চায় অথবা সকৃতজ্ঞ বান্দা হতে চায় ॥' এবং

'রহমান'–এর প্রকৃত বান্দা তারাই যারা ভূ-পৃষ্ঠের উপর নম্র হয়ে চলে, এবং অজ্ঞরা যখন তাদেরকে সম্বোধন করে তখন তারা (কোন বিবাদ না করে) বলে, 'সালাম'॥ – (২৫ঃ৬১–৬৪)।

অর্থাৎ, যখন কাফেরদেরকে, বেদ্বীনদেরকে এবং নাস্তিকদেরকে বলা হয় যে, তোমরা 'রহমান'–কে সিজদা কর, তখন তারা 'রহমান' নামের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে অস্বীকৃতিসূচক প্রশ্ন করে যে, 'রহমান' আবার কী বস্তু ? এই প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে, 'রহমান' হচ্ছেন সেই সত্তা, যিনি প্রভূত কল্যাণের অধিকারী এবং সমস্ত মঙ্গলের চিরস্থায়ী উৎস, যিনি আসমানে বুরূজসমূহ বা সুবৃহৎ কক্ষপথসমূহ সৃষ্টি করেছেন। সেই সব কক্ষের মধ্যে সূর্য ও চন্দ্রকে স্থাপিত করেছেন যারা সকল সৃষ্টিকে বিশ্বাসী–অবিশ্বাসী নির্বিশেষে – আলো বিতরণ করছে। সেই 'রহমান'-ই তোমাদের জন্য অর্থাৎ সকল মানব-সন্তানের জন্য দিন ও রাত্রি সৃষ্টি করেছেন যারা একে অপরের পরে পরে আগমন করে অর্থাৎ পরিক্রমণ করে ; যাতে করে এখেকে মা'রেফাতের বা নিগূঢ় জ্ঞানের অনুসন্ধানীরা, এই সূক্ষ্ম প্রজ্ঞা বা হেকমত থেকে, লাভবান হতে পারে, এবং অজ্ঞতা ও অনীহা বা অলসতার অন্তরাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। এবং যে ব্যক্তি নেয়ামত-এর জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে আগ্রহী সে কৃতজ্ঞতা জনাতে পারবে। 'রহমান'-এর প্রকৃত উপাসনাকারী তারাই যারা পৃথিবীতে নম্রতার সঙ্গে চলাফেরা করে, এবং যখন অজ্ঞ লোকেরা কঠোর ভাষায় কথাবার্তা বলে তখন তারা শান্তিপূর্ণভাবে রহমতের ভাষায় তাদের কথার জবাব দেয়। অর্থাৎ কঠোরতার পরিবর্তে নম্রতা দেখায় এবং গালির পরিবর্তে দোয়া করে। অন্য কথায়, 'রহমান' গুণের সাদৃশ্যমূলক প্রকাশ ঘটায়। কেননা, 'রহমান'–ও ভালমন্দ নির্বিশেষে সকল মানুষকে সূর্য চন্দ্র যমীন এবং অন্যান্য অসংখ্য নেয়ামতের ফায়দা পৌঁছায়। অতএব, এই আয়াতগুলিতে খোদাতায়ালা পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন যে, 'রহমান' শব্দটি এই অর্থেই খোদার জন্য ব্যবহৃত হয় যে, তাঁর রহমত সর্বতঃভাবে ভালমন্দ নির্বিশেষে সবারই উপরে পরিব্যপ্ত রয়েছে। যেমন আরোও একখানে এই সাধারণ বা সার্বজনীন রহমত সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ عَذَابِىٓ أُصِيبُ بِهِۦ مَنْ أَشَآءُ ۖ وَرَحْمَتِى وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ

'আমি যাকে চাই তাকে শাস্তি দিয়ে থাকি, কিন্তু আমার রহমত সমস্ত কিছুকেই পরিবেষ্টন করে আছে' – (৭ঃ১৫৭)। অর্থাৎ, আমি যাকে আমার আযাবের যোগ্য মনে করি তাকেই তা (আযাব) দিয়ে থাকি ; কিন্তু আমার রহমত সব কিছুকেই পরিবেষ্টন করে আছে। আবার আর এক জায়গায় বলেছেন ঃ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَٰنِ

(তুমি বল, রাতে ও দিনে রহ্মান-এর (শাস্তি) থেকে কে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারে ? – ২১ঃ৪৩)।

অর্থাৎ, ঐ অবিশ্বাসীদেরকে এবং অবাধ্যদেরকে বলে দাও যে, যদি খোদাতায়ালার মধ্যে 'রহ্মানিয়্যত'-এর গুণ না থাকতো তাহলে, তাঁর শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়া তোমাদের পক্ষে সম্ভব হতো না। অন্য কথায়, তাঁর রহমানিয়্যতই ঐ সমস্ত কাফের ও বেঈমানদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকে, এবং তাদেরকে ধরার জন্য তাড়াহুড়া করে না। আরও এক স্থানে এই রহ্মানিয়্যতের দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَٰفَّٰتٍ وَيَقْبِضْنَ ۚ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ

'তারা কি তাদের উর্ধ্বদেশে পাখিদেরকে দেখে না যে, ওরা কীভাবে ডানাগুলিকে বিস্তার করে উড়ছে, এবং সেগুলিকে আবার গুটিয়ে নিচ্ছে ? রহ্মান (আল্লাহ্) ছাড়া অন্য কেউই ওদেরকে ধরে রাখছে না।' – (৬৭ঃ২০)।

অর্থাৎ, ঐ লোকগুলো কি তাদের মাথার উপরে পাখিদেরকে উড়ন্ত অবস্থায় দেখেনি যে, কখনও তারা পাখনা মেলে উড়ে, আবার কখনও বা তা গুটিয়ে নেয় ? রহমান-ই তো ওদেরকে পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে। অর্থাৎ, রহ্মানিয়্যতের কৃপা বা ফয়েযান যাবতীয় প্রাণীকুলের উপরে এমনভাবে পরিব্যাপ্ত যে, এমন কি পাখিরাও – যাদের দু'তিনটা এক পয়সায় পাওয়া যায় – (শতবর্ষ আগের কথা ঃ অনুবাদক) – তারাও এই ফয়েযানের বা কৃপা ও বদান্যতার সুবিশাল সাগরে (অর্থাৎ আকাশে) খুশী ও আনন্দের সঙ্গে সন্তরণ করে ফিরছে। এবং যেহেতু, এই ফয়েযান-এর স্তর রবুবিয়্যতের পরে, সেহেতু আল্লাহ্তায়ালা সূরা ফাতিহার মধ্যে তাঁর রব্বুল আলামীন – গুণের বর্ণনা করার পরে তাঁর 'রহমান' হওয়া গুণের বর্ণনা করেছেন, যাতে করে স্বাভাবিক অনুক্রম বা তরতীব ঠিক থাকে।

তৃতীয় প্রকারের ফয়জান হচ্ছে **'ফয়যানে খাস'** বা বিশেষ কৃপা ও বদান্যতা। এর মধ্যে এবং ফয়েযানে আম' (সাধারণ কৃপা ও বদান্যতা)-এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, ফয়েযানে আম-এর ক্ষেত্রে মুস্তাফিয বা ফয়েযপ্রাপ্ত (কৃপা ও দান প্রাপ্ত) ব্যক্তির জন্য এটা আবশ্যক নয় যে, ফয়েয লাভ করার জন্য সে নিজের অবস্থাকে নেক বা সৎ রূপে তৈরী করবে এবং নিজের নফ্স বা আত্মাকে অন্ধকারের পর্দার অন্তরাল থেকে বের করে আনবে, কিংবা কোন প্রকারের সাধনা বা চেষ্টা-চরিত্র চালাবে। বরং এই ফয়েয-এর ক্ষেত্রে, যেমনটা আমি এখনই বর্ণনা করে এসেছি, খোদাতায়ালা নিজের থেকেই প্রত্যেক প্রাণীকে তার প্রয়োজন মত – যেগুলির মুখাপেক্ষিতা তার স্বভাবগত, তা সবই দান করে থাকেন। এবং সে এগুলি লাভ করে বিনা প্রার্থনায় ও বিনা প্রচেষ্টায় পর্যন্ত পরিমাণে। কিন্তু 'ফয়েযানে খাস' (বিশেষ কৃপা ও বদান্যতা)-এর ক্ষেত্রে সাধনা এবং প্রচেষ্টা এবং চিত্তের পবিত্রতা এবং প্রার্থনা এবং বিনয় এবং আল্লাহ্র প্রতি মনোনিবেশ এবং প্রয়োজন মত অন্য

সব সাধনারই শর্ত রয়েছে। এবং এই ফয়যান কেবল সে-ই পেয়ে থাকে যে অনুসন্ধান করে। এ তারই উপরে বর্তায় যে মেহ্নত করে। এবং এই ফয়েযানের অস্তিত্বও 'কানুনে-কুদরত' বা প্রাকৃতিক নিয়মাবলী থেকেই স্বপ্রমাণিত। কেননা, এ তো অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, খোদার রাস্তায় সফরকারী এবং গাফেল ও অলস ব্যক্তির অবস্থা এক সমান হতে পারে না। নিঃসন্দেহে যে ব্যক্তি আন্তরিক সততা নিয়ে খোদার পথে প্রচেষ্টা চালায় এবং প্রত্যেক অন্ধকার এবং অন্যায় ও বিশৃংখলা থেকে দূরে থাকে, এক বিশেষ রহমত তার সাথী হয়ে যায়। এই ফয়েযানের প্রেক্ষিতে-ই খোদাতায়ালার নাম কোরআন শরীফে বলা হয়েছে 'রহীম'। এবং এই 'রহীমিয়্যত-এর গুণ এক খাস বা বিশেষ গুণ এবং তার স্তর 'রহ্মানিয়্যত-এর পরে। কেননা, খোদাতায়ালার পক্ষ থেকে প্রথমে 'রহমানিয়্যত' গুণের প্রকাশ ঘটেছে, অতঃপর প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'রহীমিয়্যত' গুণ। অতএব, এই স্বাভাবিক তরতীব বা অনুক্রম অনুসারে সূরা ফাতিহা-এর মধ্যে 'রহীমিয়্যত' গুণের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে 'রহমানিয়্যত' গুণের পরে। বলা হয়েছে ঃ আর রহমানির রহীম – এবং এই 'রহীমিয়্যত গুণের বর্ণনা কোরআন শরীফে আরও কয়েক স্থানে এসেছে। যেমন, একখানে বলা হয়েছে ঃ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا (৩৩ঃ৪৪) – অর্থাৎ খোদার রহীমিয়্যত শুধু মু'মিনদের জন্যই বিশিষ্ট বা খাস, যার মধ্যে অবিশ্বাসীদের অর্থাৎ বেঈমানদের এবং মুশ্‌রেক বা অংশীবাদীদের কোন হিস্যা নেই।

এখানে লক্ষ্য করতে হবে যে, খোদাতায়ালা 'রহীমিয়্যত' গুণকে মু'মেনদের জন্য বিশিষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু, 'রহ্মানিয়্যতকে কোনখানে মু'মেনদের জন্য বিশিষ্ট বা খাস করেন নি এবং এ কথা কোথাও বলেন নি যে, – 'কানা বিল্ মু'মেনীনা রহমানা' – (খোদার রহমানিয়্যত শুধু মুমিনদের জন্যই)। বরং মু'মেনদের সঙ্গে যে খাস রহমত সম্পর্কিত তার কথা বলতে গিয়ে প্রতিটি ক্ষেত্রেই রহীমিয়্যত গুণের কথা বলা হয়েছে। এক জায়গায় এ কথাও বলা হয়েছে ঃ إِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ

'নিশ্চয় আল্লাহ্‌র রহমত সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী' (৭ঃ৫৭)।

অর্থাৎ, ঐশী রহীমিয়্যত ঐ সমস্ত লোকের নিকটবর্তী যারা সৎকর্মশীল। আরও একখানে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

'নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং যারা আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করে ও জেহাদ করে, তারাই আল্লাহ্‌র রহ্মতের আশা রাখে ;অবশ্যই আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।' – ২ঃ২১৯। অর্থাৎ, যে সমস্ত লোক ঈমান আনে এবং খোদার জন্য –

দেশ ছেড়ে কিংবা নাফ্‌স্‌ বা প্রবৃত্তির পূজা ছেড়ে পৃথক হয়ে গেছে এবং খোদার পথে প্রচেষ্টা চালিয়েছে সে খোদার রহমতের প্রার্থী এবং খোদা ক্ষমাশীল ও পরম দয়াময় – গফুরুর রহীম। অর্থাৎ খোদাতায়ালার রহীমিয়্যতের ফয়েযান বা কৃপা ও বদান্যতা অবশ্যই তার সাথী হয়ে যায়। যার হকদার সে। এমন কেউ নেই যে তাঁর সন্ধান করেছে কিন্তু পায়নি।

কেমন তরো সে প্রেমিক সুজন
যার প্রতি নেই অনুরাগ প্রেমিকার ?
হে খাজা আমার !
বেদনার বলো কী বা আছে বাকী আর ?
চিকিৎসক তো প্রস্তুত সদা তার।
. . .   .

চতুর্থ প্রকারের ফয়যান হচ্ছে **ফয়েযানে আখাস্‌** অর্থাৎ অতি বিশিষ্ট কৃপা ও বদান্যতা। এ হচ্ছে সেই ফয়েযান যা শুধু শ্রম ও সাধনা দ্বারা অর্জন করা সম্ভব নয়। বরং এর প্রকাশ (Mani festation) এবং প্রতিফলন বা বুরুজ-এর জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছে, এই যে উপকরণের জগৎ – যা এক সংকীর্ণ ও অন্ধকার জায়গা – তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ; এবং একত্বের প্রভুর পূর্ণ ক্ষমতা কোন প্রকার উপকরণের প্রতিবন্ধকতা ব্যতীতই নগ্নরূপে আপন আলোকের বিচ্ছুরণে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠবে। কেননা, এই আখেরী বা সর্বোত্তম ফয়েযানের মধ্যে – যা সকল ফয়েযানের চূড়ান্ত রূপ – অর্থাৎ পূর্ববর্তী ফয়েযানের ক্ষেত্রে যা কিছু বর্ধিত ও উৎকৃষ্ট অবস্থা ধারণা করা সম্ভব হতো তা হচ্ছে, এই ফয়েযান হবে অন্য সব ফয়েযানের তুলনায় অত্যন্ত প্রকাশ্য এবং পরিষ্কার এবং এর মধ্যে থাকবে না কোন প্রকার ছায়া, আবরণ ও ত্রুটির লেশ। অর্থাৎ, এই ফয়েযানের নির্ধারিত দানের ব্যাপারে না থাকবে কোন সন্দেহ, না কোন কমতি। এই ফয়েযানের ক্ষেত্রে তা প্রকৃত ফয়যান ও খাঁটি রহমত ও পরিপূর্ণ হওয়ার ব্যাপারেও না থাকবে কোন সন্দেহ, না কমতি, বরং যে চিরন্তন মালিকের পক্ষ থেকে ফয়েয বা কৃপা ও বদান্যতা এসেছে, তাঁর কৃপাময়তা ও বদান্যতা ও পুরস্কার হবে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। এবং ফয়েযপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকটে অভিজ্ঞতালব্ধ নিশ্চিত জ্ঞানের আকারে এই বিষয়টিও প্রকাশিত হবে এবং অনুভূত হবে যে, সত্যিসত্যিই সম্রাজ্যের অধিপতি তাঁর এরাদা এবং মনোনিবেশ এবং বিশেষ ক্ষমতা বলে তাকে এক মহান পুরস্কার বা নেয়ামত এবং অপার আনন্দ দান করছেন। এবং প্রকৃত প্রস্তাবে, সে তার নিজের সৎকর্মসমূহের এক পরিপূর্ণ ও স্থায়ী পুরস্কার – যা অত্যন্ত স্বচ্ছ ও পরিষ্কার এবং অতীব উচ্চ এবং একান্ত কাংখিত এবং অতি প্রিয় – তা প্রাপ্ত হচ্ছে। এ কোন প্রকার পরীক্ষাও নয়, দুঃখ-কষ্ট বা এবৃতেলাও নয়। এবং এই শ্রেণীর ফয়েযান – যা কিনা পরিপূর্ণ এবং উত্তম এবং স্থায়ী এবং উচ্চ এবং উজ্জ্বল-তার প্রাপক হতে চাইলে, এই যে জগৎ যা ত্রুটিপূর্ণ এবং অস্বচ্ছ এবং সংকীর্ণ এবং আবদ্ধ এবং মরণশীল এবং সন্দেহপূর্ণ – তা থেকে অপর

জগতে স্থানান্তরিত হতে হবে। কেননা, এই ফয়েযান হচ্ছে 'তাজাল্লিয়াতে আযমা বা মহা-প্রকাশের এক অভিজ্ঞতা। যার মধ্যে শর্ত এই যে, সত্য উপকারীর সৌন্দর্য নগ্নরূপে দেখা যাবে এবং হক্কুল ইয়াকীন অর্থাৎ নিশ্চিত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জ্ঞান অর্জিত হবে। এবং উপস্থিতি এবং প্রকাশ এবং নিশ্চয়তার কোন স্তর বাকী থাকবে না। এবং বস্তুগত কোন উপায় উপকরণের পর্দা মাঝখানে থাকবে না। এবং পূর্ণ মা'রেফাত বা উপলব্ধির প্রত্যেক সূক্ষ্মতা সর্বতোভাবে ক্রিয়াশীল হবে। এছাড়া, ফয়েযান ও এত সুস্পষ্ট হবে এবং এত সুনির্দিষ্টরূপে বোধগম্য হবে যে, স্বয়ং খোদা তাকে জানিয়ে দিবেন যে, সে প্রত্যেক পরীক্ষা ও এবৃতেলার দুঃখ-কষ্ট থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র বা মুক্ত হয়ে গেছে। তদুপরি, এই ফয়েযানের মধ্যে এত উন্নত ও পূর্ণ স্তরের আনন্দ লাভ হবে যে, যার পবিত্র ও পূর্ণ অবস্থা মানুষের হৃদয় ও আত্মা, জাহির ও বাতেন, দেহ ও প্রাণ এবং প্রত্যেক আত্মিক ও দৈহিক শক্তির উপরে এমন সামগ্রিক ও স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করবে যে, যা বুদ্ধি চিন্তা ও কল্পনারও উর্ধ্বে। পক্ষান্তরে এই যে জগৎ – যা মূলতঃ ক্রটিপূর্ণ এবং বাহ্যতঃ আচ্ছন্ন এবং সত্তায় ধ্বংসশীল, এবং স্বীয় অবস্থায় সন্দেহপূর্ণ এবং বিস্তারে সংকীর্ণ – তা ঐ মহা-প্রকাশ ও প্রোজ্জ্বল আলো ও চিরস্থায়ী দানসমূহকে বরদাশ্‌ত করতে পারবে না ; এবং তা ঐ সকল সমুজ্জ্বল রশ্মিমালা - যা কিনা চিরন্তন - তাকে ধারণ করতে পারবে না। বরং তার প্রকাশের জন্য এক অন্য জগতের প্রয়োজন। যে জগত হবে বস্তুগত উপায় –উপকরণের অন্ধকার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং পবিত্র, এবং সেই এক ও সর্বোচ্চ বা সুপ্রীম সত্তার ক্ষমতার পূর্ণ ও প্রকৃত প্রকাশ-স্থল।

হ্যাঁ, এই ফয়যানে আ'খাস অর্থাৎ অতিবিশিষ্ট কৃপা ও বদান্যতা থেকে সেই সকল কামেল ইনসান বা পূর্ণ মানব ইহজীবনেই কিছু অংশ লাভ করে থাকে যারা সত্যের পথে অটল পদবিক্ষেপে এগিয়ে চলে। এবং নিজের প্রবৃত্তির বা নফ্‌সের ইচ্ছা-অভিলাষ ও কামনা-বাসনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে খোদার প্রতি নিবদ্ধ হয়। তারা মৃত্যুর পূর্বেই মারা যায়। যদিও দৃশ্যতঃ তারা এ জগতেই বিচরণ করে, তবু প্রকৃত প্রস্তাবে, তারা অপর জগতেই বসবাস করে। অতএব, তারা যেহেতু নিজের হৃদয়কে এই জগতের উপায় – উপকরণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, এবং মানবীয় অভ্যাসকে বর্জন করে, এবং আল্লাহ্ ছাড়া সমস্ত কিছু থেকে মুখ ফেরায়ে নেয়, এবং সেই 'খারেকে আদত' বা অনন্য সাধারণ পন্থা অবলম্বন করে ; সেহেতু খোদাওন্দ করীমও তাদের সঙ্গে অনুরূপ ব্যবহারই করেন এবং অনন্য সাধারণ পন্থায় তাদের উপরে সেই সব বিশেষ বিশেষ আলো বা নূর প্রকাশ করেন যা অন্যদের উপরে মৃত্যুর পরে ছাড়া প্রকাশিত হয় না। সংক্ষেপে, উল্লিখিত অবস্থা সাপেক্ষে, তারা এই দুনিয়াতেই ফয়েযানে আ'খাস-এর নূর থেকে কিছু অংশ লাভ করে থাকে। এবং এই ফয়েযান প্রত্যেক প্রকারের ফয়েজ থেকে সম্পূর্ণ খাস বা বিশিষ্ট এবং সমস্ত ফয়েযানের মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ। এবং একে যে পায়, সে মহা সৌভাগ্যের শিখরে পৌঁছে যায়। এবং সে চিরস্থায়ী সন্তুষ্টি লাভ করে, যা

কিনা সকল সন্তোষের উৎস-প্রস্রবণ। এবং সে ব্যক্তি এথেকে বঞ্চিত থাকে, সে সর্বদা দোযখে নিপতিত থাকে। এই ফয়েযানের প্রেক্ষিতে খোদাতায়ালা কোরআন শরীফে নিজের নাম বলেছেন ঃ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ

– 'মালেকে ইয়াওমেদ্দীন' – বিচার-দিবসের মালিক। 'দ্বীন' শব্দটির পূর্বে 'আল্' 'যুক্ত করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যাতে এর দ্বারা এই অর্থ প্রকাশিত হয় যে, এখানে যে প্রতিফল দানের কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে, সেই পূর্ণ প্রতিফল যার বিবরণ দেওয়া আছে কোরআন মজীদে। এবং কামেল বা পূর্ণ প্রতিফল সেই চরম মালিকত্ব বা মালেকিয়্যত-এর প্রকাশ ছাড়া প্রকাশিত হওয়া সম্ভব নয়। এরই প্রতি, তাই, ইঙ্গিত করে অপর এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝

'আজ সর্বাধিপত্য কার জন্য ? আল্লাহ্র জন্য, যিনি এক, প্রবল-পরাক্রান্ত' (৪০ঃ১৭)।

অর্থাৎ, সেদিন আল্লাহ্র রবুবিয়্যত বস্তুগত কোন প্রকার উপায় – উপকরণের মাধ্যম ছাড়াই স্বয়ং প্রকাশিত হবে, এবং এটাই গোচরীভূত ও বোধগম্য হবে যে, আল্লাহ্তায়ালার মহা ক্ষমতা ও চরম শক্তি ছাড়া সমস্ত কিছুই অস্তিত্বহীন। তখন, সমস্ত আরাম ও আনন্দ, সমস্ত পুরস্কার ও শাস্তি, সবই সেই খোদারই তরফ থেকে স্বচ্ছ ও পরিষ্কারভাবে দেখা যাবে। এবং তার মাঝখানে কোনও পর্দা বা আড়াল থাকবে না। এবং কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। তখন, যারা তাঁর জন্যে নিজেদের সত্তাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল (অন্য সমস্ত কিছু থেকে) তারা নিজেদের সত্তাকে পরিপূর্ণ সুখ ও সৌভাগ্যমন্ডিত অবস্থায় দেখতে পাবে, যা তাদের দেহ ও প্রাণ, তাদের জাহের ও বাতেন সব কিছুর উপরে পরিব্যাপ্ত হবে। এবং তাদের অস্তিত্বের এমন কোন অংশ বাকী থাকবে না যা ঐ পরিপূর্ণ সুখ ও সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকবে। এখানে 'মালেকে ইয়াওমেদ্দীন' – (বিচার দিবসের মালিক)-এর মধ্যে এই ইঙ্গিতও রয়েছে যে, সেদিন আদম সন্তানরা যে মুক্তি কিংবা শাস্তি, আনন্দ অথবা বেদনা ইত্যাদি প্রাপ্ত হবে, তার সব কিছুর আসল উৎস হবে আল্লাহ্তায়ালার সত্তা। এবং তিনিই হবেন সমস্ত অবস্থার প্রকৃত মালিক বা একাধিপতি। অর্থাৎ, তাঁর সঙ্গে মিলন অথবা বিচ্ছেদই হবে সমস্ত চিরন্তন-সৌভাগ্যের কারণ অথবা দুর্ভাগ্যের কারণ। একইভাবে, যারা তাঁর অস্তিত্বের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং তাঁর একত্ব বা তৌহীদ অবলম্বন করেছিল, এবং তাঁর নির্মল ভালবাসার রঙে নিজেদের হৃদয়গুলিকে রঙিন করে তুলেছিল তাদের উপরে সেই পূর্ণ ও পবিত্র সত্তার রহমতের আলোকরশ্মি পরিষ্কারভাবে এবং প্রকাশ্যভাবে অবতীর্ণ হবে। এবং যাদের ঈমান থাকবে না, আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসা থাকবে না, তারা এই আনন্দ ও এই মুক্তি থেকে বঞ্চিত থাকবে, এবং কঠোর শাস্তির মধ্যে নিপতিত হবে।

এই হচ্ছে সেই চার প্রকারের ফয়েয (কৃপা ও বদান্যতাসমূহ) যার এক বিস্তারিত বর্ণনা আমরা লিখে দিলাম।

এখন দেখা যাবে যে, 'রহ্‌মান' গুণকে 'রহীম' গুণের পূর্বে অগ্রাধিকার দান করাই ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং উৎকৃষ্ট রচনাশৈলীর দাবীও এটাই। কেননা, প্রকৃতির গ্রন্থের পৃষ্ঠায় দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, প্রথমেই খোদাতায়ালার সাধারণ প্রতিপালকত্ব বা 'আম রবুবিয়্যত'-এর উপরেই দৃষ্টি পড়ে। অতঃপর দৃষ্টি পড়ে 'রহ্‌মানিয়্যত'-এর উপরে ; অতঃপর, 'রহীমিয়্যত'-এর উপরে। সব শেষে দৃষ্টি পড়ে তাঁর 'মালেকে ইয়াওমেদ্দীন (বিচার দিবসের মালিক) হওয়ার উপরে। এবং উৎকৃষ্ট রচনাশৈলী তাকেই বলে যাতে প্রকৃতির গ্রন্থে যে অনুক্রম বা তরতীব রয়েছে তার অনুসরণ করা হয় ; এবং তারই অনুসরণ করা হয় ঐশীবাণী বা ইলহাম-এর গ্রন্থেও। কেননা, রচনার মধ্যে প্রাকৃতিক বিন্যাস বা অনুক্রমকে পাল্টানোর অর্থই হবে প্রাকৃতিক নিয়মকেই পাল্টানো এবং প্রাকৃতিক শৃংখলাকেই ভেঙ্গে ফেলা। অনবদ্য রচনার জন্য এটা প্রয়োজন যে, বাক্যের বিন্যাস প্রাকৃতিক বিন্যাসের সঙ্গে এমন হুবহু হতে হবে যে, তা যেন প্রাকৃতিক বিন্যাসেরই এক প্রতিরূপ বা ফটোগ্রাফ হয়। এবং যে বিষয়টি প্রাকৃতিকভাবে এবং সংঘটিত হওয়ার দিক থেকে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত, সেটাকেই বর্ণনার ক্ষেত্রেও অগ্রাধিকার দিতে হবে। অতএব, এই আয়াতসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরের বাগ্মিতা প্রদর্শিত হয়েছে, এবং অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক বিন্যাস ও অনুক্রমকেও যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। এবং বর্ণনার ক্ষেত্রে সেই নিয়মকেই অবলম্বন করা হয়েছে, যা প্রত্যেক সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে বিশ্বজগতের বিন্যাসের ন্যায় সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়ে থাকে। কী ? এটাইকি সম্পূর্ণ সরল পথ নয় যে, যে তরতীবে বা ক্রমানুসারে ঐশী নেয়ামতসমূহ প্রকৃতির গ্রন্থে প্রকাশিত বা প্রদত্ত হয়েছে সেই একই তরতীবকেই অনুসরণ করা হোক ঐশীবাণীর গ্রন্থেও ? সুতরাং. এরূপ উৎকৃষ্ট ও প্রজ্ঞাপূর্ণ তরতীব বা অনুক্রম ও বিন্যাস সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করাটা, বস্তুতঃ সেই সব অন্ধদেরই কাজ যারা একই সঙ্গে তাদের চোখের দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি উভয়ই খুইয়ে বসেছে।

এখন, পুনরায় একবার এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে আমরা আরও একটা কথা বলতে চাই যে, খোদাতায়ালা যা কিছু 'সূরা ফাতিহা'-এর মধ্যে 'রব্বুল আলামীন' গুণ থেকে নিয়ে 'মালেকে ইয়াওমেদ্দীন' পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন, তা কোরআন শরীফের ব্যাখ্যা মতে চার প্রকারের মহিমান্বিত সত্যতা-সাদাকাত। যার কিছুটা বিশদ বিবরণ এখানে সঙ্গত কারণেই দেওয়া উচিত।

প্রথম সত্যতা বা সাদাকাত হচ্ছে – খোদাতায়ালা রব্বুল আলামীন – (জগতসমূহের প্রভু ও প্রতিপালক)। অর্থাৎ, বিশ্বজগতের মধ্যে যা কিছু আছে তার সমস্ত কিছুর রব্ব্‌ এবং মালিক হচ্ছেন খোদা। এবং যা কিছু বিশ্বজগতে প্রকাশিত হয়েছে এবং যা কিছু দৃষ্টিগোচর হয়, এবং অনুভূত হয় এবং যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে ধারণ করা যায়, সব কিছুই তাঁর সৃষ্টি। এবং প্রকৃত অস্তিত্ব একমাত্র সেই সর্বস্রষ্টা আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য আর কোন কিছুর জন্যই প্রযোজ্য নয়। সংক্ষেপে, সমগ্র

বিশ্বজগৎ এবং তার সমস্ত কিছুই সৃষ্ট এবং খোদাতায়ালা কর্তৃকই সৃষ্ট। এবং সারাটা সৃষ্টি জগতে এমন কিছুই নেই, যা খোদাতায়ালার সৃষ্টি নয়। খোদাতায়ালা তাঁর পূর্ণ রবুবিয়্যত'-এর মাধ্যমে এই সৃষ্টির প্রতিটি অণু-পরমাণুকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং শাসন করেন। এবং তাঁর 'রবুবিয়্যত' সর্বক্ষণ কর্মরত রয়েছে। এমন নয় যে, খোদাতায়ালা জগতকে সৃষ্টি করার পর তা থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে বসে আছেন, এবং সব কিছুই প্রাকৃতিক নিয়মের উপরে ছেড়ে দিয়েছেন এবং কোন কিছুর মধ্যেই আর হস্তক্ষেপ করছেন না। কিংবা, এটা এমনও নয় যে, কোন কারিগর একটা মেশিন বানাবার পর সেটা সম্পর্কে আর কোন খবরই রাখে না। কিন্তু সত্য-স্রষ্টার সঙ্গে কখনই সম্পর্কচ্যুত হয় না তার সৃষ্টি। বরং, তিনি তো 'রব্বুল আলামীন' – জগতসমূহের প্রভু ও প্রতিপালক। তিনি তাঁর পূর্ণ রবুবিয়্যতের কার্যকারিতা নিরবচ্ছিন্নভাবে সর্বক্ষণ জারি রেখেছেন তার সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে। এবং তাঁর রবুবিয়্যতের বারিধারা অবিরাম বর্ষিত হচ্ছে তাঁর সমগ্র সৃষ্টি জগতের উপরে। এবং এমন কোন মুহূর্ত নেই যে, সৃষ্টি তাঁর কৃপা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বরং বিশ্ব জাহানকে সৃষ্টি করবার পরও সেই কৃপাময় উৎস প্রতিক্ষণ প্রতিমুহূর্তে এই প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছেন যে, এখনও পর্যন্ত তিনি যেন কিছুই সৃষ্টি করেন নি। সৃষ্টি যেমন তাঁর অস্তিত্বের ও প্রকাশের জন্য তাঁর রবুবিয়্যতের মুখাপেক্ষী ছিল, তেমনি সে তার স্থায়িত্ব ও প্রতিষ্ঠার জন্যেও তাঁরই রবুবিয়্যতের উপরে নির্ভরশীল। তিনিই সে-ই যিনি দুনিয়াকে সামলিয়ে রাখেন, নির্ভরতা দেন। দুনিয়ার প্রতিটি পরমাণু তাঁর কারণেই তরতাজা থাকে, বিকশিত হয়। এবং তিনি তাঁর মর্জি ও এরাদা মাফিক সব কিছুরই রবুবিয়্যত করেন, প্রতিপালকত্ব করেন। এমনও নয় যে, কোন এরাদা বা উদ্দেশ্য ছাড়াই তিনি কোন কিছুর রবুবিয়্যত করে থাকেন। সংক্ষেপে, কোরআনের যে সব আয়াতের ব্যাখ্যা আমরা এখানে করছি, তার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, এই সাদাকাত বা সত্যতার অর্থ এটাই যে, প্রত্যেকটি জিনিষ, যা এই বিশ্বের মধ্যে পাওয়া যায়, তা সৃষ্টি বা মখলুক। এবং তা সমস্ত উৎকর্ষতায়, সমস্ত অবস্থায় এবং সকল সময়ে খোদাতায়ালার রবুবিয়্যতের মুখাপেক্ষী। এবং এমন কোন আত্মিক ও দৈহিক ঔৎকর্ষ নেই যা কোন সৃষ্টি সেই নিরঙ্কুশ নিয়ন্তার ইচ্ছা ছাড়াই নিজে নিজেই অর্জন করতে পারে। এছাড়া, স্পষ্টতঃই, এই পবিত্র কালামে এই সত্যতা বা সাদাকাত এবং অন্যান্য সাদাকাতের এই তাৎপর্য নিহিত রয়েছে যে, 'রব্বুল আলামীন' প্রভৃতি যে গুণগুলি খোদাতায়ালার মধ্যে পাওয়া যায় তা সবই তাঁর ওয়াহেদ ও লা-শরীক (এক ও অংশীবিহীন) সত্তার জন্যই বিশিষ্ট বা খাস, এবং অপর কেউই-এর মধ্যে শরীক বা অংশীদার নেই। যেমন, তা এই সূরার প্রথম কথা অর্থাৎ 'আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌'–এর মধ্যেই বলা হয়েছে, সকল প্রশংসা শুধু আল্লাহ্‌র-ই জন্যে।

দ্বিতীয় সত্যতা বা সাদাকাত হচ্ছে – 'রহমান'। যার উল্লেখ করা হয়েছে 'রব্বুল আলামীন'-এর পরেই। 'রহমান'-এর অর্থ যেমনটা আমরা প্রথমে বর্ণনা করে এসেছি – তা হচ্ছে, যত প্রকারের জীব বা প্রাণী আছে, তা সে বুদ্ধিসম্পন্ন হোক আর বুদ্ধিহীন হোক, সৎ হোক আর অসৎ হোক, সকলেরই অস্তিত্বের

সংরক্ষণ ও টিকে থাকা এবং তাদের প্রজাতিসমূহের টিকে থাকা এবং তাদের উৎকর্ষতা সাধন করার জন্য খোদাতায়ালা তাঁর সাধারণ রহমতের কারণে প্রত্যেক প্রকারের প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ সরবরাহ করে আসছেন এবং সরবরাহ করতে থাকবেন। এবং এই সকল দান স্বতঃস্ফূর্ত, এগুলো কারো কোন কর্মের উপর নির্ভরশীল নয় বা কারো কর্মের ফল নয়।

তৃতীয় সাদাকাত হচ্ছে – 'রহীম'। যার কথা বলা হয়েছে 'রহমান'-এর পরে। যার অর্থ হচ্ছে, খোদাতায়ালা তাঁর বিশেষ রহমতের চাহিদা অনুযায়ী, প্রত্যেক প্রচেষ্টাকারীর প্রচেষ্টার উত্তম ফল দান করেন। তওবাকারী বা অনুতাপকারীদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেন। যাচ্‌নাকারীর যাচ্‌না পূরণ করেন। এবং যে কড়া নাড়ে তার জন্য (দুয়ার) খুলে দেন।

চতুর্থ সাদাকাত – যা সূরা ফাতিহায় বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে, 'মালেকে ইয়াওমেদ্দীন'। অর্থাৎ, যথার্থ ও পূর্ণ প্রতিফল – যা প্রত্যেক প্রকারের পরীক্ষা ও ইবতেলা (Test and Trial) এবং অনীহা ও গাফ্‌লতি ও অন্যমনস্কতার যাবতীয় অবস্থা ও উপকরণ ও অজুহাত থেকে মুক্ত এবং প্রত্যেক প্রকার বক্রতা ও অপরিচ্ছন্নতা এবং সন্দেহ ও সংশয় ও ক্ষতি থেকে পবিত্র; এবং তাঁর অমিত ক্ষমতাসমূহের প্রকাশ–তারও মালিক সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌। তিনি তাঁর পূর্ণ প্রতিফল – যা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট–তা প্রকাশিত করার ক্ষেত্রে কোনভাবেই কোনপ্রকার দুর্বলতা রাখেন না। এবং এই মহিমান্বিত সাদাকাত প্রকাশ করার পিছনে লা-শরীক আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য হচ্ছে – নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি যেন প্রত্যেকের কাছেই হাক্কুল ইয়াকীন বা অভিজ্ঞতালব্ধ নিশ্চিত জ্ঞানের আকারে পরিষ্কার হয়ে যায়।

প্রথমত ঃ এই জাযা ও সাযা – পুরস্কার ও শাস্তি -এর বিষয়টি এমন এক বিষয় যা সত্য এবং সুনিশ্চিত। যা প্রকৃত মালিকের পক্ষ থেকে এবং তাঁরই খাস এরাদা অনুযায়ী বান্দাগণের উপরে বর্তানো হয়। এবং যা এই দুনিয়াতে উন্মোচিত হওয়া সম্ভব নয়। কেননা, এই পৃথিবীতে সাধারণ মানুষের নিকটে এটা প্রকাশিত হয় না যে, যে সব ভাল ও মন্দ, আনন্দ ও বেদনা বান্দারা পেয়ে থাকে, তা কেন তারা পেয়ে থাকে এবং তা কার হুকুমে, কার এখ্‌তিয়ারে প্রদত্ত হচ্ছে। এবং কেউ এ রকম কোন আওয়াজও শোনে না যে, সে তার নিজের (কর্মের) পুরস্কার পাচ্ছে; এবং কেউ এটা পরিষ্কার প্রত্যক্ষ বা অনুভবও করে না যে, সে যে (শাস্তি) ভুগছে তা তার নিজেরই কর্মের প্রতিফল।

দ্বিতীয়ত ঃ এই সাদাকাত-এর মাধ্যমে এই বিষয়টিকে স্পষ্টরূপে তুলে ধরা হয়েছে যে, বস্তুগত উপায়-উপকরণ বা আসবাব কোন ব্যাপারই নয়। এবং প্রকৃত কর্মকর্তা হচ্ছেন খোদা। এবং তিনিই সেই একমাত্র মহান সত্তা যিনি যাবতীয় কৃপা ও বদান্যতার বা ফয়েযের উৎস-প্রস্রবণ, এবং পুরস্কার ও শাস্তির–জাযা ও সাযার-মালিক।

তৃতীয়ত ঃ এই সাদাকাত-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে–মহা-সৌভাগ্য কী, এবং মহা-দুর্ভাগ্য কী,– তা প্রকাশ করা। অর্থাৎ, এই সাদাকাতের মাধ্যমে এটাই বলা হয়েছে যে, মহা-সৌভাগ্য হচ্ছে সেই মহান বিজয়ের অবস্থা যখন আলো ও আনন্দ, সুখ ও শান্তি মানুষের সমস্ত জাহের ও বাতেন, দেহ ও প্রাণ পরিবেষ্টন করে ফেলে, এবং তার কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, কোন শক্তি-সামর্থ্যই এর বাইরে থাকে না। অপরপক্ষে, মহা-দুর্ভাগ্য হচ্ছে সেই কঠোর শাস্তি যা অবাধ্যতা ও অপবিত্রতা এবং দূরত্ব ও বিচ্ছিন্নতার কারণে (আগুন হয়ে) হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠে এবং দেহকে ঘিরে ফেলে। এবং তার সমস্ত অস্তিত্ব যেন আগুনে জ্বলতে থাকে, যেন জাহান্নামে পতিত হয়। এই তাজাল্লিয়াতে আযমা বা মহা-প্রকাশ এই জগতে সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়। কেননা, এই সংকীর্ণ ও সংকুচিত ও অস্বচ্ছ জগৎ যা বস্তুগত উপায় উপকরণের আবরণে আচ্ছাদিত এবং এক ক্রটিপূর্ণ অবস্থায় নিপতিত রয়েছে, তা ঐ তাজাল্লিয়াতের প্রকাশ ধারণ বা বরদাশ্‌ত করতে পারে না। এই জগতে পরীক্ষা ও এবতেলাই প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে। এবং এখানকার সুখ-শান্তি ও দুঃখ-বেদনা উভয়ই অস্থায়ী ও ক্রটিযুক্ত। এছাড়া এই দুনিয়াতে মানুষ যে সব অভিজ্ঞতা অর্জন করে তা-ও সবই উপায় উপকরণের অন্তরালে ঢাকা। যার দরুন প্রতিফল দানের অধিপতির বা মালিকের চেহারা পর্দার আড়ালেই থেকে যায়, গুপ্তই থেকে যায়। এ কারণেই ইহজগতে সত্যিকারভাবে পারফেক্টরূপে এবং খোলাখুলিভাবে প্রতিফল দিবস বা ইয়াওমে জাযা ও সাযা সংঘটিত হতে পারে না। বরং, সত্যিকারভাবে পারফেক্টরূপে এবং খোলাখুলিভাবে 'ইয়াওমেদ্দীন' বা প্রতিফল দানের দিবস সেই পরজগতে হবে, যা এই জগৎ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আসবে। এবং সেটাই হচ্ছে সেই মহা-প্রকাশ-(তাজাল্লিয়াতে আযমা)-এর গৌরব ও সৌন্দর্য প্রদর্শনের যথোপযুক্ত স্থান। এবং যেহেতু, এই পার্থিব জগৎ তার স্বকীয় অবস্থার দরুন প্রতিফল দানের স্থান নয়, বরং পরীক্ষা বা দুঃখ-কষ্টের স্থান (অর্থাৎ দারুজ জাযা নয়, বরং দারুল এবৃতেলা); সেহেতু, যে সব দুঃখ-কষ্ট ও আরাম-আয়েশ, সুখ-শান্তি ও ব্যথা-বঞ্চনা, এবং বেদনা বা আনন্দ মানুষ ইহজগতে পেয়ে থাকে, তা সবই যে, অবশ্যম্ভাবীরূপে খোদাতালার কৃপা বা ক্রোধের ফলস্বরূপই হয়ে থাকে, এমন নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কারো বিত্তশালী হওয়াটাই একথার প্রমাণ নয় যে, খোদাতায়ালা তার উপরে খুশী আছেন ; কিংবা কারো বিত্তহীন বা গরীব হওয়াটাও একথা প্রমাণ করে না যে, তার প্রতি খোদাতায়ালা অসন্তুষ্ট হয়েছেন। বরং এই উভয় অবস্থাই হচ্ছে এবৃতেলা (Trial) স্বরূপ। যাতে করে, বিত্তশালীকে তার ধন-দৌলতের ক্ষেত্রে এবং বিত্তহীনকে তার দারিদ্র্যের ব্যাপারে পরীক্ষা করা যায়। – এ-ই হচ্ছে সে-ই চার সত্যতা বা সাদাকাত যার প্রত্যেকটির বিশদ বর্ণনা দেওয়া আছে কোরআন শরীফে।' –(বারাহীনে আহ্‌মদীয়া, ৪২২-৪৩৯, পাদটীকা, ১১)।

(১৯)

'একথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত যে, এই বিশ্বজগতের বস্তুনিচয়ের মধ্য থেকে যা কিছু দৃষ্টিগোচর হয়, তার কোনটারই অস্তিত্ব ও তার প্রতিষ্ঠা স্বয়ং অপরিহার্য রূপে

প্রয়োজনীয় নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পৃথিবীর আকার গোলকের ন্যায় এবং এর ব্যাস কারো কারো হিসাবে আট হাজার মাইল। কিন্তু এর পিছনে এমন কোন নিশ্চিত যৌক্তিক প্রমাণ নেই যে, কি কারণে এর (পৃথিবীর) জন্য এই আকার এবং এই ভর বা আয়তনের প্রয়োজন ছিল। এবং কেনই বা তা এর চাইতে কম বা বেশী করা যাবে না ; কিংবা তার আকার পরিবর্তন করে অন্য কোন আকার দান করা যাবে না। এবং এ ব্যাপারে যখন কোন নিশ্চিত যুক্তি-প্রমাণ নেই, তখন এই যে এর আকার ও আয়তন যার সমন্বয়ে গঠিত এর অস্তিত্ব, তা এর জন্য অপরিহার্য হতে পারে না। এবং এই একই যুক্তিতে বলা যায় যে, বিশ্বজগতে যা কিছু আছে তার কোনটারই অস্তিত্ব ও অবস্থান স্বতঃঅপরিহার্য নয়। এবং কথা শুধু এতটুকুই নয় যে, প্রত্যেকটি বস্তু যার অস্তিত্ব দৃষ্টিগোচর হয় তা সত্তাগতভাবে অপরিহার্য নয়। পক্ষান্তরে, এমন নানাবিধ পরিস্থিতিরও সৃষ্টি হয়, যখন বহু জিনিষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার অবস্থা বা আশংকা দেয়া দেয়। তথাপি, ঐ সকল জিনিষ নিশ্চিহ্ন হয়েও যায় না। দৃষ্টান্তস্থলে, আদিকাল থেকে দেখা গেছে যে, ভীষণ দুর্ভিক্ষ পড়ে, ভয়াবহ মহামারী হয়ে যায়, তার পরেও সব সময় সব কিছুর বীজ রক্ষা পায়, নষ্ট হয়ে যায় না। বস্তুতঃ যুক্তি তো একথাই বলে, বরং এটাই যুক্তির দাবী যে, হাজারো দুর্যোগ ও বিপর্যয় – যা পৃথিবীর বুকে আদিকাল থেকেই ঘটে চলেছে – তার ফলে এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক ছিল যে, কোন কোন সময়ে, দীর্ঘস্থায়ী কঠিন দুর্ভিক্ষের দরুন শস্যাদি যা মানুষের খাদ্য, তা একেবারেই নিঃশেষ হয়ে যাবে ; অথবা অন্যান্য খাদ্য সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। অথবা কখনও এমনও হতে পারতো যে, ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কারণে মানবজাতির নাম–নিশানাও মুছে যেতো। এবং অন্য সব জীব-জন্তু বা প্রাণীকুল নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো। এমনকি চন্দ্র-সূর্যের নিয়ম-শৃংখলাও বিগড়ে যেতে পারতো। এবং অন্যান্য অগণিত বস্তুনিচয় – যা বিশ্বকে সুশৃংখল রাখার জন্য জরুরী, তার মধ্য থেকেও কোন কোন বস্তু বিশৃংখল হয়ে পড়তো। কেননা, কোটি কোটি বস্তুর পক্ষে বিনষ্ট ও বিশৃংখল হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া এবং সেগুলোর উপরে কোন প্রকার আপদ-বিপদ অবতীর্ণ না হওয়াটাই যুক্তি বহির্ভূত কথা।

অতএব, যে সমস্ত জিনিষের অস্তিত্ব বজায় থাকা এবং তাদের টিকে যাওয়া বা উত্তরণ লাভ করা অপরিহার্য ব্যাপার নয়, বরং সেগুলির কখনো কখনো বিগড়ে যাওয়াই তাদের রক্ষা পাওয়ার চাইতেও অধিক যুক্তিসঙ্গত। (অস্তিত্বের দিক থেকে স্বয়ং-অপরিহার্য না হওয়া সত্ত্বেও), সেগুলির উপরে কখনই সার্বিক ধ্বংস নেমে না আসা, এবং সেগুলোর পক্ষে সুষ্ঠুরূপে বিদ্যমান থাকা, এবং তাদের অস্তিত্বের সুসমন্বিত বিন্যাস ও সুদৃঢ় অবস্থান, এবং বিশ্বজগতের কোটি কোটি প্রয়োজনীয় জিনিসের মধ্য থেকে কোন কিছু নিঃশেষ হয়ে না যাওয়াটাই এ কথারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, এই সমস্ত কিছুর জন্য একজন জীবন-দাতা ও রক্ষাকর্তা ও স্থায়িত্ব দাতা আছেন, যিনি সমস্ত কামেল বা পারফেক্ট গুণাবলীর অধিকারী।

অর্থাৎ তিনি হবেন নিয়ন্ত্রণকর্তা, সর্বজ্ঞাতা, রহ্‌মান (অযাচিত ও অসীম দাতা), রহীম (পরম দয়াময়) এবং আপন সত্তায় চিরন্তন ও চিরঞ্জীব এবং সর্ব প্রকারের ত্রুটি থেকে মুক্ত ; যার উপরে কখনও মৃত্যু বা ধ্বংস নেমে আসে না, এমনকি তিনি তন্দ্রা ও নিদ্রা-যার সঙ্গে মৃত্যুর একটা সাদৃশ্য আছে। তা থেকেও পবিত্র। সুতরাং, সেই যে পূর্ণ গুণাবলীর অধিকারী সত্তা, যিনি এই বিশ্বজগতকে তাঁর পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা দ্বারা যথোপযুক্তভাবে অস্তিত্ব দান করেছেন, এবং নাস্তির উপরে অস্তিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন, এবং তিনিই একাকী তার কামালিয়্যত বা ঔৎকর্ষ ও সাফল্য, এবং খালেকিয়্যত বা স্রষ্টাত্ব এবং রবুবিয়্যত বা প্রতিপালকত্ব এবং কাইয়্যুমিয়্যত বা চিরস্থায়িত্ব -এর কারণে এবাদত বা উপাসনা পাওয়ার একমাত্র যোগ্য বা হকদার। এ পর্যন্ত যে আয়াতের কিছুটা ব্যাখ্যা করা হলো তা হচ্ছে ঃ

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

'আল্লাহ্-তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব (ও জীবন দাতা) চিরস্থায়ী (ও স্থিতিদাতা) ; তাঁকে না তন্দ্রা স্পর্শ করতে পারে, না নিদ্রা। যা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যা কিছু পৃথিবীতে আছে সবই তাঁর।' (২ঃ২৫৬।) – এখন মুক্ত দৃষ্টিতে দেখতে হবে যে, এই আয়াতে (আয়াতুল কুরসীতে) কত প্রাঞ্জলভাবে কত সূক্ষ্মভাবে কত গভীরভাবে এবং কত প্রজ্ঞাপূর্ণভাবে বিশ্ব-স্রষ্টার অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি-প্রমাণ উপস্থিত করা হয়েছে। এবং কীভাবে কয়েকটি মাত্র শব্দের মাধ্যমেই কত বিপুল অর্থ ও তাৎপর্য এবং কত গভীর ও সূক্ষ্ম জ্ঞানের কথা, প্রজ্ঞার কথা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা হয়েছে। এবং مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

'যা কিছু আসমানসমূহে আছে এবং যা কিছু পৃথিবীতে আছে' - কথাটির মধ্যে এমন প্রজ্ঞাময় যুক্তি দ্বারা একজন স্রষ্টার অস্তিত্ব এবং তাঁর পারফেক্ট গুণাবলী প্রমাণিত করা হয়েছে, যার পূর্ণ ও সমগ্র ব্যাপক বর্ণনার ন্যায় বর্ণনা আজও পর্যন্ত কোন দার্শনিক দিতে পারেন নি। বরং দার্শনিকদের ত্রুটিপূর্ণ জ্ঞান এটা উপলব্ধি করতে পারে নি যে, **আত্মা এবং দেহ উভয়ই সৃষ্ট**। এবং তারা এই সূক্ষ্ম রহস্য থেকেও বেখবর যে, **প্রকৃত জীবন, প্রকৃত অস্তিত্ব এবং প্রকৃত স্থায়িত্ব কেবল খোদার জন্যই নির্দিষ্ট**। এই গভীর মা'রেফাত বা নিগূঢ় উপলব্ধি এই আয়াত থেকে মানুষ লাভ করতে পারে যে, খোদা এখানে বলেছেন, সত্যিকার বা প্রকৃত অর্থে যে জীবন ও জীবনের স্থায়িত্ব, তা শুধু আল্লাহ্‌রই জন্যে যিনি সকল পূর্ণ ও পারফেক্ট গুণাবলীর আধার। তিনি ছাড়া আর কেউ-ই নেই যে প্রকৃত অস্তিত্ব ও প্রকৃত স্থায়িত্বের অধিকারী। এবং এই বিষয়টাকেই এই বিশ্বের একজন স্রষ্টা থাকার প্রয়োজনীয়তার পক্ষে যুক্তি হিসেবে পেশ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে ঃ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

'আকাশমন্ডলীতে এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর' অর্থাৎ, যখন এই বিশ্বজগতের না আছে কোন সত্যিকারের জীবন, না সত্যিকারের স্থায়িত্ব, তখন অবশ্যই তার কোন একটা আদি কারণ আছে, যার মাধ্যমে সে তার জীবন

ও অস্তিত্ব বা স্থায়িত্ব লাভ করেছে। এবং এটাও প্রয়োজন যে, সেই যে কারণ, তা হতে হবে সকল পূর্ণ ও পারফেক্ট গুণাবলীর আধার। এবং সে তার ইচ্ছানুযায়ী এই বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করবে, এবং সে হবে প্রজ্ঞাময় ও অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত-হাকীম ও আলেমুল গায়েব। অতএব, সে-ই হচ্ছে আল্লাহ্। কেননা, **কোরআন শরীফের বাগধারায় 'আল্লাহ্' হচ্ছে সেই সত্তার নাম, যিনি হচ্ছেন সকল পূর্ণতা ও উৎকর্ষতার আধার।** এ কারণেই কোরআন শরীফের মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালার নামকে যাবতীয় পূর্ণ ও পারফেক্ট গুণাবলীর অধিকারী সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ হচ্ছেন তিনিই যিনি রব্বুল আলামীন, রহ্‌মান ও রহীম। যিনি তাঁর এরাদা মাফিক বিশ্বজগতকে নিয়ন্ত্রণ করেন। যিনি সর্বজ্ঞ, আলেমুল গায়েব, সর্বশক্তিমান। এবং যিনি চিরঞ্জীব ও চিরন্তন ও চিরস্থায়ী ..... ইত্যাদি ইত্যাদি। সুতরাং কোরআন শরীফের বাগধারায় এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত যে, আল্লাহ্ হচ্ছে সেই সত্তার নাম, যা সকল পূর্ণ ও পারফেক্ট গুণাবলীর আধার ও অধিকারী। এরই প্রেক্ষিতে এই আয়াতের (আয়াতুল কুরসীর) মাথায় 'আল্লাহ্' নামেরই উল্লেখ এসেছে এবং বলা হয়েছে ঃ **'আল্লাহু লাইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম'** – আল্লাহ্ –তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব (ও জীবনদাতা), চিরস্থায়ী (ও স্থিতিদাতা)। অর্থাৎ এই মরণশীল বিশ্বজগতের স্থিতিদাতা হচ্ছেন সেই সত্তা যিনি সকল পূর্ণতা ও উৎকর্ষতার আধার। এতে এই কথার দিকে ইশারা করা হয়েছে যে, এই যে বিশ্বজাহান, যা কিনা নিখুঁতরূপে সুসমঞ্জস এবং সুসমন্বিতরূপে বিদ্যমান ও প্রকাশিত, তার সম্পর্কে এই ধারণা করা ভুল যে, এর মধ্যেকার কোন কোন বস্তু কোন কোন বস্তুর উৎপত্তির কারণ। বরং এই প্রজ্ঞাপূর্ণ কাজ–যে কাজ প্রজ্ঞার রহস্য দ্বারা ভরপূর – তার জন্য প্রয়োজন এমন একজন সৃষ্টিকর্তার, যিনি তাঁর ইচ্ছা শক্তির দ্বারা সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন, এবং যিনি প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানময়, দয়াময় এবং অবিনশ্বর এবং সমস্ত উৎকৃষ্ট গুণরাজি দ্বারা গুণান্বিত। অতএব, তিনিই হচ্ছেন **আল্লাহ্**। তিনি তাঁর সত্তায় সমস্ত সর্বোত্তম ঔৎকর্ষের অধিকারী। এছাড়া, জগতের সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের প্রমাণ লাভের পর সত্যান্বেষীকে এই কথাও উপলব্ধি করতে হবে যে, সেই সৃষ্টিকর্তা সর্বপ্রকারের অংশীদারিত্ব বা শিরক থেকেও সম্পূর্ণ মুক্ত। তাই, এই দিকেই ইশারা করে বলা হয়েছে ঃ **'কোল্ হুয়াল্লাহো আহাদ আল্লাহুস সামাদ'** – (বল, তিনিই আল্লাহ্ , এক-অদ্বিতীয় ; আল্লাহ্ স্বনির্ভর ও সর্বনির্ভরস্থল) – এই যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তাকে মর্যাদা ও গুরুত্বের দিক থেকে শুধু একটামাত্র পংক্তিরূপেই বিবেচনা করা ঠিক হবে না। কেননা, এর মধ্যে অতি সূক্ষ্মভাবে এবং অতি অকাট্যরূপে মহান সৃষ্টিকর্তার সত্তাকে সর্বপ্রকারের শিরক বা অংশীবাদিতা থেকে পবিত্র ঘোষণা করা হয়েছে। এর বিস্তারিত হচ্ছে, যুক্তিবুদ্ধির দিক থেকে **শিরক বা অংশীদারিত্ব চার প্রকার**। কখনও তা সংখ্যার দিক থেকে, কখনও মর্তবা বা মর্যাদার দিক থেকে, কখনও সম্পর্কের দিক থেকে, আর কখনও বা তা কার্য ও কার্যকারিতার দিক থেকে।

সুতরাং, এই সূরাটির মধ্যে (অর্থাৎ সূরা এখলাস ঃ **'কোল্ হুয়াল্লাহো আহাদ ; আল্লাহুস সামাদ। লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ; ওয়া লাম ইয়া কুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ।'** – বল, তিনিই আল্লাহ্ এক-অদ্বিতীয়, আল্লাহ্ স্বনির্ভর ও সর্বনির্ভরস্থল। তিনি কাউকে জন্ম দেননি, এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি ; এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই) – এই চার প্রকারের শির্‌ক থেকেই খোদাতায়ালাকে পবিত্র বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এবং পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, তিনি সংখ্যার দিক থেকে এক ; তিনি দুই বা তিন নন। তিনি 'সামাদ' অর্থাৎ তিনি মর্যাদার দিক থেকে অনন্য এবং স্বনির্ভরতার দিক থেকেও অনন্য এবং তিনি ছাড়া বাকী সমস্ত কিছুই লয়শীল ও নশ্বর এবং সব সময়ের জন্য তাঁরই প্রতি নির্ভরশীল। এবং তিনি 'লাম ইয়ালিদ' – কাউকে জন্ম দেননি ; অর্থাৎ তাঁর কোন পুত্র নেই, তাই পুত্র হওয়ার দরুণ তার কোন শরীক বা অংশীদার থাকার সম্ভাবনাও নেই। এবং তিনি 'লাম ইউলাদ' – অর্থাৎ তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি ; তাই তাঁর কোন পিতাও নেই ; কাজেই পিতা হওয়ার কারণে কেউ তাঁর শরীক হবেন, এমন সম্ভাবনাও নেই। এবং তিনি 'লাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ'– অর্থাৎ তাঁর কাজে কর্মে কেউ তাঁর সমকক্ষ হতে পারে না – সমকক্ষ নেই। অতএব, কর্মকাণ্ডের দিক থেকেও তাঁর কোন শরীক থাকতে পারে না, নেই। সুতরাং, এখানে সুস্পষ্টরূপে বলে দেওয়া হয়েছে যে, খোদাতায়ালা চার প্রকারের শির্‌ক থেকেই মুক্ত এবং পবিত্র, এবং তিনি ওয়াহেদ ও লা-শরীক ঃ এক ও অংশীবিহীন।

অতঃপর, তাঁর ওয়াহেদ ও লা-শরীক হওয়ার ব্যাপারে আরও একটি যৌক্তিক প্রমাণ পেশ করা হয়েছে ঃ لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا

[যদি (আসমান ও যমীন) এতদুভয়ের মধ্যে আল্লাহ্ ছাড়া আরও উপাস্য থাকতো তাহলে নিশ্চয় উভয়েই বিনষ্ট হয়ে যেতো – ২১ঃ২৩।]

আরো বলা হয়েছে ঃ وَمَا كَانَ مَعَهُۥ مِنْ إِلَٰهٍ – (এবং তার সঙ্গে আর কোন উপাস্য নেই) –(২৩ঃ৯২)।

অর্থাৎ, যদি যমীন ও আসমানের মধ্যে সেই সর্বোত্তম সর্বগুণাধার সত্তা ব্যতীত অন্য আরও কোথাও কোন খোদা থাকতো তাহলে তারা উভয়েই বিনষ্ট হয়ে যেতো। কেননা, সেক্ষেত্রে অবশ্যই কোন না কোন সময় ঐ সব খোদা একে অপরের বিরুদ্ধে চলে যেতো এবং তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের সৃষ্টি হতো। ফলে, বিশ্বজগতের মধ্যে ফাসাদ ও বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়তো। এছাড়া, যদি আলাদা আলাদা স্রষ্টা হতো, তাহলে প্রত্যেকেই শুধু তার নিজের সৃষ্ট জগতের কল্যাণ চাইতো, তার আরাম ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অন্যদেরকে ধ্বংস করে দিতেও কুণ্ঠা বোধ করতো না। এর ফলেও, ফাসাদ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সৃষ্টি হতো। কিন্তু, তা যখন হয় না, তখন এথেকেও খোদাতায়ালার এক ও অংশীবিহীন – ওয়াহেদ

ও লাশরীক–হওয়াই প্রমাণিত হয়। তদুপরি, খোদা যে ওয়াহেদ ও লা-শরীক সে সম্পর্কে এই যুক্তিও পেশ করা হয়েছে ঃ

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْلًا ۝

['বল্ তিনি (আল্লাহ্) ব্যতিরেকে তোমরা যাদেরকে (উপাস্য বলে) দাবী করছো, তোমরা তাদেরকে ডাক, তাহলেই (তোমরা বুঝতে পারবে যে,) তোমাদের নিকট থেকে দুঃখ দূর করবার অথবা তোমাদের অবস্থা পরিবর্তন করবার কোন ক্ষমতাই তাদের নেই' – ১৭ঃ৫৭]

অর্থাৎ পৌত্তলিকদেরকে এবং খোদাতায়ালার অস্তিত্বকে অস্বীকারকারীদেরকে বল, যদি খোদাতায়ালার কর্মকান্ডের অপর কেউ অংশীদার থেকেই থাকে, এবং যদি বর্তমানে বিদ্যমান উপায় উপকরণই যথেষ্ট হয়ে থাকে, তাহলে, ইসলামের সত্যতার প্রমাণাদি এবং এর গৌরব ও ক্ষমতার মোকাবেলায় তোমরা যখন পরাভূত হয়ে পড়েছ, তখন তোমরা ঐ সকল অংশীদারকে ডাক না কেন। কিন্তু মনে রাখবে যে, তারা কখনই তোমাদের দুঃখ-দৈন্যকে দূরীভূত করতে পারবে না, এবং তোমাদের মাথার উপর থেকে তোমাদের বালা–মুসিবত বা বিপদ-আপদকেও অপসারিত করতে পারবে না। হে রসূল ! তুমি ঐ মুশরেকদেরকে বলে দাও যে, তোমরা তোমাদের ঐ সব অংশীদারকে যাদের উপাসনা তোমরা কর, তাদেরকে আমার মোকাবেলায় আহবান কর, এবং আমাকে পরাভূত করার যত প্রকারের চেষ্টা-তদবীর তোমরা করতে পার তা সবই কর, এবং আমাকে কোন সামান্য অবকাশও তোমরা দিও না। কিন্তু, তথাপি, এ কথা জেনে রাখবে যে, আমার রক্ষাকারী, সাহায্যকারী এবং সহায়তাকারী হচ্ছেন সেই খোদা, যে খোদা কোরআন অবতীর্ণ করেছেন, এবং তিনিই তাঁর সত্য ও সাধু রসূলগণকে স্বয়ং সাহায্য করেন, সমর্থন করেন। পক্ষান্তরে, তোমরা যাদেরকে – যে বস্তুগুলোকে – সাহায্যের জন্যে ডেকে থাকো, তাদের কোন সাধ্যই নেই এবং তাদের পক্ষে এটা সম্ভবই নয় যে, তারা তোমাদের কোন সাহায্য করে। এমন কি, তারা তো তাদের নিজেদেরও কোন সাহায্য করতে পারে না।

অতঃপর, এটাও প্রমাণিত করা হয়েছে যে, খোদাতায়ালা প্রত্যেক প্রকারের ক্ষয়ক্ষতি এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। বলা হয়েছে ঃ

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ

সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং ওদের মধ্যে যারা আছে তারা সবাই তাঁর তস্‌বীহ্ (পবিত্রতা ঘোষণা) করছে .... ১৭ঃ৪৫] অর্থাৎ, সাত আসমান ও যমীন এবং ওদের মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবাই খোদাতায়ালার পবিত্রতা ঘোষণা করছে, এবং এমন কিছুই বাকী নেই যা তাঁর পবিত্রতার গুণ-কীর্তন করছে না। অথচ, তোমরা তাঁর পবিত্রতাকে উপলব্ধি করছ না। অন্য কথায়, যমীন ও আসমানের প্রতি গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, খোদাতায়ালা পূর্ণ-

পারফেক্ট এবং পবিত্র, এবং তিনি পুত্র থেকে বা কোনও অংশীদার থেকে মুক্ত ও পবিত্র। কিন্তু, এই প্রমাণ তারাই পায় যারা উপলব্ধির ক্ষমতা রাখে।

অতঃপর, পৃথকভাবেও, সৃষ্টির উপাসনাকারীদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং তাদের সেই পাপাচারে লিপ্ত থাকার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ هُوَ الْغَنِيُّ

[তারা বলে, 'আল্লাহ্ পুত্র সন্তান গ্রহণ করেছেন। (অথচ) পবিত্র তিনি, তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ . . . ১০ঃ ৬৯]

অর্থাৎ, অনেকে বলে কিনা খোদার পুত্র আছে। অথচ, পুত্রের মুখাপেক্ষী হওয়াটা একটা ক্ষতি ও অসম্পূর্ণতার লক্ষণ। এবং খোদা তো প্রত্যেক প্রকারের ক্ষতি বা অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্ত। তিনি তো গনী-স্বয়ং-সম্পূর্ণ এবং স্বনির্ভর – বেনিয়ায ; তাঁর তো কোন কিছুরই আবশ্যকতা নেই। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তো তাঁরই। কী ? তোমরা কি খোদার প্রতি এমন দোষ আরোপ করতে চাও, যার সমর্থনে তোমাদের কাছে কোনও প্রকারের কোন প্রমাণ নেই ? খোদা কেন পুত্রের মুখাপেক্ষী হবেন ? তিনি তো কামেল – পুর্ণ ও পারফেক্ট। এবং তিনি তো তাঁর উলুহিয়্যত বা খোদায়ীর দায়িত্ব সম্পাদনে একাই যথেষ্ট। তাঁর তো সহায়ক কোন কিছুর কোন প্রয়োজন নেই। আবার অনেকে বলে কি যে, খোদার নাকি বেটীও আছে ! অথচ, তিনি সমস্ত প্রকারের অসম্পূর্ণতা বা ক্ষতি থেকে পবিত্র। কী বলতে চাও তোমরা, তোমাদের জন্য বেটা, আর তাঁর জন্যে বেটী ? আরে, এটা তো ঠিক ঠিক বাঁটোয়ারাও হলো না ! ওহে মানুষেরা ! তোমরা সেই ওয়াহেদ ও লা-শরীক খোদার এবাদত কর যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের বাপ-দাদাদেরকে পয়দা করেছেন। তোমাদের তো উচিত সেই এক সর্বশক্তিমানকে ভয় করা যিনি তোমাদের জন্য এই যমীনকে বিছানাস্বরূপ এবং আসমানকে ছাদ স্বরূপ নির্মাণ করেছেন। এবং আসমান থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য নানা প্রকারের ফলমূল ও শস্যাদি উৎপন্ন করছেন। সুতরাং তোমরা জেনে শুনে ঐ সমস্ত বস্তুকে তোমাদের খোদার শরীক বানিও না, যেগুলোকে তোমাদের উপকারের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। খোদা এক, তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি আকাশেও খোদা এবং পৃথিবীতেও খোদা। তিনিই আদি, তিনিই অন্ত। তিনিই প্রকাশ্য, তিনিই গোপন। চক্ষু তাঁর সত্তাকে ধারণ ও অবলোকন করতে পারে না, কিন্তু তিনি চক্ষুর সত্তাকে ধারণ ও পরিবেষ্টন করে আছেন। তিনি সকলের স্রষ্টা এবং তাঁর মত কিছুই নেই। এবং তার স্রষ্টা হওয়ার ব্যাপারে একটা সুস্পষ্ট প্রমাণ এই যে, তিনি প্রত্যেকটি জিনিসকেই সৃষ্টি করেছেন একটা নির্ধারিত পরিমাণ মত, যথোপযুক্তরূপে এবং সীমাবদ্ধরূপে ; এ থেকেও প্রমাণিত হয় একজন পরিমাণ ও সীমা নির্ধারণকারীর আবশ্যকতা। এবং তিনিই সকল প্রশংসার অধিকারী। ইহকাল ও পরকালে তিনিই প্রকৃত পুরস্কারদাতা। সমস্ত হুকুম বা আদেশ দানের অধিকার তাঁরই হাতে ন্যস্ত। এবং তিনিই সমস্ত

কিছুর আশ্রয় ও প্রত্যাবর্তনস্থল। খোদা যাকে চাইবেন তার প্রত্যেক পাপ ক্ষমা করে দিবেন। কিন্তু, শির্‌ক বা অংশীবাদিতাকে কখনই ক্ষমা করবেন না। সুতরাং যে ব্যক্তি খোদাতায়ালার সঙ্গে সাক্ষাতের আশা রাখে, তার উচিত সে যেন এমন কাজকর্ম করে যার মধ্যে কোন প্রকার ফাসাদ বা গ্লানি না থাকে, এবং সে যেন খোদাতায়ালার এবাদতে কোনও কিছুরই শরীক না করে। খোদার সঙ্গে কোন কিছুরই শরীক করো না, কোনক্রমেই না। খোদার সঙ্গে শরীক করা কঠিন পাপ। খোদা ছাড়া অন্য কারো কাছেই কোন প্রার্থনা করো না। সমস্ত কিছুই লয়প্রাপ্ত হবে। একমাত্র তাঁরই সত্তা বিদ্যমান থাকবে। হুকুম দানের এখ্‌তিয়ার একমাত্র তাঁরই। এবং তিনিই তোমাদের আশ্রয়স্থল, প্রত্যাবর্তনস্থল।' – (বারাহীনে আহ্‌মদীয়া, পৃ. ৪৯৩–৪৯৯, উপ-পাদটীকা-৩)

(২০)

'খোদাতায়ালার প্রাকৃতিক বিধান এবং এই প্রকৃতির গ্রন্থ, যা কিনা আদিকাল থেকে এবং মানবসৃষ্টির সূচনা থেকেই বিদ্যমান রয়েছে, তা আমাদেরকে এই শিক্ষাই দেয় যে, খোদার সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে, তাঁর কৃপা ও তাঁর সৌন্দর্য সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করা। এবং এখনই আমরা লিখে এসেছি যে, 'এহসান' বা কৃপার অর্থ হচ্ছে, খোদাতায়ালার চারিত্রিক গুণাবলীর কার্যকারিতা, যার অভিজ্ঞতা যে কোন মানুষ স্বয়ং অর্জন করতে সক্ষম। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নিরূপায় ও অসহায় ও দুর্বল ও অনাথ অবস্থায় মানুষের অভিভাবক হন খোদাতায়ালা। তার প্রয়োজনে, তার চাহিদার সময়ে খোদা স্বয়ং তার প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণ করেন। এবং কঠিন দুঃখ ও দুশ্চিন্তার সময়ে খোদা স্বয়ং তাকে সাহায্য করে থাকেন। এবং খোদান্বেষণের সময়ে তাকে কোন মুর্শেদ বা পথ-প্রদর্শনের মাধ্যম ছাড়াই স্বয়ং খোদা-ই তাকে পথ-প্রদর্শন করে থাকেন। এবং 'হুসন' বা সৌন্দর্য বলতেও খোদাতায়ালার সেই 'সুন্দর' গুণাবলীকেই বুঝানো হয়েছে যা এহ্‌সান বা কৃপার আকারে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। দৃষ্টান্তস্থলে, খোদাতায়ালার কামেল কুদরত বা তাঁর পরিপূর্ণ ক্ষমতা, তাঁর মমতা, তাঁর দয়া, এবং তাঁর রবুবিয়্যত এবং সেই রহম যা খোদার মধ্যে পাওয়া যায়, এবং তাঁর সেই সাধারণ বা আম রবুবিয়্যত–প্রতিপালকত্ব – যা সব সময়ই পরিলক্ষিত হচ্ছে ; এবং সেই সমস্ত সাধারণ বা সার্বজনীন নেয়ামত ও দান যা মানুষের আরাম-আয়েশের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুদ রয়েছে ; এবং তাঁর সম্পর্কে সেই জ্ঞান যা মানুষ অর্জন করে নবীগণের মাধ্যমে, যার ফলে সে মৃত্যু এবং ধ্বংস থেকে বেঁচে যায় ; এবং তাঁর সেই যে গুণ, তিনি বেকারার ও বেচঈন বা উৎকণ্ঠিতদের দোয়া কবুল করেন, – এবং তাঁর সেই যে সৌন্দর্য, মানুষ যখন তাঁর প্রতি ঝুঁকে যায় তখন তিনি তার প্রতি আরও অধিক ঝুঁকে যান ; এ সমস্ত গুণাবলীই খোদাতায়ালার ঐ 'হুসন' বা সৌন্দর্য -এর অন্তর্ভুক্ত। এবং ঐ সমস্ত গুণাবলীই – যার দ্বারা বিশেষভাবে কোন মানুষ যখন বিভূষিত হয়ে যায়, তখন

তা সবই তার কাছে কৃপা রূপে পরিগণিত হয়, যদিও তা অন্যদের কাছে কেবলমাত্র সৌন্দর্য রূপেই প্রতিভাত হয়। কোন ব্যক্তি যদি খোদাতায়ালার এই সকল গুণ – যা প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁর রূপ ও সৌন্দর্য – তাকে এহসান বা কৃপা রূপে প্রত্যক্ষ করে, তাহলে তার ঈমান অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এবং সে খোদাতায়ালার প্রতি এত বেশী জোরে আকর্ষিত হয় যেমন লোহা আকর্ষিত হয় চুম্বকের প্রতি। খোদার প্রতি তার ভালবাসা গভীরতর হয়। এবং খোদার প্রতি নির্ভরশীলতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। এবং যেহেতু সে এই অভিজ্ঞতা লাভ করে যে, তার যাবতীয় কল্যাণ খোদাতেই নিহিত, সেহেতু তার সকল প্রত্যাশা পূরণের জন্য খোদার প্রতি তার ভরসা অত্যন্ত সুদৃঢ় হয়। সে স্বভাবগতভাবেই খোদার দিকে ঝুঁকে যায়, কষ্ট করে কিংবা বানাওটিভাবে নয়। এবং নিজের সত্তাকে সব সময়েই খোদার সাহায্যের মুখাপেক্ষী দেখতে পায়। এবং খোদাতায়ালার ঐ সমস্ত পূর্ণ-পারফেক্ট গুণাবলীর কার্যকারিতা সম্পর্কে সে এমন সুদৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে যে, সে নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে। কেননা, খোদার কৃপা, অনুগ্রহ ও বদান্যতার বহু অভিজ্ঞতা সে তখন নিজের জীবনেই অর্জন করে। এজন্য তার সব প্রার্থনাই শক্তি ও নিশ্চয়তার প্রস্রবণ থেকে নির্গত হয়। এবং তার প্রতিজ্ঞাও হয় অত্যন্ত সুদৃঢ় এবং অটল। এবং অবশেষে, ঐশী কৃপা ও প্রাচুর্য দর্শনে নূরে ইয়াকীন বা দৃঢ় বিশ্বাসের আলো প্রবলবেগে তার অন্তরে প্রবেশ করে, এবং তার নিজের (অহং বা খুদীর) অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে জ্বলে নিঃশেষ হয়ে যায়। এবং খোদাতায়ালার মাহাত্ম্য ও ক্ষমতা সম্পর্কে বার বার গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার ফলে তার হৃদয় আল্লাহ্‌র ঘর হয়ে যায়। এবং যেভাবে মানুষের আত্মা তার জীবিত থাকার অবস্থায় কখনই তার দেহ থেকে পৃথক হয়ে যায় না, তেমনিভাবে গৌরবের ও শক্তির অধিপতি খোদাতায়ালার তরফ থেকে যে একীন বা দৃঢ় বিশ্বাস তার অন্তরে প্রবিষ্ট হয়, তা-ও কখনও তার মধ্য থেকে পৃথক হয় না। এবং সব সময়ই 'পবিত্র আত্মা' তার অন্তরে প্রেরণার সৃষ্টি করে চলে। এবং সেই 'পবিত্র আত্মার' প্রদত্ত শিক্ষা বা তা'লীম অনুযায়ী সে কথা বলে এবং তার ভেতর থেকে সত্যতা, সূক্ষ্মজ্ঞান বা মা'রেফাত নির্গত হতে থাকে। এবং তার হৃদয়ের প্রান্তরে মর্যাদা ও মহিমার অধিপতি আল্লাহ্‌তায়ালার তাঁবু সব সময়ের জন্যই স্থাপিত হয়ে যায়। এবং দৃঢ় বিশ্বাস ও সাধুতা ও ভালবাসার আনন্দ সর্বদা পানির ন্যায় তার অন্তরে প্রবাহিত হতে থাকে। যার দ্বারা তার প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লালিত-পালিত হয়। চক্ষু থেকে তার এক ভিন্ন জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হয়। ললাটে তার এক পৃথক আলো উদ্ভাসিত হয়। চেহারাতে তার ঐশী ভালবাসার বারিধারা বর্ষিত হচ্ছে বলে অনুমিত হয়। এবং জিহ্বাও তার সেই আলোকেরই সম্পাতে উদ্দীপিত হয়। এমনিভাবে, তার সকল অঙ্গে ও প্রত্যঙ্গে এমন এক আলোকোজ্জ্বল প্রস্ফুটিত অবস্থা দৃষ্টিগোচর হয়, যেমন প্রাক-বসন্তের বৃষ্টিধারার পর বসন্তকালে বৃক্ষরাজির শাখায় শাখায় পত্রে-পল্লবে, ফুলে-ফলে নব-জীবনের হিল্লোল উল্লসিত হয়ে ওঠে। কিন্তু, যে ব্যক্তির অন্তরে এই আত্মা অবতীর্ণ হয়নি, এবং যে এই নব-

নবীনের স্পর্শে স্পন্দিত হয় নি, তার সারাটা অস্তিত্বই মৃতবৎ। এই লহরিত-সজীবতা, এই প্রস্ফুটিত-প্রফুল্লতা যার বর্ণনা দুঃসাধ্য, তা কখনই সেই মৃত হৃদয়ের পক্ষে লাভ করা সম্ভব হয় না, যা ঐ দৃঢ়-বিশ্বাসের আলোকের প্রস্রবণে অবগাহন করে না ; বরং তার মধ্য থেকে গলিত লাশের দুর্গন্ধই নির্গত হয়। কিন্তু সেই ব্যক্তি যাকে আলো বা নুর দান করা হয়েছে এবং যার অন্তরে সেই প্রস্রবণ উৎসারিত হয়েছে তার চিহ্নসমূহের মধ্য থেকে একটি চিহ্ন হচ্ছে এই যে, তার প্রাণ সর্বদা এই কামনাই করে যে, সে যেন তার প্রতিটি বিষয়ে, প্রতিটি কথায় এবং প্রতিটি কাজে খোদাতায়ালা থেকে শক্তি লাভ করে। এর মধ্যেই তার আনন্দ, এর মধ্যেই তার প্রশান্তি ; এবং এ ছাড়া সে বাঁচতেই পারে না।' – (রিভিউ অব রিলিজিয়ন্‌স, উর্দু, খ. ১, পৃ. ১৮৯)

(২১)

'পূর্ণ প্রশংসা হতে পারে মাত্র দু'প্রকার গুণের ক্ষেত্রে ঃ এক, – পরম সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে ; দুই, – পরম কৃপার (ও কল্যাণময়তার) ক্ষেত্রে। কিন্তু, কারো মধ্যে যদি উভয় গুণই থাকে, তাহলে তার জন্যে হৃদয় উৎসর্গিত হয়ে যায়, সমর্পিত হয়ে যায়। এবং কোরআন শরীফের সব চাইতে বড় উদ্দেশ্য এটাই যে, খোদাতায়ালার এই উভয় প্রকারের গুণকে সত্যান্বেষীর কাছে প্রকাশিত করা, যাতে করে ঐ অতুল ও অনুপম সত্তার প্রতি মানুষ ধাবিত হয়। এবং আত্মার আগ্রহ ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাঁর ইবাদত করে। এ কারণেই প্রথম সূরার মধ্যেই এমন সুন্দররূপে সুস্পষ্ট চিত্র ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন, সেই যে খোদা যাঁর প্রতি কোরআন আহ্বান জানায় তিনি কতই, কতই না অনুপম সৌন্দর্যের অধিকারী! সুতরাং এই উদ্দেশ্যেই এই সূরাটি শুরু করা হয়েছে 'আল্‌হামদুলিল্লাহ্' বলে। যার অর্থ এটাই যে, সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার জন্যই উপযোগী যার নাম 'আল্লাহ্'। এবং কোরআন করীমের বাগ্‌ধারায় 'আল্লাহ্' হচ্ছে সেই সত্তার নাম যাঁর সমস্ত গুণাবলী সুন্দরতার এবং কৃপাময়তার চরমে পৌঁছে গেছে। এবং তাঁর সত্তায় কোন ক্রটি নেই, বিচ্যুতি নেই। কোরআন শরীফের মধ্যে সমস্ত গুণাবলীর আধার সাব্যস্ত করা হয়েছে শুধু 'আল্লাহ্' নামটিকেই। এবং তা করা হয়েছে এই জন্যে যে, এতে করে যেন এই দিকে ইঙ্গিত করা যায় যে, 'আল্লাহ্' নামটি কেবল তখনই সঠিক ও যথার্থ প্রতিপন্ন হবে যখন সমস্ত পূর্ণতম গুণাবলী তার মধ্যে পাওয়া যাবে। অতএব, সর্বপ্রকারের গুণাবলী যখন তার মধ্যে পাওয়া গেল, তখন তার সৌন্দর্য প্রকাশিত হলো। এই সৌন্দর্যের কারণেই কোরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালার নাম বলা হয়েছে 'নূর' – (আলো)। যেমন বর্ণিত হয়েছে ঃ

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়ালা পৃথিবীর ও আসমানসমূহের নূর – আলো (২৪ঃ৩৬)। এবং প্রত্যেক আলো–ই তাঁরই আলোর প্রতিবিম্ব। এবং এহ্‌সান বা কৃপাময়তার সৌন্দর্য প্রকাশের অসংখ্য নাম রয়েছে আল্লাহ্‌তায়ালার। এগুলির মধ্যে প্রধান মৌলিক নাম হচ্ছে চারটি। স্বাভাবিক তরতীব বা ক্রম অনুসারে এগুলির মধ্যে

প্রথম সৌন্দর্যের নাম সূরা ফাতেহার মধ্যে যে কথার দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে তা হচ্ছে – **'রব্বুল আলামীন'** – (সকল জগতের প্রভু–প্রতিপালক) ; এতে বলা হয়েছে যে, খোদাতায়ালার 'রবুবিয়্যত' – অর্থাৎ সৃষ্টি করা এবং সেই সৃষ্টিকে উদ্দিষ্ট সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করা, সকল জগতের মধ্যেই অব্যাহত রয়েছে, কার্যকর রয়েছে। অর্থাৎ আসমানের জগৎ, যমীনের জগৎ, দেহের জগৎ, আত্মার জগৎ, প্রাণিজগৎ, উদ্ভিদজগৎ, খনিজ পদার্থের জগৎ এবং অন্যান্য সকলজগৎ তাঁর রবুবিয়্যত -এর কল্যাণেই প্রতি পালিত হচ্ছে, লালিত হচ্ছে। এমন কি যে, মানুষও তার শুক্রকীটে রূপ লাভের সূচনা থেকে কিংবা তার পূর্ব থেকে, যা মৃতের জগৎ পর্যন্ত অথবা দ্বিতীয় জীবনের কাল পর্যন্ত বিস্তৃত, তা সবই রবুবিয়্যত-এর প্রস্রবণ থেকেই প্রতিপালিত হচ্ছে, কল্যাণ প্রাপ্ত হচ্ছে। সুতরাং ঐশী রবুবিয়্যত যেহেতু সকল আত্মা, সকল দেহ, সকল প্রাণী, সকল উদ্ভিদ, সকল খনিজ পদার্থ প্রভৃতিতে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে, সেহেতু তা নির্বিশেষ সাধারণ কৃপা বা 'ফয়যানে আ'অম' বলে আখ্যায়িত। কেননা, প্রতিটি সত্তাই তা থেকে কল্যাণ প্রাপ্ত হয়। এবং তার মাধ্যমেই সব কিছু অস্তিত্ব লাভ করে। তবে, ঐশী রবুবিয়্যত যদিও প্রতিটি সত্তার অস্তিত্বদানকারী এবং প্রতিটি প্রকাশিত বস্তুর প্রতিপালন ও সংরক্ষণকারী, তবু কৃপা ও কল্যাণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বেশী সুবিধা ভোগ করে মানুষ। কেননা, খোদাতায়ালার সমগ্র সৃষ্টি থেকেই উপকৃত হয় মানুষ। এজন্যই মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তোমার খোদা হচ্ছেন 'রব্বুল আলা'মীন'। যেন এতে করে তার আশা বৃদ্ধি পায় এবং তার বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে, খোদাতায়ালার কুদরৎ বা ক্ষমতা অসীম, এবং তার উপকারের জন্য তিনি প্রয়োজনীয় সব কিছুই সৃষ্টি করতে ও সরবরাহ করতে পারেন।

দ্বিতীয় সৌন্দর্য খোদাতায়ালার যা কিনা দ্বিতীয় স্তরের এহ্সান বা কৃপাময়তা, যাকে সাধারণ কৃপা বা 'ফয়যানে আম' বলে আখ্যায়িত করা যায়,তা হচ্ছে – রহ্মানিয়্যত'। এবং এই সৌন্দর্য্যকে সূরা ফাতেহার মধ্যে যে কথার দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে, তা হচ্ছে, – **'আর রহমান'**। এবং কোরআন শরীফের বাগ্ধারায় খোদাতায়ালার এক নাম 'রহমান' এ জন্যই রাখা হয়েছে যে, প্রত্যেক শ্রেণীর প্রাণী, যার মধ্যে মানুষও অন্তর্ভুক্ত, তাকে তার উপযোগী করে আকৃতি ও প্রকৃতি দান করা হয়েছে। অর্থাৎ যার জন্য যে ধরনের জিন্দেগী নির্ধারিত করা হয়েছে তার সেই জিন্দেগীর জন্য উপযোগী যে সব শক্তি ও ক্ষমতার দরকার কিংবা যে প্রকারের শারীরিক গঠন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইত্যাদির প্রয়োজন তার সব কিছুই তাকে দান করা হয়েছে। এবং তার টিকে থাকার জন্য যে সব জিনিসের প্রয়োজন তা-ও সবই তাকে সরবরাহ করা হয়েছে। পাখিদের জন্য পাখিদের উপযোগী, পশুদের জন্য পশুদের উপযোগী এবং মানুষের জন্য মানুষের উপযোগী শক্তিসমূহ দান করা হয়েছে। শুধু এতটাই নয়, বরং এদের সকলের অস্তিত্ব প্রাপ্তির হাজার হাজার বছর পূর্বেই আল্লাহ্তায়ালা আপন 'রহমানিয়্যত' গুণের কারণে সমস্ত আস্মানী ও

পার্থিব প্রয়োজনীয় জিনিস, সরঞ্জাম ও আসবাবসমূহ' সৃষ্টি করে রেখেছেন, যাতে করে তিনি এদের অস্তিত্বের সংরক্ষণকারীও হতে পারেন। অতএব, এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, খোদাতায়ালার রহমানিয়্যত-এর মধ্যে কারো কর্মের কোনও দখল বা প্রভাব নেই। বরং সেই রহমত স্বতঃপ্রণোদিত, যার বুনিয়াদ স্থাপিত হয়েছে এই সকল কিছুর সৃষ্টির পূর্বেই। অবশ্য, এটাও ঠিক যে, খোদাতায়ালার রহমানিয়্যত-এর মধ্যে মানুষের হিস্যাই বেশী। কেননা, প্রত্যেকটি জিনিষ মানুষের সাফল্যের খাতিরেই কোরবানী হচ্ছে। এজন্যই মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তোমার খোদা হচ্ছেন 'রহমান'।

খোদাতায়ালার তৃতীয় সৌন্দর্য, যা তাঁর তৃতীয় স্তরের কৃপা বা এহ্সান তা হচ্ছে তাঁর 'রহীমিয়্যত'। যা সূরা ফাতেহার মধ্যে **'আর রহীম'** কথাটির দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এবং কোরআন শরীফের বাগধারা অনুযায়ী খোদাতায়ালা নিজেকে 'রহীম' বলেন সেই অবস্থায়, যে অবস্থায় তিনি মানুষের প্রার্থনা এবং বিজয় এবং সৎকর্মকে কবুল করে বিপদ-আপদ, বালা-মুসীবত এবং ব্যর্থ-প্রচেষ্টা থেকে রক্ষা করেন। এই এহ্সানকে অন্য কথায় বলা হয় 'ফয়েয খাস' বা বিশেষ কল্যাণ। এবং তা শুধু মানুষের জন্যই নির্দিষ্ট। অন্য কোন কিছুকেই খোদাতায়ালা প্রার্থনা ও বিনয় ও সৎকর্ম করার ক্ষমতা দান করেন নি, কিন্তু মানুষকে দিয়েছেন। মানুষ হচ্ছে বাক্‌শক্তিসম্পন্ন প্রাণী। এবং সে নিজের বাক্‌শক্তির মাধ্যমে খোদাতায়ালার কৃপা ও কল্যাণ লাভ করতে পারে। অন্য কোন কিছুকেই অনুরূপ বাক্‌শক্তি বা কথা বলবার শক্তি দান করা হয় নি। কাজেই এতদ্‌দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, **মানুষের প্রার্থনা করাটা তার মনুষ্যত্বেরই একটা বৈশিষ্ট্য, যা তার স্বভাবের মধ্যেই নিহিত রয়েছে**। যেভাবে খোদাতায়ালার রবুবিয়্যত ও রহমানিয়্যত গুণগুলি থেকে কল্যাণ লাভ হয়, তেমনিভাবে তাঁর 'রহীমিয়্যত' গুণ থেকেও কল্যাণ লাভ হয়ে থাকে। প্রার্থক্য শুধু এতটুকুই যে, রবুবিয়্যত ও রহ্মানিয়্যত -এর কল্যাণ প্রার্থনার অপেক্ষা রাখে না। কেননা, এই উভয় গুণ মানুষের সঙ্গে বিশিষ্টরূপে সম্পর্কিত নয়, বরং তা সকল পশু-পাখী প্রভৃতিকে আপনার কল্যাণ দ্বারা কল্যাণমন্ডিত করে। বরং রবুবিয়্যত-এর গুণ তো বস্তুজগৎ, প্রাণিজগৎ, উদ্ভিদ-জগৎ, খনিজ পদার্থের জগৎ, আসমানীজগৎ ও পার্থিবজগৎ প্রভৃতি সমস্ত কিছুকেই কল্যাণ বিতরণ করছে ; কোন কিছুই এই গুণের কল্যাণের বহির্ভূত নয়। কিন্তু, এর বিপরীতে 'রহীমিয়্যত' হচ্ছে মানুষের জন্য এক বিশেষ খিলাত বা পরিচ্ছদ। মানুষ হয়েও কেউ যদি এই 'রহীমিয়্যত'-এর গুণ থেকে লাভবান হতে না পারে, তাহলে বলতে হবে যে, সে মানুষ নয় পশু, বরং যে প্রস্তর খণ্ড তুল্য।

খোদাতায়ালা যখন কল্যাণ বিতরণের জন্য তাঁর সত্তার মধ্যে চারটি গুণ ধারণ করেছেন তখন 'রহীমিয়্যত' – যার জন্য মানুষের প্রার্থনা করা প্রয়োজন–তা শুধু মানুষের জন্যই খাসভাবে নির্দিষ্ট করেছেন তিনি। অতএব, এথেকেই

প্রমাণিত হয় যে, খোদাতায়ালার সত্তায় এমন এক প্রকার কল্যাণ রয়েছে যার সম্পর্ক প্রার্থনার সঙ্গে এবং তা দোয়া ছাড়া অন্য কোন উপায়ে পাওয়া সম্ভব নয়। এটা সুন্নতুল্লাহ বা আল্লাহ্র রীতি এবং ঐশী বিধান, এর কোন ব্যতিক্রম বৈধ নয়। এটাই সেই কারণ, যে জন্য নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম) নিজ নিজ উম্মতের জন্য সর্বদা দোয়া করতেন। তওরাতের মধ্যে দেখো, কত বার বনী ইসরাঈল খোদাতালাকে নারাজ করে আযাবের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল, আবার কিভাবে হযরত মূসা আলায়হিস সালামের দোয়া, কাকুতি-মিনতি ও সিজদার দ্বারা সেই সব আযাব টলে গিয়েছিল, যদিও বার বার খোদাতায়ালা ঘোষণাও দিতেন যে, তিনি তাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন।

এই সকল ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, **দোয়া কোন বৃথা বিষয় নয়। এবং তা শুধু এমন এবাদতও নয় যার উপরে কোন প্রকার কল্যাণ বর্ষিত হয় না।** এ হচ্ছে সেই সকল লোকের ধারণা যারা খোদাতায়ালার সেই মর্যাদা বা কদর করে না, যেরূপ কদর তাঁর করা উচিত সত্যিকার অর্থে। এবং তারা না খোদার কালাম বা বাণীকে গভীরভাবে অনুধাবন করে, না কানুনে কুদরত বা প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখে। হকীকত বা সত্য এটাই যে, দোয়ার উপরে অবশ্যই ফয়েয নাযিল হয় – কল্যাণ অবতীর্ণ হয়, যা কিনা আমাদেরকে নাজাত বা পরিত্রাণ দান করে। এরই নাম – ফয়েযে রহীমিয়্যত বা রহীমিয়্যত-এর কল্যাণ। এরই ফলে মানুষ উন্নতি করতে থাকে। এই ফয়েয-এর দ্বারাই মানুষ বেলায়েত'-এর স্তরে উন্নীত হয়। এবং খোদাতায়ালার প্রতি এমন ইয়াকীন বা দৃঢ় বিশ্বাস আনতে সক্ষম হয় যে, যেন সে চক্ষু দ্বারা তাঁকে দেখে।

'শাফায়াত'–এর বিষয়টিও রহীমিয়্যত গুণের উপরে নির্ভরশীল খোদাতায়ালার রহীমিয়্যত-ই এই চাহিদা রাখে যে, ভাল লোক খারাপ লোকের জন্য সুপারিশ করুক।

খোদাতায়ালার চতুর্থ এহ্সান বা কৃপা ও কল্যাণময়তা – যা চতুর্থ প্রকারের সৌন্দর্য – যাকে অতি বিশেষ কৃপারূপে আখ্যায়িত করা যায় – তা হচ্ছে মালিকিয়্যত ইয়াওমেদ্দীন' যার বর্ণনা করা হয়েছে সূরা ফাতেহার মধ্যে **'মালেকে ইয়াওমেদ্দীন'** কথাটির দ্বারা। এর মধ্যে এবং রহীমিয়্যত - গুণের মধ্যে পার্থক্য এটাই যে, রহীমিয়্যত-এর ক্ষেত্রে দোয়া এবং এবাদতের মাধ্যমে সাফল্যের অধিকার কায়েম হয়, এবং মালেকিয়্যত-এর মাধ্যমে তার পুরস্কার দান করা হয়। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে এ রকম। ধরুন, কোন ব্যক্তি সরকারী নিয়ম অনুযায়ী পরিশ্রম করে একটা পরীক্ষা দিলো এবং সে পাশ করলো। এখানে রহীমিয়্যত-এর কল্যাণে সাফল্যের অধিকার লাভ করাটা হচ্ছে তাঁর পাশ হওয়া। অতঃপর যে পুরস্কার বা যে পদমর্যাদা লাভ করার জন্য সে পরীক্ষায় পাশ করেছিল, তা প্রাপ্ত হওয়াটা যে কৃপার উপরে নির্ভরশীল, তা হচ্ছে মালেকিয়্যত-এর কৃপা। এই উভয় গুণ অর্থাৎ রহীমিয়্যত ও মালেকিয়্যত-এর মধ্যে এই ইঙ্গিত নিহিত যে,

রহীমিয়্যত-এর কল্যাণ খোদাতায়ালার রহম থেকে লাভ বা এবং মালেকিয়্যত ইয়াওমেদ্দীন-এর কল্যাণ খোদাতায়ালার কৃপা থেকে লাভ হয়। মালেকিয়্যত ইয়ামেদ্দীন যদিও ব্যাপক ও পূর্ণরূপে প্রকাশিত হবে পরলোকে, তবু ইহলোকেও, ইহজগতের পরিধি অনুযায়ী, এই চার গুণেরই প্রকাশ ঘটে চলেছে।'

– (আইয়ামুস সুলেহ্ পৃঃ ১৭-২১)

(২২)

খোদাতায়ালা দুনিয়াতে তিন প্রকারের কাজ করে থাকেন :

(১) খোদায়ীর রূপে, (২) বন্ধুত্বের রূপে এবং (৩) শত্রুতার রূপে। যে কাজ সমগ্র সৃষ্টির জন্য সম্পাদিত হয়, তা খোদায়ী থেকেই সম্পাদিত হয়। এবং যে কাজ তাঁর আশেক ও তাঁর প্রিয়জনদের জন্য সম্পাদিত হয় তা শুধু খোদায়ী থেকেই নয়, বরং তা তাঁর বন্ধুত্বের কারণেও সম্পাদিত হয়, এবং দুনিয়া ঠিকই বুঝতে পারে যে, খোদা এই ব্যক্তির উপরে বন্ধুরূপে রহমত করছেন। এবং যে কাজ শত্রুতার আকারে করা হয়, তার মধ্যে এক কঠিন শাস্তি থাকে। এবং এথেকে এমন নিদর্শনই প্রকাশ পায় যার মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, খোদাতায়ালা এই জাতি বা এই ব্যক্তির সঙ্গে দুষমনী করছেন। আবার কখনও কখনও খোদা তাঁর বন্ধুর সঙ্গে এমন সম্পর্ক স্থাপন করেন যে, তার ফলে সারা জগৎ তার দুষমন হয়ে যায়। এবং কিছুদিনের জন্য তাদের জিহ্বাকে এবং তাদের হস্তকে তার উপরে প্রাধান্য বিস্তার করতে দেন। এটা অতি-আত্মাভিমানী খোদা এজন্য করেন না যে, তিনি তাঁর বন্ধুকে ধ্বংস করে দিতে চান অথবা অপমানিত ও লাঞ্ছিত করতে চান। বরং তিনি তা এজন্যই করেন যে, এর মাধ্যমে দুনিয়াকে তিনি নিদর্শন দেখাতে চান, যাতে করে ঘোর শত্রুরাও বুঝতে পারে যে, তারা চূড়ান্ত শত্রুতা করেও কিছুই করতে পারেনি।'-(নযূলুল মসীহ, পৃঃ ১৩৯, ১৪০)।

(২৩)

'কোরআন শরীফে আল্লাহ্তায়ালার কোন নাম 'মাফ্‌উল' (অর্থাৎ কর্মবাচক) শব্দে নেই। যেমন, কুদ্দুস (পবিত্র) বলা হয়েছে, কিন্তু মা'সুম (রক্ষাপ্রাপ্ত) বলা হয়নি। কেননা, তাহলে রক্ষা কর্তা আর কাউকে থাকতে হবে।' – (মালফুযাত খ-৪, পৃ. ১১৯)

(২৪)

'আমাদের খোদা সব কিছুর উপরেই শক্তিমান। মিথ্যাবাদী ঐ সমস্ত লোক যারা বলে যে, না তিনি সৃষ্টি করেছেন আত্মা, না দেহের অণু-পরমাণু। ওরা খোদা সম্পর্কে কিছুই জানে না। আমরা প্রত্যহ তাঁর নব নব সৃষ্টি দেখতে পাই। এবং তিনি উন্নতির নব নব আত্মা আমাদের মধ্যে ফুৎকার করে দিচ্ছেন। তিনি যদি নাস্তি থেকে অস্তি করতে না পারতেন, তাহলে তো আমরা জীবিতই মরে থাকতাম। বিস্ময়কর সেই খোদা যিনি আমাদের খোদা ! কে আছে এমন, যে

তাঁরই মত ? এবং বিস্ময়কর তাঁর কাজ। কে আছে এমন, যার কাজ তাঁর কাজেরই মত ? তিনি সমস্ত কিছুর উপরে সর্বশক্তিমান।' – (নাসীমে দাওয়াত, পৃঃ ৬৯, ৭০)।

(২৫)

'বস্তুতঃ ঐশী গুণাবলীকে অস্বীকার করা এবং খোদাতায়ালাকে সব কিছুর উপরে শক্তিমান মনে না করাটাই হচ্ছে দেবতার পূজা ও জন্মান্তর বা পুনর্জন্মে বিশ্বাসের মূল কারণ। কেননা, খোদাতায়ালাকে যখন তাঁর নিপুণ কাজে কর্মে অপারগ মনে করা হয়, তখনই দেবতার পূজার প্রয়োজন অনুভূত হয়, এবং ধরে নেওয়া হয় যে, পূর্বজন্মের কর্মের ফলেই ভাগ্য পরিবর্তিত ও নির্ধারিত হয়ে থাকে। সুতরাং এই একই ধারণা থেকে এই উভয় খারাপীর পয়দা হয়েছে অর্থাৎ জন্মান্তরবাদ ও দেবতার পূজা' –(শাহনাহ্ হক্ক, পৃ. ৮১)।

(২৬)

"কুদরত ছে আপনি জাত কা দেতা হ্যায় হক্ক্‌ ছবুত,
উস্‌ বে-নেশাঁ কি চেহরা নুমায়ী এহী তো হ্যায়।
যেস বাত কো কহে কে করঙ্গা ইয়ে ম্যাঁয় জরুর,
টল্‌তি নেহী উও বাত, খোদায়ী এহী তো হ্যায়।"

(শক্তির মাধ্যমে আপন সত্তার সে অকাট্য প্রমাণ দেয়
সেই নিরাকারের মুখদর্শন তো এটাই

যে কথা বলে সে–এ আমি করবোই নিশ্চয়–
টলে না সে কথা, খোদায়ী তো এটাই।)

– (দুর্রে সমীন, পৃ. ১০)।

(২৭)

'আমাদের খোদার মধ্যে অগণিত মো'জেযা বা অলৌকিক বিস্ময় বিরাজমান। তবে, দেখতে কেবল সে-ই পায়, যে সাধুতা ও কৃতজ্ঞতা সহ তাঁরই হয়ে যায়। যারা তার কুদরতের উপরে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে না, এবং তার প্রতি সত্য নয়, কৃতজ্ঞ নয়, তাদের প্রতি তিনি তাঁর মো'জেযা প্রদর্শন করেন না। কতই না হতভাগ্য সেই মানুষ, যে আজও পর্যন্ত এটা জানেই না যে, তার একজন খোদা আছেন, যিনি সব কিছুর উপরে শক্তিমান।" – (কিশ্‌তী-এ-নূহ পৃ. ১৯)।

(২৮)

'তাঁর কুদরতসমূহ সীমাহীন। তাঁর বিস্ময়কর কার্যাবলী অন্তহীন। তিনি তাঁর খাস বান্দাগণের জন্য তাঁর কানুনও পরিবর্তন করে থাকেন। তবে, সেই পরিবর্তনও তাঁর কানুনেরই অন্তর্ভুক্ত। যখন কোন ব্যক্তি তাঁর আস্তানায় এক নতুন আত্মা নিয়ে হাজির হয় এবং নিজের মধ্যে এক বিশেষ পরিবর্তন তাঁর সন্তুষ্টির

জন্য সৃষ্টি করে নেয়, তখন খোদাও তার জন্য এমন এক পরিবর্তন সৃষ্টি করে নেন, যেন খোদা সেই বান্দার উপরে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়ে যান। তিনি যেন অন্য এক খোদা হয়ে যান। তিনি যেন আর সেই খোদা থাকেন না, যে খোদাকে সাধারণ লোকেরা জানে। তিনি, সেই সকল লোক যাদের ঈমান দুর্বল, তাদের কাছে দুর্বলের ন্যায় প্রকাশিত হন। কিন্তু যে ব্যক্তি তাঁর সম্মুখে অত্যন্ত শক্তিশালী ঈমান সহকারে উপস্থিত হয়, তিনি তাকে দেখিয়ে দেন যে, তিনিও শক্তিশালী। এমনিভাবে মানবীয় পরিবর্তনের মোকাবেলায় তাঁর গুণাবলীও পরিবর্তিতরূপে কার্যকর হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি তার ঈমানের ক্ষেত্রে শক্তিহীন হয়ে পড়ে, মৃতবৎ হয়ে যায়, খোদাও তার উপর থেকে তাঁর সাহায্য ও সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়ে এমনভাবে নিশ্চুপ হয়ে যান যে, তিনি যেন (নাউযুবিল্লাহ্) মরেই গেছেন। কিন্তু, এই জাতীয় সব পরিবর্তন তিনি তাঁর কানুনের আওতায় তাঁর পবিত্রতা অনুযায়ীই করে থাকেন। যেহেতু কেউই তাঁর কানুনে কোন সীমারেখা টানতে পারে না, সেহেতু তড়িঘড়ি করে কোন যৌক্তিক প্রমাণ ছাড়াই, কোন উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট প্রমাণ ছাড়াই যদি এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করা হয় যে, অমুক বিষয়টি কানুনে কুদরত বা প্রকৃতির নিয়ম-বিরুদ্ধ–তবে তা হবে নিতান্ত আহম্মকী। কেননা, যে বিষয়ের কোনও সীমারেখা এখনও টানা হয়নি, যার সংজ্ঞা এখনও সুনিশ্চিত রূপে জানা যায় নি, কে তার উপরে আনুমানিক সিদ্ধান্ত চাপাতে পারে ? – (চশ্‌মা মা'রেফাত, পৃঃ ৯৬, ৯৭)।

(২৯)

'খোদাকে যদি সর্বশক্তিমান মানা না যায়, তাহলে তো সেই সঙ্গে সকল আশা-ভরসাই নস্যাৎ হয়ে যায়। কেননা, আমাদের দোয়াগুলির কবুল হওয়া তো এই বিষয়ের উপরে নির্ভরশীল যে, খোদাতায়ালা যখন ইচ্ছা করেন, তখন তিনি দেহের অণু-পরমাণুর মধ্যে কিংবা আত্মার মধ্যে সেই শক্তি সৃষ্টি করে দেন যা তার মধ্যে ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমরা এমন রোগীর জন্য দোয়া করে থাকি দৃশ্যতঃ যার মৃত্যুর সব লক্ষণই ফুটে ওঠে। তখন আমাদের প্রার্থনা তো এই হয় যে, হে খোদা ! ওর শরীরের অণু-পরমাণুতে এমন এক শক্তি সৃষ্টি করে দাও যা তাকে মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচাতে পারবে। তখন, আমরা প্রায় ক্ষেত্রে দেখি যে, সেই দোয়া কবুল হয়ে যায়। অনেক সময়, প্রথমে, আমাদের জানানো হয় যে, এই ব্যক্তি মারাই যাবে, এবং ওর জীবনের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। কিন্তু, যখন দোয়া অত্যধিক করা হতে থাকে, এবং তা চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে যায়, এবং কঠিন দোয়া ও উৎকণ্ঠা ও নৈকট্যের দরুণ আমাদের অবস্থাও মৃতের ন্যায় হয়ে যায়, তখন খোদার পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি ওহী হয় (ঐশীবাণী অবতীর্ণ হয়) যে, এই ব্যক্তির মধ্যে পুনরায় জীবনী শক্তি সৃষ্টি করা হয়েছে। তখন, আবারও একবার তার মধ্যে স্বাস্থ্যের লক্ষণ প্রকাশিত হতে থাকে। আবার যেন মৃত জীবিত হয়ে ওঠে।

আমার মনে আছে যে, আমি যখন প্লেগের সময় দোয়া করেছিলাম, হে সর্বশক্তিমান খোদা! আমাদের ভয়ানক এই আপদ থেকে বাঁচাও, এবং আমাদের দেহের মধ্যে এমন এক প্রতিষেধক গুণ পয়দা করো যার ফলে আমরা প্লেগের বিষক্রিয়া থেকে বাঁচতে পারি। তখন খোদাতায়ালা সেই প্রতিষেধক গুণ আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করে দিলেন এবং বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে প্লেগের মৃত্যু থেকে বাঁচাবো। আরও বললেন ঃ তোমার গৃহের চার দেওয়ালের লোক যারা অহংকার করে না, অর্থাৎ যারা খোদার আনুগত্য থেকে বিমুখ নয় এবং পরহেযগার, আমি তাদের সবাইকে বাঁচাবো। এছাড়া, আমি কাদিয়ানকে প্লেগের মারাত্মক প্রভাব এবং মহামারী থেকে সুরক্ষিত রাখবো। অর্থাৎ সেই যে ভীষণ ধ্বংস যা অন্যান্য গ্রামগুলিকে ধ্বংস করে দিয়ে গেছে, সেই ধ্বংসলীলা কাদিয়ানে সংঘটিত হবে না। এবং আমরা সেটাই দেখেছি। এবং খোদাতায়ালার এই সমস্ত কথার সত্যতা প্রত্যক্ষ করেছি। অতএব, আমাদের খোদা তো সেই খোদা যিনি জগতে নব নব শক্তি, নব নব গুণ ও বৈশিষ্ট্য পয়দা করে থাকেন। . . . .

আমরা সেই কামেল খোদার কাছ থেকে খবর পেয়ে মানবীয় প্রচেষ্টার যে টীকা, সেই টীকা গ্রহণ করা থেকে বিরত ছিলাম। টীকা গ্রহণ করেও বহু লোক এই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন। কিন্তু আমরা আজও পর্যন্ত খোদাতাআলার কৃপায় জিন্দা রয়েছি। সুতরাং, ঠিক সেভাবেই খোদাতায়ালা অণু-পরমাণু সৃষ্টি করে থাকেন, যেভাবে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন প্রতিষেধকের অণু-পরমাণু আমাদের দেহের মধ্যে। এবং এভাবেই সেই খোদা আত্মাও সৃষ্টি করেন, যেভাবে আমার মধ্যে তিনি এক পবিত্র আত্মা ফুৎকার করে দিয়েছেন, যার ফলে আমি জীবন্ত হয়ে গেছি। আমরা শুধু এই কথার মুখাপেক্ষী নই যে, তিনি আত্মা সৃষ্টি করে আমাদের দেহকে জীবিত করেন। বরং, স্বয়ং আমাদের আত্মাও অপর এক আত্মার মুখাপেক্ষী যাতে করে এই মোর্দা আত্মা জিন্দা হয়। এই উভয় আত্মাকে খোদা-ই পয়দা করেন। যে ব্যক্তি এই রহস্য বুঝে নাই, সে খোদার কুদরত বা শক্তি সম্বন্ধে বেখবর, এবং খোদা সম্পর্কে গাফেল, অজ্ঞ। (নসীমে দাওয়াত, পৃঃ ২৮, ২৯)

(৩০)

'খোদাতায়ালার যে খোদায়ী এবং খোদায়িত্ব (উলুহিয়্যত) তাঁর সীমাহীন কুদরত বা শক্তি এবং তাঁর অগণিত রহস্যের সঙ্গে সম্পর্কিত, তাকে কানুনের আকারে কোন সীমার মধ্যে আবদ্ধ করা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। খোদাকে চেনার জন্য এ একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, খোদায়ে জুল-জালাল-এর কুদরত ও হেকমতসমূহ অসীম ও অনন্ত। এই বিষয়টির গুঢ়-তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারলে এবং এর উপরে গভীরভাবে চিন্তা করলে সমস্ত আজে-বাজে ও অস্পষ্ট ধারণা দূরীভূত হয়ে যায়, এবং সত্যকে চেনার এবং সত্যের উপাসনা করবার সিধা রাস্তা দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। আমরা এখানে এ কথা অস্বীকার করি না যে, খোদাতায়ালা সর্বদা তাঁর আদি ও চিরন্তন গুণাবলী অনুযায়ী কাজ করে থাকেন। এবং আমরা যদি সেই সমস্ত আদি ও চিরন্তন গুণাবলী অনুসারে চলার নাম, অন্য

কথায়, কানুনে ইলাহী বা ঐশী বিধান রাখি, তাতে কিছু যাবে আসবে না। কিন্তু আমাদের কথা বা বিতর্ক এই নিয়ে যে, সেই আদি ও চিরন্তন গুণাবলীর কার্যকারিতাকে কিংবা বলতে পার যে, সেই আদি কানুনে ইলাহীকে (ঐশী বিধানকে) কেন সীমিত ও সুনির্দিষ্ট বলে মানা হবে ? হ্যাঁ, সন্দেহ নেই, এ কথা আমরা মানি এবং এটা মানাই দরকার যে, যে সকল গুণাবলী আল্লাহ্তায়ার সত্তার মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে, সেই সকল গুণাবলীর অপরিসীম কার্যকারিতা স্ব স্ব সময়ে প্রকাশ পেয়ে থাকে এবং এতে কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। এবং ঐ সমস্ত গুণাবলী পৃথিবীর ও আসমানের প্রত্যেকটি সৃষ্টির মধ্যেই কার্যকর রয়েছে। এবং গুণাবলীর সেই সব কার্যকারিতার নামই হচ্ছে সুন্নতুল্লাহ্ বা কানুনে কুদরত (অর্থাৎ আল্লাহ্র রীতি বা প্রাকৃতিক নিয়ম)। কিন্তু, খোদাতায়ালা যেহেতু, তার পূর্ণ গুণাবলী সহকারেই অসীম ও অনন্ত, সেহেতু, এটা আমাদের নিরেট অজ্ঞতা হবে, যদি আমরা এই দাবী করি যে, তাঁর গুণাবলীর কার্যকারিতা অর্থাৎ সমস্ত কানুনে কুদরত আমাদের আন্দাজ অনুমান কিংবা বুদ্ধি-বিবেচনা কিংবা জানা-শোনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তার অতিরিক্ত নয়। আজকালকার দার্শনিক মেজাযের লোকদের এটা একটা অতি বড় ভুল যে, প্রথমতঃ তারা কানুনে কুদরতের সম্পর্কে এই রকমটা ভেবে বসে আছে যে, সব কিছুই চূড়ান্তরূপে সুনির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। অতঃপর নতুন কোন বিষয় দেখা দিলে তাকে আর তারা কিছুতেই মানতে চায় না। স্পষ্টতঃই, এইরূপ ধ্যান-ধারণার ভিত্তি সুদৃঢ় নয়। আর যদি এটাই সত্য হোত, তাহলে তো কোন নতুন কিছুকে মেনে নেওয়ার কোন পথই খোলা থাকতো না। এবং নতুন কোন কিছুর উদ্ভাবন বা আবিষ্কার করাও সম্ভব হতো না। কেননা, এমনটি হলে প্রত্যেকটি নতুন কাজ প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর লংঘন বলে প্রতীয়মান হবে। ফলে, তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে, এবং এইরূপ প্রত্যাখ্যানের অর্থই হবে নতুন কোন সত্যতাকে অহেতুক প্রত্যাখ্যান করা।

যদি কেউ ইতিহাসের পাতায় দার্শনিকদের জীবন-চরিতের প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করে, তাহলে সে দেখতে পাবে যে, তাদের চিন্তা ধারা কত ভিন্ন ভিন্ন পথে চলেছে, এবং কত ঘোরানো প্যাচানো পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। এবং কত লজ্জাষ্করভাবে ও পরিতাপ সহকারে একটি সিদ্ধান্ত দ্বারা আর একটি সিদ্ধান্তকে নাকচ করে করে এসেছে। এবং কীভাবে তারা বহুদিন যাবৎ একটা বিষয়কে অস্বীকার করার পর এবং সেটাকে প্রাকৃতিক-নিয়ম বহির্ভূত বলে জানার পর, অবশেষে অনুতপ্ত অবস্থায় সেটাকে স্বীকার করে নিয়েছে। তাহলে এই সব পরিবর্তনের কারণ কী ছিল ? কারণ তো এটাই ছিল যে, তারা যা কিছু বুঝেছে বলে মনে করেছিল, তা সবই ছিল অনুমান ভিত্তিক। এবং তা নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছিল। সুতরাং, যে আকারে এবং যে অবস্থায় নব নব অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছিল, সেগুলির আলোকে তাদের সিদ্ধান্তগুলিকে পরিবর্তন

করতে হয়েছিল, উলোট-পালট করতে হয়েছিল। এবং যেদিকে নতুন চিন্তা-চেতনা মোড় পরিবর্তন করে সেদিকেই তাদের ধ্যান-ধারণার হাওয়া ও গতি পরিবর্তন করে। সংক্ষেপে, দার্শনিকের চিন্তা-ভাবনার লাগাম সর্বদাই নতুন উদ্ভাবিত বিষয়ের হাতেই ধরা থাকে। এখনও বহু কিছু তাদের দৃষ্টির আড়ালে রয়ে গেছে, যেগুলি সম্পর্কে আশা করা যায় যে, আগামীতে তারা ঠোক্কর খেয়ে খেয়ে এবং গঞ্জনা সয়ে সয়ে, অবশেষে, এক সময় সেগুলিকে স্বীকার করে নেবে। কেননা, প্রাকৃতিক নিয়মাবলী মানবীয় বুদ্ধির দফ্‌তরে আজও অব্দি এমন প্রতিষ্ঠা পায় নি বা পেতে পারে না যে, তা নিয়ে নতুন করে আর কোন গবেষণার দরকার নেই। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি এই ধারণা করতে পারে যে, মানুষ এই পৃথিবীর পাঠশালায়, তার সীমাবদ্ধ স্বল্পায়ূর জীবনে আদি ও চিরন্তন সব রহস্যাবলী সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান আহরণ করা শেষ করেছে ? এবং বিস্ময়কর সব ঐশী রহস্যাবলী সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা এত বেশী সম্প্রসারিত হতে পেরেছে, যার বাইরে যদি কোন কিছু থেকে থাকে, তবে তা থাকতে হবে খোদাতায়ালার শক্তি বা কুদরতেরও বাইরে ? আমি জানি যে, এই ধরনের চিন্তা-ভাবনা কোন নির্লজ্জ ও নির্বোধ লোক ছাড়া কোনও সুস্থ-বুদ্ধির মানুষে করতে পারে না। দার্শনিকদের মধ্য থেকে যে সকল প্রকৃত সৎ-বুদ্ধি এবং সত্য-আধ্যাত্মিকতাসম্পন্ন মানুষ অতীত হয়ে গেছেন তাঁরা সবাই নিজেরা স্বীকার করেছেন যে, তাঁদের চিন্তা-ভাবনা যা কিনা সীমাবদ্ধ ও কুণ্ঠিত – তা খোদা এবং তাঁর অনন্ত রহস্যাবলী ও অসীম প্রজ্ঞাসমূহের পরিচয় লাভে সমর্থ নয়।

এ অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত সত্যতা যে, প্রতিটি বস্তুই তার মধ্যে এমন এক বৈশিষ্ট্য রাখে যার মাধ্যমে সে খোদাতায়ালার সীমাহীন শক্তিসমূহ থেকে প্রভাব গ্রহণ করে থাকে। সুতরাং, এথেকে প্রমাণিত হয় যে, বস্তুর বৈশিষ্ট্যাবলীও শেষ হবার নয়, তা সেগুলো সম্পর্কে আমরা জানতে পারি, আর না-ই পারি। যদি একটি শস্য-কণার সব গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে জানবার জন্য প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত দার্শনিক কেয়ামত পর্যন্ত তাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে কাজে লাগায়, তথাপি কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনই বিশ্বাস করতে পারবে না যে, তারা তাদের সাধনায় পূর্ণ সফলতা লাভ করবে। সুতরাং, এই যে ধারণা যে, পৃথিবীর ও আকাশের বস্তুসমূহের বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী সম্পর্কে জ্যোতির্বিজ্ঞান বা পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি দ্বারা যতটা জানা সম্ভবপর হয়েছে ততটাই সব, – এর চাইতে নির্বুদ্ধিতার কথা আর কিছু নেই।

এই সমস্ত বিতর্কের সারকথা হচ্ছে, প্রাকৃতিক নিয়ম অর্থাৎ কানুনে কুদরত এমন কোন জিনিষ নয়, যা কোন প্রতিষ্ঠিত সত্যের প্রতিবন্ধক হতে পারে। কেননা, কানুনে কুদরত খোদাতায়ালার সেই সকল কাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা প্রাকৃতিক নিয়মে প্রকাশিত হয়েছে বা ভবিষ্যতে হবে। কিন্তু, খোদাতায়ালা যেহেতু তাঁর ক্ষমতাবলীর প্রদর্শনে পরিশ্রান্ত হয়ে যান নি ; এবং এমনও নয় যে,

তিনি তাঁর কুদরত বা ক্ষমতা প্রকাশে অপারগ হয়ে গেছেন, কিংবা ঘুমিয়ে পড়েছেন, কিংবা এক কোনায় সরে গিয়েছেন, কিংবা কোন বহিঃশক্তির দ্বারা পরাভূত বা মজবুর হয়ে গেছেন এবং সেই মজবুরির কারণে ভবিষ্যতে আর কোন বিস্ময় প্রদর্শন করা থেকে বিরত হয়ে গেছেন ; আর আমাদের জন্য শুধু কয়েক শতকের (অথবা মনে করতে পার যে, আরও কিছু বেশী দিনের) কাজকর্মই রেখে গেছেন। তাই, সমস্ত যুক্তি-বুদ্ধি, জ্ঞান-প্রজ্ঞা, দর্শন, সাহিত্য এবং শিক্ষা-দীক্ষা এর মধ্যেই নিহিত যে, আমরা যেন মাত্র কিছুসংখ্যক প্রদর্শিত কুদরত বা শক্তি – যেগুলির পুংখাণুপুংখ জানতে হলে এখনও শত শত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে হবে – সেগুলির মধ্যেই সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মাবলীকে সীমাবদ্ধ মনে না করি এবং এ নিয়ে মূর্খ লোকদের ন্যায় জিদ্ না করি যে, আমরা যা কিছু পর্যবেক্ষণ করেছি, খোদাতায়ালার কাজ তার বাইরে যেতে পারে না।

আমি চিন্তা করি যে, কীভাবে সেই সব জিনিষ সম্পূর্ণভাবে এবং সঠিকভাবে সত্য কে পরিমাপ করবার মাপকাঠি, কিংবা সত্য-কে ওজন করবার তুলাদন্ড হতে পারে, যেগুলির নিজেদের প্রকৃত স্বরূপ জানাটাই এখনও সুদূর পরাহত। এই জটিল থেকে জটিলতর সমস্যাটি দার্শনিকদেরকে বিভ্রান্ত করে ফেলেছে যে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ যেমন, সোফিস্টরা (Sophists) সরাসরি সাকল্যে বস্তুর গুণাগুণকে অস্বীকার করে বসেছেন ; আবার কেউ কেউ সেই গুণাবলী স্বীকার করলেও দাবী করেন যে, এগুলির স্থায়িত্বের কোন প্রমাণ আমরা পাই না। পানি আগুনকে নিভিয়ে ফেলে। কিন্তু, এমনও তো হতে পারে যে, পৃথিবীর অথবা আসমানের কোন প্রভাবের ফলে কোনও প্রস্রবণের পানি এই বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলতে পারে। আগুন কাঠ পুড়িয়ে ফেলে। কিন্তু, এ-ও তো সম্ভব হতে পারে যে, আগুন বাহ্যিক অথবা আভ্যন্তরীণ কোন প্রভাবের দরুণ, তার সেই বৈশিষ্ট্যকে প্রদর্শন না-ও করতে পারে। কেননা, এই জাতীয় বিষয় বহু সময় ঘটে থাকে। দার্শনিক একথাও বলে থাকেন যে, কোন কোন পার্থিব বা আসমানী বৈশিষ্ট্য বা ক্রিয়া হাজারো বরং লাখো বৎসর পরে প্রকাশিত হয়ে থাকে, যেগুলি অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ লোকদের কাছে অতি-প্রাকৃতিক বা অলৌকিক বলে প্রতীয়মান হয়। আবার, কখনও কখনও কোন কোন যামানায় এমনটি ঘটেও থাকে এবং বহু বিস্ময়কর ব্যাপার আসমানে কিংবা যমীনে প্রকাশও পেয়ে থাকে, যা বড় বড় দার্শনিকদেরকেও হতভম্ব করে ফেলে। তখন দার্শনিকরা সেগুলির অকাট্য প্রমাণ দেখে এবং সেগুলিকে প্রত্যক্ষ করে, কিছুটা কষ্ট করে হলেও জ্যোতির্বিজ্ঞান ও পদার্থ বিজ্ঞানের কিছু কিছু নিয়ম আবিষ্কার করে, যাতে করে তাদের প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে কোন পার্থক্য সৃষ্টি না হয়। এভাবেই তাঁরা এধার ওধার করে এবং নতুন নতুন কথাকে ইল্‌মী কায়দায় চালিয়ে দিয়ে রেহাই পেতে চান। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন উড়ন্ত মাছ দেখা যায়নি, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন দার্শনিকই তা বিশ্বাস করেননি। এবং যতদিন লেজ কেটে ফেলার প্রক্রিয়া চালানোর মাধ্যমে লেজ-

কাটা কুকুরের পয়দা হওয়া শুরু হয়নি, ততদিন কোন দার্শনিকই এই বিষয়টার সম্ভাবনা স্বীকার করেন নি। যতদিন পর্যন্ত এটা আবিষ্কার হয়নি যে, ভয়াবহ ভূমিকম্পের দরুন মাটি থেকে আগুন বের হয়ে পাথরকে পর্যন্ত গলিয়ে ফেলেছে অথচ তা কাঠকে পোড়ায়নি, ততদিন পর্যন্ত দার্শনিকরা বিষয়টাকে প্রাকৃতিক নিয়ম বিরুদ্ধই বলেছেন। যতদিন পর্যন্ত এ্যাসপিরেটর আবিষ্কৃত হয় নি, ততদিন কি দার্শনিকরা জানতেন যে, একজনের রক্ত আর এক জনের দেহে সঞ্চালন (ব্লাড ট্রান্সফিউশন) করাটাও প্রাকৃতিক নিয়ম সম্ভূত ? কেউ কি এমন কোন দার্শনিকের নাম করতে পারবেন, যিনি বিদ্যুৎ আবিষ্কারের পূর্বেই বলেছিলেন যে, বিদ্যুতের সাহায্যে মেশিন চালানো সম্ভব ?

আল্লামা শারাহ কানুন ছিলেন একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক এবং বড় দার্শনিক। তিনি তাঁর কিতাবে লিখে গেছেন যে, গ্রীকদের মধ্যে এই কথাটা বহুল প্রচারিত ছিল যে, কিছু সংখ্যক স্ত্রীলোক, যাঁরা সে সময়ে সতী-সাধ্বী এবং ধর্মপরায়ণ বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাঁরা পুরুষের সঙ্গে যৌন মিলন ছাড়াই গর্ভবতী হয়েছিলেন এবং সন্তান প্রসব করেছিলেন। উক্ত আল্লামা এ ব্যাপারে তাঁর অভিমত দিয়েছেন এই বলে যে, এই সমস্ত ঘটনাকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে প্রত্যাখ্যান করা ঠিক নয়। কেননা, এগুলি সত্য ঘটনার ভিত্তি ছাড়া বিভিন্ন ব্যক্তি বা জাতির মধ্যে কোনভাবেই প্রচারিত হতে পারে না।

. . . .

এই সব ঘটনার ব্যাপারে কোন অস্বীকারকারীর অভিমত যা-ই হোক না কেন, শুধু মাত্র বিরল ঘটনা হওয়ার কারণেই এ গুলিকে সাকল্যে প্রত্যাখ্যান করা যায় না। এবং এগুলির প্রত্যাখ্যানের পক্ষে কোন দার্শনিক প্রমাণও খাড়া করা যায় না। . .

ঐ প্রখ্যাত আল্লামা এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত সারগর্ভ আলোচনাও করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, যদিও সকল মানুষ একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত এবং এ কারণেই সকলে একই রকম ; তবু, এদের মধ্য থেকে কেউ কেউ, এককভাবে, কখনো কখনো কোন কোন যামানায় বিশেষ বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হয়, কিংবা এমন কোন উচ্চ স্তরের শক্তিসম্পন্ন হয়, যা সাধারণভাবে আমাদের মধ্যে থাকে না। এটা একটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, বর্তমান যুগে কেউ কেউ তিন শ বছরের বেশী সময় বেঁচেছে, যা কিনা একটা অতি অসাধারণ ব্যাপার। কেউ কেউ আবার এত বেশী প্রবল স্মরণ শক্তি বা এত বেশী প্রখর দৃষ্টি-শক্তির অধিকারী যে, তার তুলনা মেলা ভার। এবং এই সব ব্যক্তি অত্যন্ত বিরল, শত শত বছরের বা হাজার বছরে এরূপ কোন ব্যক্তির সন্ধান মিলে। কিন্তু, যেহেতু সাধারণ মানুষের দৃষ্টি শুধু ব্যাপকরূপে এবং পুনঃ পুনঃ সংঘটিত বিষয়ের উপরেই নিবদ্ধ থাকে, এবং এটাকেই তারা প্রাকৃতিক নিয়ম বলে মনে করে, সেহেতু তারা ঐ বিরল ঘটনাগুলোকে সন্দেহের চোখে দেখে, কিংবা মিথ্যা বলে মনে করে। এই

কারণেই শুধু সাধারণ কেন, বরং বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের মনেও ঐ সব বিরল ঘটনা সম্পর্কে সন্দেহ ও সংশয়ের সৃষ্টি হয়। অতএব, এখেকে দার্শনিকরা যে ভুলটা করে বসেন এবং যে বড় ধোঁকাটা তাদেরকে আগে কদম বাড়াতে বাধা দেয়, তা হচ্ছে, তারা সাধারণ ঘটনাবলী নিয়েও যেমন মাথা ঘামায় না, তেমনি বিরল কোন ঘটনা নিয়েও গবেষণা চালায় না। এবং এই শ্রেণীর ঘটনাগুলিকে উদ্ভট কেচ্ছা-কাহিনী বলেই ছেড়ে দেয়। অথচ, আদিকাল থেকেই আল্লাহ্‌তায়ালার একটা রীতি হচ্ছে, সাধারণ ঘটনাবলীর পাশাপাশি কখনো কখনো তিনি বিরল ও অসাধারণ বিস্ময়কর ঘটনাও সংঘটিত করে থাকেন। এর এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, তা লিখে শেষ করবার মত নয়। দার্শনিক বোকরাত (হিপোক্রাটিস) তাঁর একটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের গ্রন্থে এমন কিছু রোগীর অবস্থা বর্ণনা করেছেন, যাদের ব্যাধি ঔষধ-বিজ্ঞানের মতে এবং চিকিৎসকদের অভিজ্ঞতায় কোন ক্রমেই নিরাময়যোগ্য ছিল না। কিন্তু, ঐ সকল রোগী আশ্চর্যজনকভাবে রোগমুক্ত হয়েছিল, যাদের সম্পর্কে তাঁর ধারণা জন্মেছিল যে, এদের রোগমুক্তি ঘটেছিল বিরল কোন পার্থিব অথবা স্বর্গীয় প্রভাবের ফলে। এক্ষেত্রে, আমি আরও একটুখানি বলতে চাই যে, বিষয়টা কেবল মানব প্রজাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং, যদি গভীরভাবে লক্ষ্য করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে, অন্য সব প্রজাতির মধ্যেও সাধারণ ঘটনাবলীর পাশাপাশি অনুরূপ বিরল ঘটনাও ঘটে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, উদ্ভিদের মধ্যে মনসা গাছ অত্যন্ত তিক্ত এবং বিষাক্ত, কিন্তু, কখনো কখনো কয়েক বৎসর পরে এগুলোর মধ্যেই এক প্রকার উদ্ভিদ জন্মে যা অত্যন্ত মিষ্ট ও সুস্বাদু হয়। যে ব্যক্তি এই সুমিষ্ট উদ্ভিদ কখনো দেখেনি, এবং সব সময় শুধু তিক্তস্বাদযুক্ত মনসা গাছই দেখেছে, সে নিঃসন্দেহে এই উদ্ভিদকে প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম বলে মনে করবে। অনুরূপভাবে, অন্যান্য প্রজাতির মধ্যেও বহুকাল পর পর কোন না কোন বিরল ঘটনা ঘটে থাকে। কিছুদিন পূর্বে মুজাফ্‌ফরাগড়ে এরূপ একটা বক্‌রা (পাঁঠা) পয়দা হয়েছিল, যা বক্‌রীর মতই দুধ দিত। ব্যাপারটা নিয়ে শহরে নানা আলোচনা শুরু হলে, মুজাফ্‌ফরাগড়ের ডিপুটি কমিশনার মিঃ ম্যাকোলিফ্ ঘটনাটিকে প্রাকৃতিক নিয়ম বহির্ভূত মনে করলেন এবং পাঁঠাটিকে আনতে লোক পাঠালেন এবং পাঁঠাটিকে তাঁর সামনেই দোহন করা হলো এবং দেড় সের পরিমাণ দুধ পাওয়া গেল ... ...

তিনজন সৎ, বিশ্বস্ত ও সম্মানী ব্যক্তি আমার কাছে বলেছেন যে, আমরা স্বচক্ষে কয়েকজন পুরুষ মানুষকে স্ত্রীলোকের ন্যায় দুধ (স্তন) পান করাতে দেখেছি। ... ...

অনেকে লক্ষ্য করেছেন যে, রেশমের স্ত্রী-পোকা কখনো কখনো পুরুষ-পোকার মিলন ছাড়াই ডিম দিয়ে থাকে। এবং সেগুলো থেকে বাচ্চা বা কীটও বেরিয়ে আসে। অনেকে এ-ও দেখেছেন যে, শুষ্ক কাদা থেকে ইঁদুর পয়দা হয়েছে,

যার অর্ধেক দেহ ইদুর তো হয়ে গেছে কিন্তু বাকী অর্ধেক দেহ কাদাই থেকে গেছে। হাকিম ফাযেল কারশী (কিংবা হতে পারেন আল্লামা) এক স্থানে লিখে গেছেন যে, তিনি একজন রোগীকে দেখেছেন, যার কানে আঘাত লাগার দরুণ সে কালা হয়ে গিয়েছিল। পরে তার কানের নীচে একটা ছোট টিউমার বেরোয় যার মধ্যে একটা ছিদ্রের সৃষ্টি হয়। এবং এই ছিদ্রটি দ্বারাই পরে সে শুনতে পেত, যেন খোদাতায়ালা তার জন্য আর একটা কান সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন।

জালিনুস (Galen)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল ঃ মানুষ কি তার চোখ দিয়ে শুনতে পেতো ? জবাবে তিনি বলেছিলেন যে, বর্তমান অভিজ্ঞতা এটা সমর্থন করে না। কিন্তু, এটা সম্ভব যে, কান এবং চোখের মধ্যে অনুরূপ কোন গুপ্ত সম্পর্কও রয়েছে, যা কোন শল্য চিকিৎসার দ্বারা কিংবা কোন স্বর্গীয় কারণে প্রকাশ পেতে পারে এবং এই বৈশিষ্ট্য ক্রিয়াশীল হতে পারে। কেননা, দেহের বৈশিষ্ট্যসমূহ বা গুণাগুণ সম্পর্কে এখনও সমস্ত কিছু জানা সম্ভব হয় নি।

... ...

ডঃ বর্নিয়ার তাঁর কাশীর ভ্রমণকাহিনীতে পীর পাঞ্জাল চড়াই-এর বর্ণনা দেওয়ার পর একটা আশ্চর্যজনক ঘটনার উল্লেখ করেছেন। যা তাঁর এই (অনূদিত) গ্রন্থের ৮০ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ রয়েছে এভাবে ঃ পাথর খন্ডগুলোকে এদিক সেদিক সরাতে গিয়ে একটা বিরাট কালো বিচ্ছু বেরিয়ে পড়লো। যেটাকে একজন মুঘল নওজোয়ান, যার সঙ্গে আমার জানা-শোনা ছিল, সে তার নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে প্রথমে আমার চাকরের হাতে দিল এবং পরে আমার (ডঃ বর্ণিয়ার) হাতেও দিল। কিন্তু, বিচ্ছুটা আমাদের কাউকেই কামড়ালো না। ঐ নওজোয়ান মুঘল বলেছিল যে, এর কারণ হচ্ছে, আমি এটার উপরে কোরআন শরীফের একটি আয়াত পড়ে ফুঁ দিয়েছি ; এবং এভাবেই আমি অনেক বিচ্ছু ধরেছি। 'ফতুহাত ও ফুসুস' – এর গ্রন্থকার ছিলেন একজন বিখ্যাত আলেম এবং একজন মস্ত বড় দার্শনিক ও সুফী ব্যক্তি। তিনি তাঁর কেতাব 'ফতুহাত' – এর মধ্যে লিখেছেন যে, একবার আমার বাড়ীতে একজন দার্শনিকের সঙ্গে এক ব্যক্তির তর্ক হচ্ছিল আগুনের দহন ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য নিয়ে। তখন, অপর ব্যক্তিটি একটা আশ্চর্য ঘটনা দেখালো। সে দার্শনিকের হাত তার নিজের হাতে ধরে জলন্ত আগুনের মধ্যে চেপে ধরলো (সামনেই একটা চুল্লী জ্বলছিল)। সে বেশ কিছুক্ষণ তার হাত এবং দার্শনিকের হাত আগুনের মধ্যেই ধরে থাকলো। কিন্তু, তাদের দুজনের কারো হাতেই আগুনের কোনও প্রভাব পড়লো না। আমি নিজেও এক দরবেশকে দেখেছিলাম, যিনি দারুণ গ্রীষ্মের দিনেও কোরআন শরীফের এই আয়াত ঃ **'ওয়া এযা বাতাশতুম বাতাশতুম জাব্বারীন'** ('এবং যখন তোমরা কাউকে পাকড়াও কর, তখন নিষ্ঠুরদের ন্যায় পাকড়াও কর' – ২৬ঃ১৩১) – পাঠ করতেন এবং বোলতা ধরতেন, এবং বোলতা তাঁকে হুল ফুটাতে পারতো না। খোদ এই লেখকেরও কোরআনী আয়াতের বহু বিস্ময়কর প্রভাবের অভিজ্ঞতা

রয়েছে ; যেগুলির মাধ্যমে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর বহু অসাধারণ বিস্ময় বা মো'জেযা প্রকাশিত হয়েছে এবং হয়ে থাকে। মোদ্দা কথা, বিশ্বজগতের এই যাদুঘর অসংখ্য অসংখ্য বিস্ময় দ্বারা ভরপুর। যে সকল জ্ঞানী-গুণী ও মহান দার্শনিক অতীত হয়ে গেছেন তাঁরা কখনই তাঁদের সীমিত জ্ঞানের বড়াই করেন নি, এবং তাঁরা এই বিষয়টাকে অত্যন্ত নির্লজ্জতা ও অপরাধ মনে করতেন যে, তাঁদের সীমিত অভিজ্ঞতাই হচ্ছে খোদাতালার প্রাকৃতিক নিয়ম বা কানুনে কুদরত

. . .   .

এই রহস্যে ভরা আসমান – যা কিনা অগণিত গ্রহ আর নক্ষত্রের প্রদীপসমূহ দ্বারা সুসজ্জিত ; এবং এই যে মালীদের ঈর্ষার বাগান এই গুলজার পৃথিবী যা নানা রং এর ও নানা প্রকারের সৃষ্টি দ্বারা আবাদ হয়ে চলেছে, তা সবই সামান্যতম প্রচেষ্টা ছাড়াই যিনি স্রেফ নিজের ইচ্ছাতেই সৃষ্টি করেছেন, তাঁর সেই কুদরতের বা শক্তির কি কোন সীমা-পরিসীমা কারো পক্ষে পাওয়া সম্ভব ?' – (সুরমা চশ্‌মা আরিয়া, পৃ. ৪২–৫৫)।

(৩১)

'রবুবিয়্যত' -এর এ একটা রহস্য যে, 'কলেমাতুল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র কথা' দ্বারাই মখলুকাত পয়দা হয়ে যায় অর্থাৎ সৃষ্টি অস্তিত্ব লাভ করে থাকে। বিষয়টাকে প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ নিজ বুঝ মত মনে করতে পারে। কেউ হয়তো মনে করতে পারে যে, মখলুকাত বা সৃষ্টি হচ্ছে আল্লাহ্‌র কালামের (কথার) প্রতিবিম্ব ও কার্যকারিতা। কিংবা কেউবা এমনও বুঝতে পারে যে, এ হচ্ছে স্বয়ং কলেমাতে ইলাহী অর্থাৎ খোদার কালাম, যা কিনা খোদার কুদরতেই সৃষ্টি বা মখলুকাতের আকার প্রাপ্ত হয়। কালামে ইলাহীর কথাগুলি এই উভয় তাৎপর্যই বহন করে। কোরআন করীমের কোন কোন জায়গায় প্রকাশ্য কথায় সৃষ্টির নাম রাখা হয়েছে কলেমাতুল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র কথা, যা রবুবিয়্যত -এর তাজাল্লিয়াত বা প্রকাশের মাধ্যমে ঐশী শক্তি বা কুদরতে ইলাহীর দ্বারা নব নব গুণ ও বৈশিষ্ট্য লাভ করে সম্পূর্ণ সৃষ্টিরূপে রূপান্তরিত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে সৃষ্টির রহস্যাবলীর মধ্যে এ এমন এক রহস্য, যা যুক্তিবুদ্ধির সাহায্যে অত সহজে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। এবং সাধারণ মানুষের জন্য বুঝবার সহজ রাস্তা এটাই যে, খোদাতায়ালা যা কিছু সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন তা হয়ে গেছে এবং সমস্ত কিছুই তিনিই সৃষ্টি করেছেন এবং সব কিছুই তাঁরই সৃষ্টি এবং তাঁরই কুদরতের হাত থেকে উদ্ভাবিত হয়েছে। কিন্তু, আরেফ বা সূক্ষ্ম তত্ত্বদর্শীদের কাছে মুজাহেদাত বা সাধনা আরাধনার পর কাশ্‌ফীভাবে বা দিব্যদৃষ্টিতে এই সৃজন রহস্য উন্মোচিত হয়ে থাকে। এবং দিব্যদৃষ্টির অবস্থায় এই উপলব্ধিও জন্মে যে, এই যাবতীয় আত্মা ও দেহ কলেমাতুল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র কথা ছাড়া অন্য কিছু নয়, যা কামেল ইলাহী হেকমতে বা বিশুদ্ধ ও পূর্ণ ঐশী-প্রজ্ঞায় সৃষ্ট-পদার্থরূপে পোষাকপ্রাপ্ত

হয়েছে। কিন্তু আসল যে নীতি, যার অনুসরণ করতে হবে এবং যার উপরে কায়েম থাকতে হবে, এবং যা কিনা কাশ্‌ফ ও যুক্তি উভয়েরই একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য বা কমন ফ্যাক্টর, তা হচ্ছে, খোদাতায়ালা সমস্ত কিছুরই সৃষ্টিকর্তা এবং উদ্ভাবনকর্তা, এবং কোনকিছুই, তা সে আত্মাই হোক, আর দেহ-ই হোক তাঁকে ব্যতীত প্রকাশিত হয় নি, এবং হতে পারে না।

কেননা, এক্ষেত্রে, কালামে ইলাহীর এবারত-অর্থাৎ ঐশীকালামের জন্য যে চয়নিত শব্দাবলী, সেগুলির তাৎপর্য বাস্তবিক পক্ষে বহুমুখী। এবং কোরআন শরীফ যে বিষয়ে অত্যন্ত নিশ্চিতরূপে এবং দৃঢ়রূপে হেদায়াত দান করে তা হচ্ছে, প্রত্যেকটি জিনিষই খোদাতায়ালা থেকে প্রকাশিত হয়েছে এবং অস্তিত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। এবং তিনি ছাড়া কোন কিছুই সৃষ্টি হয়নি। কোন কিছুই আপনা আপনি হয়নি। এতটুকু বিশ্বাস বা জ্ঞানই প্রাথমিক অবস্থার জন্য যথেষ্ট। অতঃপর, মা'রেফত বা গভীরতর উপলব্ধির প্রান্তরসমূহে সফর করা যাদের ভাগ্যে জুটবে, তাদের জন্যে, সাধ্য-সাধনার পরে, সেই রহস্য উন্মোচিত হবে যে সম্পর্কে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন ঃ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

['এবং যারা আমাদের (সাক্ষাতের) উদ্দেশ্যে চেষ্টা-সাধনা করে, নিশ্চয় আমরা তাদেরকে আমাদের (নিকটে আসার) পথসমূহ প্রদর্শন করবো।' – ২৯ঃ৭০)। (সুরমা চশম আরিয়া, পৃ. ১২৫-১২৭ পাদটীকা)

(৩২)

'এক্ষেত্রে, এই বিষয়টাও বর্ণনা করা প্রয়োজন যে, খোদাতায়ালা যিনি সকল কারণের আদি কারণ এবং যাঁর সত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত অন্য সমস্ত কিছুর সত্তাসমূহ – তিনি যখন মুরব্বীয়ানা কিংবা কাহেরানা প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ অভিভাবকরূপে কিংবা পরম কর্তারূপে উদ্দিষ্ট কোন কিছু সৃষ্টি করবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন, এবং সেই উদ্যোগ যখন উত্তমরূপে ও পূর্ণরূপে হয়, তখন তা সমগ্র সৃজন বিন্যাসেই পরিব্যাপ্ত হয়। কিন্তু যদি এই উদ্যোগ কোন বিশেষ কিছুর প্রেক্ষিতে গৃহীত হয় অর্থাৎ যদি আংশিক হয়, তাহলে তা সমগ্র সৃষ্টির কোন কোন উদ্দিষ্ট অংশের জন্য হয়। আসল হকীকত অর্থাৎ সত্যতা হচ্ছে, সম্মান ও গৌরবের অধিপতি খোদার সঙ্গে তাঁর সমগ্র সৃষ্টির, তাঁর সৃষ্ট-জগতসমূহের যে সম্পর্ক, তা সেই সম্পর্কের অনুরূপ, যেমন দেহের সঙ্গে প্রাণের। এবং যেমন শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আত্মার ইচ্ছা-এরাদার অনুগত থাকে, এবং আত্মা যেদিকে ঝুঁকে সেগুলিও সেইদিকে ঝুঁকে ঠিক তেমন সম্পর্কই লক্ষ্য করা যায় খোদাতায়ালার সঙ্গে সৃষ্টির। যদিও ফুসুস'-এর লেখকের ন্যায় **'ওয়াজেবুল ওজুদ'** (The Necessary Being) বা অপরিহার্য সত্তা সম্পর্কে আমি একথা বলি না যে, **'খালাকাল আশ্‌ইয়াউ ওয়া হুয়া আইনুহা'** – 'তিনি সৃষ্টি করেছেন সমস্ত কিছু এবং তিনিই সেই সমস্ত কিছু'। তবু, আমি একথা অবশ্যই বলি যে, 'খালাকাল

আশ্‌ইয়াউ ওয়া হুয়া কা আইনুহা' – 'তিনি সৃষ্টি করেছেন সমস্ত কিছু, এবং তিনি সেই সমস্ত কিছুর ন্যায়'। এই বিশ্ব-জগৎ পালিশ করা কাঁচ নির্মিত মহল। একটি মহাশক্তি এর তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত এবং যা ইচ্ছা হয় তা-ই করে। পাতলা-দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের চোখে মনে হয়, যেন এটি নিজে নিজেই অস্তিত্ববান। তারা মনে করে যে, সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি সবই নিজে নিজেই অস্তিত্ববান। অথচ, সমস্ত অস্তিত্বই তাঁরই আয়ত্তাধীন।

সর্বজ্ঞ (খোদাতায়ালা) আমার নিকটে এই গুপ্ত রহস্য উন্মোচিত করে দিয়েছেন যে, এই সমগ্র বিশ্ব-জগৎ তার সমস্ত শাখা-প্রশাখাসহ **'কারণসমূহের কারণ'** এর কর্ম এবং ইচ্ছা-এরাদা সমাধা করে চলেছে, ঠিক সেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ন্যায় যেগুলি নিজে নিজেই সক্রিয় নয় ; বরং সেই মহান আত্মা থেকে শক্তি অর্জন করেই সক্রিয়, ঠিক যেমন শরীরের সমস্ত শক্তিই আত্মার নির্দেশে ক্রিয়াশীল হয়। এবং এই যে বিশ্ব-জগৎ, যা সেই মহান সত্তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ন্যায়, তার মধ্যে বহু জিনিষ এমন রয়েছে যে, তা সবই যেন তাঁর চেহারার আলো, যা প্রকাশ্য ও গোপনভাবে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী আলোকরূপে কাজ করে। আরও এমন অনেক জিনিষ আছে সেগুলি যেন তাঁর হাত। আবার অনেক জিনিষ আছে সেগুলি যেন তাঁর পাখা। আবার অনেক কিছু আছে যেগুলি তাঁর নিঃশ্বাসের ন্যায়। সংক্ষেপে, এই বিশ্ব-জগৎ সামগ্রিকভাবে খোদাতায়ালার জন্য একটি দেহতুল্য। এবং এই দেহের সকল গৌরব ও মহিমা এবং তার জীবন ও জিন্দেগী সেই 'মহান আত্মা' থেকেই উদ্ভূত যা তার (বিশ্ব-জগতের) জন্য কাইয়্যুম বা স্থিতিদাতা। এবং সেই স্থিতিদাতার সত্তায় যে ঈপ্সিত ক্রিয়াশীলতা সৃষ্টি হয় সেই ক্রিয়াশীলতা সেই দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কিংবা কোন কোনটাতে সেই স্থিতিদাতার চাহিদা অনুযায়ী সৃষ্টি হয়ে যায়। উল্লিখিত বিষয়টিকে বিশদভাবে বুঝার জন্য আমরা এইভাবেও কল্পনা করতে পারি যে, বিশ্ব-জগতের স্থিতিদাতা এমন এক অতি মহান সত্তা যার জন্য অসংখ্য হাত, অসংখ্য পা রয়েছে, রয়েছে সব অসংখ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেগুলির দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে কোন সীমা নেই, পরিসীমা নেই, এবং এক অক্টোপাসের ন্যায় সেই বিশাল সত্তার শুড়ও রয়েছে অগণিত, যেগুলো ছড়ানো রয়েছে এই জগতের কোণায় কোণায় এবং সব কিছুকেই নিজের দিকে আকর্ষণ করছে। এ হচ্ছে সেই সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেগুলোকে অন্য কথায় বলা হয়েছে বিশ্ব-জগত। যখন এই বিশ্বজগতের স্থিতিদাতা কোন কিছু করার জন্য সক্রিয় হয়, তা সে আংশিক হোক আর সার্বিক, তখন তার ক্রিয়ার সঙ্গে তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যেও ক্রিয়াশীলতা শুরু হয়ে যাওয়াটা আবশ্যিক হয়ে পড়ে, এবং তখন তিনি তাঁর সকল ইচ্ছাকে ঐ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে পূর্ণতা দান করে থাকেন, অন্য আর কোন উপায়ে নয়। এটাই হচ্ছে সেই আধ্যাত্মিক বিষয়ের একটি অতি সাধারণ কল্পিত দৃষ্টান্ত যার মাধ্যমে বলা হয়েছে যে, সৃষ্টির বা মখলুকাতের প্রতিটি অংশই খোদাতায়ালার ইচ্ছা অভিপ্রায়ের অধীন এবং তা

সবই তাঁর গুপ্ত উদ্দেশ্যাবলীকে প্রকাশিত করে চলেছে নিজেদের চেহারায়। এবং তা পরিপূর্ণ বা কামেল আনুগত্য সহকারে তাঁর ইচ্ছা-এরাদাসমূহের পথে আত্মবিলীন হয়ে রয়েছে। এবং এই আনুগত্য এমন ধরনের নয়, যা সরকারের প্রতি প্রদর্শিত হয় বা জবরদস্তির কারণে করা হয়। বরং, খোদাতায়ালার প্রতি প্রত্যেকটি বস্তুর এক প্রকার চৌম্বিক আকর্ষণ থাকে, এবং প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু এমন স্বাভাবিকভাবে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়, যেমন কোন দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি আকর্ষিত থাকে সেই দেহেরই সঙ্গে। অতএব, প্রকৃতপক্ষে এটাই সত্য এবং সম্পূর্ণরূপে সত্য যে, এই সমগ্র বিশ্ব-জগৎ সেই অতি বিশাল সত্তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির অনুরূপ। এবং এ কারণেই তিনিই হচ্ছেন সকল জগতের স্থিতিদাতা – কাইয়্যুমুল আলামীন। কেননা, আত্মা যেমন তার দেহের স্থিতিদাতা তেমনি তিনিও সমগ্র সৃষ্টি জগতের স্থিতিদাতা। এরূপ যদি না হতো, তাহলে মহাজগতের সব শৃংখলা চুরমার হয়ে যেত। সেই স্থিতিদাতার প্রত্যেকটি ইচ্ছা, – তা সে প্রকাশ্য হোক আর গোপন হোক, ধর্মীয় হোক আর পার্থিব হোক, – এই সৃষ্টির মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়। এমন কোন ইচ্ছা নেই যা মাধ্যম ব্যতীত পৃথিবীতে প্রকাশিত হয়। এটাই হচ্ছে আদিম প্রাকৃতিক নিয়ম – কানুনে কুদরত বা Natural Law, যা আদি থেকেই চলে আসছে।' – (তৌজিহ্ মারাম, পৃ. ৪০-৪৩)

(৩৩)

'এর মধ্যে কথা বলার কোন জায়গা নেই যে, নভোমন্ডলের বস্তুসমূহে এবং ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ-এর মধ্যে দেহগতভাবে ও লয়যোগ্যরূপে যে সকল গুণাবলী পাওয়া যায়, তা সবই আধ্যাত্মিকভাবে এবং চিরন্তনরূপেই বিদ্যমান রয়েছে খোদাতায়ালার মধ্যে। এবং খোদাতায়ালা আমাদের কাছে এটাও প্রকাশ করে দিয়েছেন যে, সূর্য ইত্যাদি তাদের আপন সত্তায় কিছুই না। এ আসলে সেই মহাশক্তিরই এক প্রকাশ যা পর্দার অন্তরালে থেকে ক্রিয়াশীল রয়েছে। এ হচ্ছে সে-ই, যে চন্দ্রকে তার নিজের সত্তার পরিচ্ছদ বানিয়ে তারই অভ্যন্তরে থেকে অন্ধকার রাতে আলো বিতরণ করে, ঠিক যেমন সে অন্ধকার হৃদয়ে স্বয়ং প্রবেশ করে তা আলোকিত করে তোলে। এবং সে স্বয়ং মানুষের অন্তরে কথা বলে। এ তো সে-ই, যে তার শক্তিকে সূর্যের পর্দা দ্বারা ঢেকে দিয়ে দিবসকে মহিমান্বিত আলোকের প্রকাশস্থল বানিয়ে দেয়, এবং বিভিন্ন মৌসুমে বিভিন্ন কর্মের প্রকাশ ঘটায়। তারই শক্তি আকাশ থেকে বর্ষিত হয় যাকে বৃষ্টি বলা হয়, যা শুষ্ক যমীনকে শস্যশ্যামল করে তোলে, এবং পিপাসার্তকে পরিতৃপ্ত করে। তারই শক্তি আগুনের মধ্যে থেকে জ্বালাবার কাজ করে ; এবং বাতাসের মধ্যে থেকে শ্বাস-প্রশ্বাসকে সজীব করে, ফুলকে প্রস্ফুটিত করে, মেঘকে উড়ন্ত রাখে এবং শব্দকে কর্ণকুহরে প্রবেশ করায়। এ তো তাঁরই শক্তি, যা ভূ-মন্ডলের আকার ধারণ করে তার আপন পিঠের উপরে মানব ও অন্য সকল প্রজাতির প্রাণীকুলকে বহন করে।

কিন্তু, এই সকল জিনিষ কি খোদা ? না, বরং সৃষ্টি। তবে, এগুলোর অণু-পরমাণুতে খোদার শক্তি এমনভাবে মিশে রয়েছে যে, যেমন কলমের সঙ্গে রয়েছে হাত। যদিও আমরা একথা বলে থাকি যে, কলম লিখছে, তবু আসলে কলম তো লিখছে না, লিখছে হাত। কিংবা, দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটা লোহার টুকরা যা আগুনের মধ্যে পড়ে আগুনের রূপ ধারণ করে, আমরা বলতে পারি যে, ওটাও পোড়াতে পারে এবং আলোও দিতে পারে। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে এই গুণগুলি ঐ লোহার টুকরোটার নয়, বরং আগুনের। এমনিভাবে, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যাবে যে, এটাও ঠিক যে, নভোমন্ডলের যাবতীয় বস্তু এবং পৃথিবীর যাবতীয় উপাদান এবং উর্ধ ও নিম্ন জগতের সমস্ত অণু-পরমাণু যা গোচরীভূত হয় কিংবা অনুভূত হয় – সব কিছুই তাদের অন্তর্নিহিত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর কারণে, খোদাতায়ালারই এক একটি নাম এবং তাঁর গুণ। এবং এদের মধ্যে খোদাতায়ালার যে শক্তি গোপন থাকে, তা-ই প্রকাশিত হয়। এবং এ **সব কিছুই ছিল শুরুতে তাঁর কথা, যা-কে বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত করেছে তাঁর শক্তি।** কোন মুর্খ হয়তো প্রশ্ন করে বসবে যে, খোদার কথা কীভাবে মূর্তরূপ লাভ করলো। এগুলো আলাদা হয়ে যাওয়াতে কি খোদার মধ্যে কমতি ঘটলো না ? কিন্তু, তার চিন্তা করা উচিত যে, সূর্যতাপে যখন আতশী কাঁচে – (ম্যাগনিফাইং গ্লাস) আগুন জ্বলে ওঠে, তখন সেই আগুন সূর্যের মধ্যে কোনই কমতি ঘটায় না। একইভাবে যখন চন্দ্রকিরণের প্রভাবে ফলের মধ্যে পক্কতা আসে, তখন তা চাঁদের মধ্যেও কোন দুর্বলতার সৃষ্টি করে না। **এটাই খোদাতায়ালার মা'রেফত-এর এক রহস্য এবং এটাই আধ্যাত্মিক বিষয়ের কেন্দ্র যে, খোদার কথা দ্বারাই বিশ্ব-জগতের সৃষ্টি।** – (নসীমে দাওয়াৎ, পৃ. ৫৮–৬০)।

(৩৪)

'যখন আমি বৃহৎ বৃহৎ দেহগুলিকে (গ্রহ, নক্ষত্রগুলিকে) দেখি এবং সেগুলির বিশালত্ব ও বিস্ময়-এর উপরে চিন্তা-ভাবনা করি, এবং যখন দেখতে পাই যে, খোদার ইচ্ছা ও ইশারাতেই সব কিছু হয়ে গেছে, তখন আমার আত্মা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে ওঠে ঃ হে আমাদের সর্বশক্তিমান খোদা ! তুমি কতই না মহান শক্তির অধিকারী। তোমার কাজ কতই না বিস্ময়কর! কতই না মানববুদ্ধির অগম্য ! মূর্খ সে, যে তোমার শক্তিসমূহকে অস্বীকার করে। এবং নির্বোধ সে, যে তোমার সম্পর্কে এই আপত্তি উত্থাপন করে যে, কোন্ বস্তু দিয়ে তিনি এ সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন ?' – (নসীমে দাওয়াৎ, পৃ. ৬০. হাশিয়া)।

(৩৫)

'খোদাতায়ালা–যিনি আমাদের খোদা হন বলে বলেন – তাঁর খোদায়ীর আসল হকীকত বা প্রকৃত সত্যতা এটাই যে, তিনি এমন এক সত্তা, যিনি সকল কৃপা ও কল্যাণের উৎস এবং তাঁরই হাত থেকে সমস্ত কিছুই অস্তিত্ব লাভ করেছে,

প্রকাশিত হয়েছে। এ কারণেই তাঁর মাবূদিয়্যতের বা উপাস্য হওয়ার অধিকার জন্মেছে। এবং এ কারণেই আমরা খুশী মনে স্বীকার করি যে, আমাদের দেহ ও আত্মা ও প্রাণের উপরে তাঁর যে দখল তা বৈধ দখল। কেননা, আমরা তো কিছুই ছিলাম না। তিনি আমাদেরকে অস্তিত্ব দান করেছেন। অতএব, যিনি আমাদেরকে নাস্তি থেকে অস্তিত্বে এনেছেন, তিনি পূর্ণ অধিকারেই আমাদের মালিক।' – (শাহ্‌নায়ে হক্, পৃ. ১০২)।

(৩৬)

'আসল কথা হচ্ছে, খোদাতায়ালার কুদরত-এর যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে তিনি নিজেকে খোদা বলে দাবী করেন, তা হচ্ছে, আত্মিক ও দৈহিক শক্তিসমূহকে সৃষ্টি করবার বৈশিষ্ট্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রাণীদের দেহে যে চক্ষু তিনি দান করেছেন, তাঁর সেই কাজের মধ্যে তাঁর আসল কৃতিত্ব এটা নয় যে, তিনি এই চক্ষু সৃষ্টি করেছেন, বরং তার কৃতিত্ব হচ্ছে, তিনি দেহের অণু-পরমাণুগুলির মধ্যে প্রথম থেকেই এমন শক্তি সুপ্ত রেখেছিলেন যার মধ্যে দৃষ্টিশক্তির আলোক নিহিত ছিল। অতএব, এই সমস্ত শক্তি যদি আপনা-আপনিই হয়ে থাকে, তাহলে তো খোদা বলতে আর কিছুই থাকে না। কোন কোন লোকে বলে যে, 'টাকায় করে কাম মর্দের খালি নাম'। এদের কথা হলো, ঐ সমস্ত শক্তিই দৃষ্টিশক্তিকে সৃষ্টি করে থাকে, এর মধ্যে খোদার কোন দখল নেই। যদি জগতের অণু-পরমাণুর মধ্যে ঐ শক্তি নিহিত না থাকতো তাহলে, খোদা কিছুই করতে পারতেন না। অথচ, সত্য এটাই যে, খোদায়ীর সমস্ত গুরুত্ব এর মধ্যেই নিহিত যে, তিনি আত্মা এবং জগতের অণু-পরমাণুর যাবতীয় শক্তিকে স্বয়ং সৃষ্টি করেছেন এবং করে থাকেন। এবং স্বয়ং সেগুলোর মধ্যে নানা প্রকারের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছেন এবং করে থাকেন। এবং ঐ সকল বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর কুশলতা প্রদর্শন করে থাকেন। এবং এ কারণেই, কোন উদ্ভাবকই খোদার সমকক্ষ হতে পারে না। কেননা, যে ব্যক্তি রেল-ইঞ্জিন আবিষ্কার করেছে, কিংবা, যে ব্যক্তি তার, ফটোগ্রাফি বা প্রিন্টিং প্রেস ইত্যাদি বা অন্যকিছু আবিষ্কার করেছে, তাকে স্বীকার করতে হবে যে, সে ঐ সমস্ত শক্তির উদ্ভাবক নয় যে সমস্ত শক্তি ব্যবহার করে সে একটা কিছু উদ্ভাবন বা আবিষ্কার করেছে। সকল উদ্ভাবক বা আবিষ্কারকই পূর্ব থেকে বিদ্যমান শক্তিগুলিকেই কাজে লাগিয়ে থাকে। যেমন, ইঞ্জিন চালানোর ক্ষেত্রে বাষ্পের শক্তিকে কাজে লাগানো হয়। সুতরাং পার্থক্য এটাই যে, খোদাতায়ালা উপাদান ইত্যাদির মধ্যে শক্তি স্বয়ং সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু, অন্য কেউই এই শক্তি বা ক্ষমতা সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়। অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত খোদাতায়ালাকে জগতের এবং আত্মার সকল শক্তির উদ্ভাবনকর্তা বলে স্বীকার করা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর খোদায়ী সাব্যস্ত হবে না। এমতাবস্থায় তাঁর মর্যাদা একজন কামার, কুমার, মিস্ত্রী বা সুতার স্বর্ণকার-এর চাইতে বেশী হবে না।' – (নসীমে দাওয়াত, পৃ. ২২, ২৩)

(৩৭)

'আমরা আমাদের কামেল ঈমান ও পূর্ণ মা'রেফত সহকারে এই সাক্ষ্য দান করছি যে, আর্য-সমাজীদের এই নীতি-আদর্শ কোনমতেই অভ্রান্ত নয় যে, আত্মা এবং পরমাণু তাদের শক্তিসমূহসহ চিরন্তন ও অনাদি ও স্বয়ম্ভূ। এই বিশ্বাসের দ্বারা সেই সমস্ত সম্বন্ধই ছিন্ন হয়ে যায়, যা খোদা এবং তাঁর বান্দাগণের মধ্যে বিদ্যমান। এ এক নতুন এবং বিকৃত ধর্মমত যা পন্ডিত দয়ানন্দ প্রবর্তন করেছেন। আমরা তো জানি না যে, বেদ-এর সঙ্গে এই ধর্মের সম্পর্ক কতটুকু। কিন্তু, আমাদের কথা হচ্ছে, এই যে মতবাদ যা আর্য-সমাজীরা নিজেরা প্রকাশ করেছেন, তা সুস্থ বুদ্ধির নিকটে পূর্ণ জ্ঞান, গভীর চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার আলোকে কখনই গৃহীত হতে পারে না। সনাতন ধর্মের নীতি-আদর্শ যা তাদের সামনেই পড়ে আছে, তা যদিও বেদান্ত-এর অতিরঞ্জনের দ্বারা বিকৃত করা হয়েছে, এবং বেদান্তীগণের বাড়াবাড়িও যার বিরুদ্ধে নানা আপত্তি উত্থাপনের সুযোগ এনে দিয়েছে, তবু এর মধ্যে সত্যের একটা ঝলক রয়েছে। তাদের এই বিশ্বাসকে যদি বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে, এর মূল বক্তব্য হচ্ছে ঃ সমস্ত কিছুই সৃষ্টি করেছেন স্বয়ং পরমেশ্বর। অতএব, এমতাবস্থায়, ঐ সমস্ত সংশয় সন্দেহই দূর হয়ে যায় এবং স্বীকার করতে হয় যে, সনাতন ধর্মের নীতি আদর্শ অনুযায়ী বেদ -এর ধর্মমতও এটাই যে, সকল আত্মা, সমস্ত পরমাণু এবং সকল দেহ এবং সেগুলির যাবতীয় শক্তি ও ক্ষমতা এবং গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য সব কিছুকে খোদা-ই সৃষ্টি করেছেন।' – (নসীমে দাওয়াত, পৃ. ২৫–২৬)।

(৩৮)

'কোরআন শরীফ আমাদেরকে এই শিক্ষা দান করেছে যে, মানুষের আত্মা এবং তার সকল শক্তি ও যোগ্যতা এবং তার অস্তিত্বের সমস্ত অণু-পরমাণু সেই খোদাতায়ালারই সৃষ্টি, যে খোদা তাকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং কোরআন শরীফের শিক্ষার আলোকে আমরা হচ্ছি খোদাতায়ালার সম্পত্তি, এবং এর উপরে আমাদের এমন কোনই অধিকার নেই। যা আমরা দাবী করতে পারি তাঁর কাছে। এবং সেই দাবী পূরণ না করার জন্য তাঁর উপরে কোন দোষও বর্তিতে পারে না। এজন্যই, আমরা আমাদের মোকাবেলায় খোদাতায়ালার নাম মুন্সেফ' (ইনসাফকারী) রাখতে পারি না। বরং, আমরা সম্পূর্ণরূপে খালি-হাত হওয়ার কারণে তাঁর নাম রাখতে পারি 'রহীম' (বার বার দানকারী)। সংক্ষেপে, 'মুন্সেফ' বলার ভিতরে এই শারারাত বা অন্যায্য বোধ নিহিত থাকে যে, আমরা যেন তাঁর মোকাবেলায় বা তাঁর নিকটে সত্যিই কোন হক্ক বা অধিকার রাখি। এবং যেন সেই হক আদায় না করার কারণে তাঁকে দায়ী করতেও পারি।' – (চশ্‌মা মা'রেফত, পৃ. ২৮)

'কিন্তু, কোরআন শরীফ বেদ-এর ন্যায় অযৌক্তিকভাবে এবং জবরদস্তি করে আল্লাহ জাল্লা শানুহু-কে সকল আত্মা এবং সকল দেহের সমস্ত অণু-পরমাণুর মালিক সাব্যস্ত করেনি। বরং, এজন্য এক যুক্তি উপস্থাপন করেছে। যেমন বলেছে ঃ

لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ ۔ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيْرًا

অর্থাৎ যমীন ও আকাশমন্ডলী এবং যা কিছু ওদের মধ্যে রয়েছে সব কিছুই খোদাতায়ালার অধিকারভুক্ত। কেননা, এ সমস্ত কিছুকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন। এবং প্রত্যেকটি সৃষ্টির যোগ্যতার এবং কাজের একটা সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যাতে করে সীমাবদ্ধ বস্তু এই দিকে স্পষ্ট ইঙ্গিত দান করে যে, একজন সীমাদানকারী আছেন, এবং তিনিই হচ্ছেন খোদাতায়ালা – (২৫ঃ৩)। কাজেই আমরা দেখতে পাই যে, যেভাবে দেহগুলি স্ব স্ব সীমার মধ্যে আবদ্ধ রয়েছে এবং সেই নির্দিষ্ট সীমার বাইরে যেতে পারে না ; তেমনিভাবে আত্মাগুলিও আপন আপন সীমার মধ্যে আবদ্ধ এবং তাদের জন্য নির্দিষ্ট যোগ্যতার অধিক কোন যোগ্যতা তারা সৃষ্টি করতে পারে না। এখন, আমরা প্রথমে, দেহ-এর সীমাবদ্ধ হওয়া সম্পর্কে কিছু উদাহরণ পেশ করবো। যেমন ধরুন, চাঁদ-এর কথা। চাঁদ তার পরিক্রমা শেষ করে এক মাসের মধ্যে - ২৯ অথবা ৩০ দিনের মধ্যে। কিন্তু, সূর্য তার পরিক্রমা শেষ করে, ৩৬৪/৫ দিন ধরে। এবং সূর্যের এই ক্ষমতা নেই যে, সে তার পরিক্রমণের দিন কম করে নেয় এবং তা চাঁদের পরিক্রমণের সমান করে ফেলে। চাঁদেরও এই ক্ষমতা নেই যে, সে তার নিজের পরিক্রমণের দিন বৃদ্ধি করে নিয়ে সূর্যের জন্য নির্ধারিত দিনের সমান করে নেয়। যদি সমগ্র পৃথিবী এজন্য একমত হয় যে. এই দু'টি বস্তুর বা দেহের পরিক্রমণের মধ্যে কিছুটা কমবেশী করা হোক, তাহলে তা তাদের জন্য কোনক্রমেই সম্ভবপর হবে না। এবং স্বয়ং সূর্য এবং চন্দ্রেরও এই ক্ষমতা নেই যে, তারা আপন আপন পরিক্রমার মধ্যে কিছু কমবেশী, কিছু পরিবর্তন সাধন করে।

সুতরাং, সেই যে সত্তা, যিনি এই অগণিত নক্ষত্ররাজিকে আপন আপন সীমার মধ্যে স্থাপিত করে রেখেছেন অর্থাৎ যিনি এদের প্রত্যেকটিকে সীমাবদ্ধ করেছেন এবং এক নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ করেছেন, তিনিই খোদা। এমনিভাবে মানুষের দেহ এবং হাতীর দেহের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। যদি সকল ডাক্তার এইজন্যে একত্রিত হয় যে, মানুষকে তার দৈহিক শক্তিতে এবং দৈহিক আকারে হাতীর সমান করা হোক, তাহলে তারা তা করতে সক্ষম হবে না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে একটা সীমা রয়েছে অর্থাৎ সীমা নির্ধারণ করা আছে। যেমন, সূর্য ও চন্দ্রের ক্ষেত্রে সীমা নির্দিষ্ট রয়েছে এবং সেই নির্দিষ্ট সীমা একজন সীমা নির্ধারনকারী থাকারও প্রমাণ পেশ করে। অর্থাৎ সেই অস্তিত্বের অপরিহার্যতার প্রমাণ দেয়, যিনি হাতীকে দান করেছে বিপুল দেহ এবং মানুষকে দিয়েছেন তার উপযোগী দেহ। এবং যদি গভীরভাবে লক্ষ্য করা যায়, তাহলে

দেখা যাবে যে, সমস্ত বস্তু বা পদার্থের মধ্যেই বিস্ময়করভাবে খোদাতায়ালার নিয়ন্ত্রণ কাজ করছে। এবং বিস্ময়করভাবে এক সীমাবদ্ধতাও বিদ্যমান রয়েছে ঐ সমস্ত কিছুর উপরেই। সেই সকল জীবাণুর সীমাবদ্ধতা থেকে শুরু করে – যেগুলোকে অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখাই যায় না, – ঐ সকল বিশাল বিশাল মাছের সীমাবদ্ধতা পর্যন্ত – যেগুলো বড় বড় জাহাজকে পর্যন্ত এক এক গ্রাসেই গিলে ফেলতে পারে, – প্রত্যেকটির মধ্যে দৈহিক সীমাবদ্ধতার এক বিস্ময়কর দৃশ্য লক্ষ করা যায়। কোন প্রাণীই তার দেহের অনুপাতে তার আপন সীমার বাইরে যেতে পারে না। একইভাবে, যে তারকারাজিকে আকাশে দেখা যায়, সেগুলিও নিজ নিজ সীমারেখার বাইরে যেতে পারে না। অতএব, এই সীমাবদ্ধতার বিষয়টি এই প্রমাণ পেশ করছে যে, পর্দার আড়ালে সীমা বেঁধে দেওয়ার কেউ আছে। এটাই হচ্ছে, তাৎপর্য এই আয়াতের خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا ('যিনি প্রতিটি বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন, অনন্তর তার সঠিক পরিমাণ নির্ধারিত করেছেন' – ২৫:৩)

এখন জানা দরকার যে, সীমা বেঁধে দেওয়ার বিষয়টি যেমন দেহ-এর ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়, তেমনি তা আত্মা-এর ক্ষেত্রেও সত্য প্রমাণিত হয়েছে। তুমি বুঝতে পারবে যে, মানুষের আত্মা যেভাবে আপন ঔৎকর্ষ প্রদর্শন করতে সক্ষম, অথবা বলতে পার যে, যেভাবে উৎকর্ষতার দিকে উন্নতি লাভ করতে সক্ষম, সেই উৎকর্ষতা হাতীর আত্মা-তার বিরাট আকার ও আয়তন সত্ত্বেও - অর্জন করতে সক্ষম নয়। একইভাবে, প্রত্যেকটি প্রাণীর আত্মা স্বীয় শক্তি ও যোগ্যতার ক্ষেত্রে তার প্রজাতির পরিধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এবং তা সেই উৎকর্ষতাই অর্জন করতে পারে যা তার প্রজাতির জন্য নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত করা হয়েছে। সুতরাং যেভাবে দেহের সীমাবদ্ধতা এই কথার প্রমাণ দেয় যে, তার কোন সীমাবন্ধনকারী সৃষ্টিকর্তা আছে। তেমনিভাবে, আত্মার শক্তির সীমাবদ্ধতাও এই কথার প্রমাণ দিচ্ছে যে, তারও কোন স্রষ্টা ও সীমাবন্ধনকারী রয়েছে। – (চশ্‌মা মা'রেফত, পৃ. ৯-১১)

(৪০)

'যদি মনের মধ্যে এই ধরনের চিন্তার উদয় হয় যে, খোদাতায়ালা বিভিন্ন প্রকৃতি, মেজায বা যোগ্যতার সৃষ্টি করেছেন কেন, এবং কেনই বা তিনি সবাইকে এমন শক্তি দান করেন নি, যার বদৌলতে তারা কামেল মা'রেফত ও কামেল মহব্বতের স্তর পর্যন্ত পৌছে যেতে পারতো। তাহলে, এই প্রশ্ন হবে খোদাতায়ালার কাজের মধ্যে একপ্রকার অনধিকার চর্চা, যা কোনমতেই বৈধ হতে পারে না। প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝতে পারে যে, সমগ্র সৃষ্টিকে একই পর্যায়ে রাখা এবং সকলকেই উত্তম উৎকর্ষতার যোগ্যতা দান করা খোদার জন্য কোন বাধ্যবাধকতা নয়। এ সবই তো তাঁর স্রেফ কৃপা মাত্র। তাঁর এই এখ্‌তিয়ার আছে যে, তিনি যাকে চাইবেন কৃপা করবেন, যাকে চাইবেন না, করবেন না। দৃষ্টান্তস্থলে, খোদা তোমাকে মানুষ বানিয়েছে, এবং গাধাকে মানুষ বানাননি। তোমাকে বুদ্ধি দিয়েছেন, এবং গাধাকে দেননি। কিংবা তুমি জ্ঞান আহরণ করতে পেরেছ, ও পারেনি। এ সবই মালিকের মর্জির কথা। এমন কোন অধিকার ছিল

না, যা তোমার ছিল, ওর ছিল না। সংক্ষেপে, খোদাতায়ালার সৃষ্টির মধ্যে স্তর বিন্যাসে যে সুস্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, তা কোন বুদ্ধিমান মানুষই অস্বীকার করতে পারে না। এমতাবস্থায় সেই নিরংকুশ মালিকের সামনে, সেই সৃষ্টি, যার অস্তিত্ববান হওয়ারই কোন অধিকার ছিল না, তার পক্ষে কোন বড় অধিকার লাভের কথা তো দূরস্থান – কোনও প্রশ্ন উত্থাপন করা কি সম্ভব ? বান্দাদেরকে অস্তিত্বের পরিচ্ছদে ভূষিত করা খোদাতায়ালার এক দান, এক কৃপা বা এহ্‌সান। এবং এ তো জানা কথাই যে, দাতা ও কৃপাকারী, তাঁর দান ও কৃপার মধ্যে কমবেশী করবার অধিকার রাখেন। আর যদি তাঁর কম দেওয়ার এখ্‌তিয়ার না থাকে, তাহলে তাঁর বেশী দেওয়ারও এখ্‌তিয়ার থাকবে না। এমনটি হলে তো তিনি তাঁর মালিকানার অধিকারই প্রয়োগ করতে পারবেন না ; এবং এটাও স্বতঃস্পষ্ট যে, স্রষ্টার উপরে সৃষ্টির কোন অধিকার যদি খামাখাই আরোপ করা হয়, তাহলে এথেকে অধিকারের একটা ধারাবাহিকতা জারি হয়ে যাবে। কেননা, যে স্তরেই স্রষ্টা কোন সৃষ্টিকে বানাবেন, সেই স্তরেই সৃষ্টি বলতে পারবে, আমার হক্ তো এর চাইতে আরো বেশী। এবং খোদাতায়ালা যদি অন্তহীন স্তরের সৃষ্টি করতে থাকেন এবং তাঁর অন্তহীন শক্তির কারণে যদি মানব সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির ফযিলত ও উন্নতি শেষ হয়ে না যায় তাহলে, সৃষ্টির এইরূপ প্রশ্নের ধারাও কখনও শেষ হয়ে যাবে না। এবং সৃষ্টির প্রতিটি স্তরেই বিনা ব্যতিক্রমে সৃষ্টির অধিকার আদায়েরও অধিকার জন্মাবে এবং এই ধারা অব্যাহতই থাকবে।

তবে, যদি কেউ জানতে চায় যে, স্তর-এর ক্ষেত্রে এইরূপ তারতম্য করার মধ্যে কি প্রজ্ঞা নিহিত ? তাহলে, এটা জানতে ও বুঝতে হবে যে, এ ব্যাপারে কোরআন শরীফ তিন প্রকার প্রজ্ঞা বা হেকমতের বর্ণনা দিয়েছে, যা কিনা স্বতঃস্পষ্ট, এবং অত্যন্ত পরিষ্কার, যা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই অস্বীকার করতে পারবে না। এবং এরই বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

প্রথমত ঃ জগতের বিষয়াদি বা ঘটনাবলীকে যেন সর্বোত্তম পন্থায় সমন্বিত করা যায়। যেমন বলা হয়েছে ঃ

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ﴿٣٢﴾ اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿٣٣﴾

('এবং তারা এ-ও বললো যে, এই কোরআন দু'টি নগরীর মধ্য থেকে কোন মহান ব্যক্তির উপরে নাযিল করা হলো না কেন ? 'তারাই কি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের রহমত বন্টন করছে ? আমরাই তাদের মধ্যে এই পার্থিব জীবনে তাদের জীবিকা বন্টন করি ; এবং তাদের কতককে কতকের উপরে পদ-মর্যাদায় উন্নীত ও সম্মানিত করি, যাতে তাদের মধ্য থেকে কতক তাদের কতককে অধীনস্থ করতে পারে। এবং তারা যে সম্পদ জমা করে তার চাইতে তোমার প্রভু-প্রতিপালকের রহমত উত্তম'–৪৩ঃ৩২,৩৩)।

অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা বলে যে, এই কোরআন কেন মক্কা এবং তায়েফ-এর বড় বড় বিত্তশালীদের এবং নেতৃবৃন্দের মধ্য থেকে কোন বড় নেতা ও ধনাঢ্য ব্যক্তির উপরে নাযিল করা হলো না ? তাহলে তো সেটাই হতো তার নেতৃত্বের মর্যাদার উপযোগী, এবং সে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি, ও রাজনৈতিক যোগ্যতা কাজে লাগিয়ে এবং ধন-সম্পদ ব্যয় করে ধর্মের প্রচার ও প্রসার দ্রুততার সঙ্গে সম্পাদন করতে পারতো। একজন গরীব মানুষ, যার কাছে পার্থিব সহায়-সম্পত্তি বলতে কিছুই নেই, তাকে কেন বেছে নেওয়া হলো এই দায়িত্ব ও সম্মানের জন্য ? এরই জবাবে বলা হয়েছে ঃ 'তারাই কি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের রহমত বন্টন করছে ? ' অর্থাৎ চিরন্তন বন্টনকারীর রহমতসমূহ ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দেওয়ার এখতিয়ার কি তারাই রাখে ? এ তো সর্বশক্তিমান খোদাওন্দ করীমের কাজ যে, অনেকের যোগ্যতা ও ক্ষমতা ও হিম্মতকে তিনি সীমিত করে রেখেছেন। কেননা, তারা দুনিয়াদারীর কাজে–কর্মে সম্পূর্ণরূপে লিপ্ত হয়ে পড়েছে এবং গর্বে স্ফীত হয়েছে এই ভেবে যে, তারা নেতা, ধনী এবং বড়লোক। এবং তারা জীবনের আসল উদ্দেশ্যকেই ভুলে গেছে। আবার অনেককে তিনি দান করেছেন আধ্যাত্মিক কল্যাণরাজি এবং পবিত্র উৎকর্ষতা। এবং তারা সেই প্রকৃত প্রিয়তম – মাহবুবে হাকীকি-এর ভালবাসায় বিভোর হয়ে মগ্ন হয়ে তাঁর প্রিয়পাত্র হয়েছেন, তাঁর নৈকট্য লাভ করেছেন এবং তাঁর কাছে গৃহীত হয়েছেন। অতঃপর, সেই হেকমত বা প্রজ্ঞার প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যা বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী, যোগ্যতা ও দায়িত্ব সম্পর্কে ব্যক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ 'আমরাই তাদের এই পার্থিব জীবনে তাদের জীবিকা বন্টন করে থাকি।' অর্থাৎ, আমরা এজন্যই কাউকে ধনী, কাউকে গরীব, কাউকে তীক্ষ্ণ মেধাবী, কাউকে বোকা প্রকৃতির ; কাউকে এক প্রকার পেশার দিকে, কাউকে অন্য প্রকার পেশার দিকে আকৃষ্ট করি, যাতে করে তাদের মধ্যে এই সুবিধা ও এই আছানী সৃষ্টি হয় যে, তারা পরস্পর পরস্পরের কাজে কর্মে সহায়তাকারী হতে পারে, সেবাকারী হতে পারে, এবং দায়িত্বাবলী যথাযোগ্যভাবে বন্টন করে নিতে পারে এবং কেবল এক জনের বা এক শ্রেণীর উপরেই সমস্ত প্রকার দায়িত্বের চাপ না পড়ে। এবং এভাবেই যেন মানবজাতি স্বস্তিতে ও নির্বিঘ্নে জীবনযাপন করতে পারে। এরপর আরও বলা হয়েছে যে, এক্ষেত্রে পার্থিব মাল-সম্পত্তির চাইতে খোদার কিতাব হচ্ছে অনেক অনেক বেশী লাভজনক বা কল্যাণকর। এ এক সূক্ষ্ম ইশারা, যা করা হয়েছে ঐশীবাণীর প্রয়োজনীয়তার দিকে। এর বিশদ ব্যাখ্যা হচ্ছে, মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, একে অপরের সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়া চলতে পারে না, কারো কোন কাজই সমাধা হতে পারে না। দৃষ্টান্তস্থলে রুটির কথাই ধরা যাক – রুটি জীবনধারণের জন্য আবশ্যক। এটি তৈরী করার জন্য কত জনেরই সাহায্য সহযোগিতা প্রয়োজন। জমি চাষের প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে, রুটি পাক করে খাবারের জন্য তৈরী করা পর্যন্ত ডজন ডজন শ্রমিকের প্রয়োজন হয় পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য

করার, সহযোগিতা করার জন্য। এখেকেই বুঝা যায় যে, সমাজের বিভিন্ন স্তরের বা পর্যায়ের কাজকর্মে কত বিভিন্ন ধরনের পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মিটানোর জন্যই সর্বজ্ঞ খোদা মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন বিভিন্ন প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য দিয়ে, গুণাগুণ দিয়ে, যাতে করে প্রতিটি ব্যক্তি তার যোগ্যতা ও অভিরুচি মোতাবেক স্বাচ্ছন্দ্যে কাজ করতে পারে। কেউ কৃষিকাজ করবে, কেউ কৃষিকাজের জন্য উপকরণ তৈরী করবে, কেউ আটা পিষবে, কেউ পানি আনবে, কেউ রুটি পাক করবে, কেউ সূতা কাটবে, কেউ তাঁত বুনবে, কেউ দোকান খুলবে, কেউ বাণিজ্য করবে, কেউ বা চাকুরী করবে, এবং এমনিভাবে একে অপরের সহযোগিতা করবে এবং পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করবে। অতঃপর, যখন পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা জরুরী হয়ে পড়ে তখন একের সঙ্গে অন্যের আচরণ-বিধিরও প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ক্ষতিপূরণ দেওয়া, অবেহলা করা প্রভৃতির জন্য সুবিচারের আইন প্রণয়নেরও প্রয়োজন পড়ে। যার মাধ্যমে যুলুম, বাড়াবাড়ি বা অনধিকার চর্চা, হিংসা-বিদ্বেষ, ফাসাদ বা বিশৃংখলা এবং খোদার প্রতি গাফলতি বা অবহেলাকে প্রতিরোধ করা যায়, যাতে করে জগতের শৃংখলার মধ্যে কোনপ্রকার ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়। কেননা, জীবনযাপন এবং যাবতীয় সামাজিক দায়িত্ব পালন সম্পূর্ণ নির্ভর করে সুবিচার ও খোদাকে চেনার উপর। এবং সুবিচারের প্রয়োগ ব্যবস্থা এবং খোদাকে জানা ও মানার জন্য একটা আইন পদ্ধতিরও প্রয়োজন, যার মধ্যে সুবিচারের সূক্ষ্মতত্ত্ব এবং ঐশী-জ্ঞানের সূক্ষ্ম সত্যতা সব বর্ণিত থাকবে। এবং যার মধ্যে কোন প্রকারের যুলুম বা অন্যায় থাকবে না, থাকবে না কোন প্রকার ভুল-ভ্রান্তি। এবং এই ধরনের আইন কেবল তাঁরই পক্ষ থেকে প্রবর্তিত হওয়া সম্ভব যার সত্তা সম্পূর্ণরূপে বিকৃতি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি ও যুলুম অন্যায় ও বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত, পবিত্র। এবং সেই সঙ্গে তার সত্তা হবে আনুগত্য লাভের অধিকারী এবং সম্মান ও শ্রদ্ধা-ভক্তিলাভের অধিকারী। কেননা, কোন আইন উৎকৃষ্ট হলেও, তার প্রবর্তনকারী যদি এমন না হন যে, তিনি তাঁর পদমর্যাদার ছোট বড় সকলের উপরে অধিষ্ঠিত থাকবেন এবং সবাইকে শাসন করবার অধিকার রাখবেন ; এবং জনসাধারণের চোখে যদি তিনি এমন না হন যে, তিনি সর্বপ্রকারের যুলুম-অবিচার করা থেকে, অপরাধ ও ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত ও পবিত্র ; তাহলে এই আইন কার্যকর হতে পারবে না, এবং তা চলবে না। আর যদি কিছুদিন চলেও তাহলে দিন কয়েকের মধ্যেই এর মধ্যে থেকে থেকেই নানা বিশৃংখলা দেখা দিতে থাকবে। পরিণামে মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গলের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এই সমস্ত কারণে প্রয়োজন দেখা দেয় কেতাবে ইলাহী বা ঐশীগ্রন্থের। কেননা, যাবতীয় সদ্‌গুণাবলী এবং প্রত্যেক প্রকারের ঔৎকর্ষ ও সৌন্দর্য এক মাত্র খোদাতায়ালার কেতাবেই পাওয়া যায়, অন্য কোথাও নয়।

দ্বিতীয় এক প্রজ্ঞা রয়েছে মর্তবা বা স্তরসমূহের পার্থক্যের মধ্যে, যাতে করে সৎ ও পবিত্র লোকদের উৎকর্ষতা প্রদর্শিত হতে পারে। কেননা, প্রত্যেক উৎকর্ষতাই প্রতিপন্ন হয় পরস্পর তুলনা বা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। যেমন বলা হয়েছে ঃ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ⑦

('যা কিছু ভূ-পৃষ্ঠে আছে তা আমরা নিশ্চয়ই এর সৌন্দর্যের জন্য সৃষ্টি করেছি, যাতে আমরা তাদেরকে পরীক্ষা করতে পারি যে, কে তাদের মধ্যে কর্মের ক্ষেত্রে অধিক উৎকৃষ্ট।'–১৮ঃ৮)।

অর্থাৎ, আমরা প্রত্যেকটি জিনিষকে যা যমীনের উপরে বিদ্যমান, তা যমীনের অলংকারস্বরূপ সৃষ্টি করেছি। যাতে করে, যারা সৎ বা সালেহ্ ব্যক্তি তাদের সাধুতা অসাধুলোকদের মোকাবেলায় প্রদর্শিত হতে পারে। এবং যা স্থূল তা দেখে, যা সূক্ষ্ম তার সূক্ষ্মতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কেননা, তারতম্যকে জানা যায় তারতম্যকে সনাক্ত করার মাধ্যমেই, এবং উত্তম-এর মূল্যায়ন করা যায় অধম-এর সঙ্গে তুলনা করেই।

তৃতীয় প্রকারের প্রজ্ঞা বা হেকমত, যা স্তরসমূহের পার্থক্যের মধ্যে নিহিত রয়েছে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিভিন্ন প্রকারের শক্তিকে প্রদর্শিত করা এবং আপনার (খোদার) মাহাত্ম্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা। যেমন বলা হয়েছে ঃ

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا ﴿١٤﴾ وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا ﴿١٥﴾

('তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে মহত্ত্ব ও প্রজ্ঞার আশা রাখ না ? তিনি তোমাদেরকে (ক্রমবিকাশের ধারায়) বিভিন্ন আকার এবং অবস্থার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।' – ৭১ঃ১৪,১৫)

অর্থাৎ, বিভিন্ন প্রকারের বৈশিষ্ট্য বা যোগ্যতা এবং প্রকৃতি প্রজ্ঞাময় খোদাতায়ালা এই উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন যেন তাঁর মাহাত্ম্য ও শক্তির বা কুদরতের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى بَطْنِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰٓى اَرْبَعٍ ؕ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤٦﴾

('আল্লাহ্ সকল প্রাণীকে সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে। ওদের মধ্যে কতক এমন আছে যারা পেটের উপর ভর দিয়ে চলে, তাদের কতক এমন আছে যারা দু'পায়ের উপর ভর দিয়ে চলে, এবং তাদের কতক এমনও আছে যারা চার পায়ের উপর ভর দিয়ে চলে। আল্লাহ্ যা চান সৃষ্টি করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপরে সর্বশক্তিমান।' – ২৪ঃ৪৬)

এখানেও এই কথার দিকে ইশারা করা হয়েছে যে, খোদাতায়ালা এই বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণী এজন্যই সৃষ্টি করেছেন, যেন এর মাধ্যমে তাঁর বিভিন্ন শক্তি, কুদরত প্রদর্শিত হয়। বস্তুতঃ, গতি-প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য, যা সৃষ্টির স্বভাবে অভিব্যক্তি, তার মধ্যে ঐশীপ্রজ্ঞার এই তিনটি বিষয় নিহিত রয়েছে, এবং তা-ই বলা হয়েছে উপর্যুক্ত আয়াতসমূহে'। - (বারাহীনে আহমদীয়া, পৃ. ১৯৩–১৯৭, পাদটীকা–১১)

'পণ্ডিত দয়ানন্দ তাঁর 'সিদ্ধার্থ প্রকাশ' উর্দু পুস্তকটির ৫০১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, পরমেশ্বর কারও পাপ ক্ষমা করতে পারেন না, করলে তিনি অবিচার করার দোষে দায়ী হবেন। অতএব, তিনি এটাই মেনে নিয়েছেন যে, পরমেশ্বর হচ্ছেন মাত্র একজন জজ্ বা বিচারকের ন্যায়, মালিকের এখতিয়ার তাঁর নেই। একইভাবে, পণ্ডিত দয়ানন্দ তাঁর পুস্তকের ঐ ৫০১ পৃষ্ঠাতেই লিখেছেন যে, পরমেশ্বর সীমিত কাজের জন্য সীমাহীন পুরস্কারও দিতে পারেন না। কাজেই এতে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তিনি (পরমেশ্বর) যদি মালিক-এর এখতিয়ারই রাখতেন, তাহলে তো সীমিত কাজের জন্য সীমাহীন পুরস্কার দিতেও তাঁর কোন কুণ্ঠাই থাকতো না। কেননা, মালিকের কাজকর্মের সঙ্গে সুবিচার-অবিচারের কোন সম্পর্ক থাকে না। আমরাও যদি কোন মাল-সম্পত্তির মালিক হিসেবে প্রার্থীদেরকে কিছু দান করতে চাই, সেক্ষেত্রেও, কোনও প্রার্থীর এরূপ কোন অধিকার থাকে না যে, সে আপত্তি উত্থাপন করে বলবে যে, অমুক ব্যক্তিকে বেশী দেওয়া হয়েছে, অথচ আমাকে কম দেওয়া হয়েছে। একইভাবে, খোদাতায়ালার কাছে কোন বান্দার এই অধিকার নেই যে, সে তাঁর কাছে সুবিচারের দাবী করে। বান্দার অবস্থা বান্দার এবং খোদার অবস্থা খোদার। কাজেই বান্দার যেমন অধিকার নেই যে, সে খোদাতায়ালার বিরুদ্ধে ন্যায্য বিচারের দাবী উত্থাপন করে, তেমনি খোদাতায়ালার এটা মর্যাদা-বিরোধী যে, তিনি তাঁর সৃষ্টির এই মর্যাদা স্বীকার করে নিবেন যে, লোকেরা তাদের অধিকার তাঁর কাছ থেকে আদায় করে নিবে। বস্তুতঃ খোদা তাঁর বান্দাদেরকে তাদের কাজের জন্য যা কিছু পুরস্কার দিয়ে থাকেন, তা স্রেফ তাঁর কৃপা, তাঁর দয়ার দান। আমল বা কর্ম কোন ব্যাপারই নয়। খোদার সাহায্য ও কৃপা ছাড়া কোন কর্মই তো কখনও সাধিত হতে পারে না। এছাড়া, আমরা যখন খোদার কানুনে কুদরত বা প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি যে, খোদাতায়ালা তাঁর বান্দার জন্য যা কিছু সরবরাহ করেছেন বা করে থাকেন, তা দু'প্রকারের দান ঃ

এক তো হচ্ছে, তাঁর সেই সকল কৃপা ও দান যা মানুষ অস্তিত্বে আসার পূর্বেই দিয়ে রাখা হয়েছে, এবং সেগুলোর মধ্যে মানুষের কর্মের বা আমলের সামান্যতমও কোন দখল নেই। যেমন, তিনি মানুষের আরামের জন্য সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, যমীন, পানি, হাওয়া, অগ্নি ইত্যাদি সৃষ্টি করে রেখেছেন। এবং এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ সমস্ত কিছুই সৃষ্টি হয়েছে মানব সৃষ্টির পূর্বেই। এবং মানুষ অস্তিত্ব লাভ করেছে ঐ সমস্ত বস্তুর অস্তিত্ব লাভের পর। এ হচ্ছে খোদাতায়ালার সেই শ্রেণীর রহমত যাকে কোরআনী বাগ্‌ধারায় বলা হয়েছে **'রহমানিয়্যত'**। অর্থাৎ, এমন সব দান যার সম্পর্ক বান্দার আমলের সঙ্গে নয়, বরং তা দান করা হয়েছে স্রেফ কৃপাভরে।

দ্বিতীয় প্রকারের রহমত হচ্ছে, সেই রহমত যাকে কোরআনী বাগ্‌ধারায় বলা হয়েছে '**রহীমিয়্যত**'। অর্থাৎ, সেই সকল কৃপা ও দান, যা মানুষের নাম মাত্র সৎকর্মের জন্য প্রদান করা হয়। অতএব, যে খোদা তাঁর কৃপাভরা মালিকত্বের এই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছেন যে, তিনি তাঁর দুর্বল বান্দাদের জন্য যমীন ও আসমান, চন্দ্র ও সূর্য ইত্যাদি সৃষ্টি করে রেখেছেন সেই সময়ে যখন বান্দা এবং তার কর্মের কোন নাম-নিশানাও ছিল না ; তাঁর সম্পর্কে কি এই ধারণা পোষণ করা যায় যে, তিনি এক গ্রহীতার ন্যায় তাঁর বান্দাদের শুধু পাওনা হক্ আদায় করে থাকেন, তার বেশী কিছু নয় ? বান্দাদের কি এমন কোন হক্ ছিল যে, তাদের জন্য তিনি যমীন ও আসমান বানাবেন এবং আসমানে হাজারো উজ্জ্বল বস্তু এবং যমীনে তাদের আরাম ও আয়েশের জন্য হাজারো বস্তু সৃষ্টি করে রাখবেন ? সুতরাং, সেই পরম কৃপাময়, দয়াময়কে মাত্র একজন জজ্ বা বিচারকের ন্যায় বিচারকারী মনে করা, এবং তাঁর মালিকত্বের মর্যাদা ও মহিমাকে অস্বীকার করাটা চরম অকৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কি?' – (চশমা মা'রেফত, পৃ. ১৮–২০)

(৪২)

'স্মর্তব্য যে, **মালিক** শব্দটি এমন একটি শব্দ যার মোকাবেলায় কোন অধিকারই টিকে না। এবং চরম বা সামগ্রিক ও পরিপূর্ণ অর্থে এই শব্দটি প্রযোজ্য হতে পারে কেবল খোদার জন্যই। কেননা, চরম মালিক একমাত্র তিনিই। কোন ব্যক্তি যদি অপর কোন ব্যক্তিকে তার জান ও মাল ইত্যাদির মালিক সাব্যস্ত করে, তাহলে সে স্বীকার করে নেয় যে, তার জান ও মাল ইত্যাদির উপরে তার নিজের কোন হক্ বা অধিকার নেই। তার নিজের বলতে কিছুই নেই, সব মালিকের। এমতাবস্থায় নিজের মালিককে এই কথা বলা তার পক্ষে অবৈধ হবে যে, অমুক মাল বা জীবন সম্পর্কিত অমুক ব্যাপারে তুমি আমার প্রতি সুবিচার কর। কেননা, সুবিচার তো বর্তায় অধিকারের ক্ষেত্রে, অথচ সে তার তাবৎ অধিকার বিসর্জন দিয়ে রেখেছে।

একইভাবে, যে মানুষ তার প্রকৃত মালিকের সামনে নিজেকে বান্দা বলে স্বীকার করেছে এবং 'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন' অঙ্গীকার করেছে, অর্থাৎ আমার জান, মাল, শরীর, সন্তান সব কিছুরই মালিক খোদাতায়ালা বলে অঙ্গীকার করেছে ; অতঃপর সেই মানুষের এমন আর কোন অধিকার থাকে না, যা সে দাবী করতে পারে খোদাতায়ালার কাছে। এ কারণেই ঐ সমস্ত মানুষ, যাঁরা সত্যিকারভাবেই আরেফ বা সূক্ষ্মদর্শী তাঁরা শতপ্রকারের সংগ্রাম বা মুজাহেদাত এবং এবাদত এবং দান-খয়রাত করার পরেও নিজেদেরকে খোদাতায়ালার কৃপার উপরে ছেড়ে দেন এবং নিজেদের কর্ম বা আমলসমূহকে কিছুই মনে করেন না। এবং কোন দাবীও করেন না যে, আমাদের এই হক্ বা

অধিকার রয়েছে, অথবা আমাদের এই অধিকার জন্মেছে। কেননা, সত্যিকার অর্থে সৎ তো সেই-ই যার কাছ থেকে সামর্থ্য লাভ করে মানুষ সৎকাজ করতে পারে, এবং সে তো একমাত্র খোদা-ই। অতএব, মানুষ তার নিজস্ব যোগ্যতা ও কৃতিত্বের কারণে খোদাতায়ালার কাছে কখনই সুবিচার বা ইন্‌সাফ দাবী করতে পারে না। কোরআন শরীফের দৃষ্টিতে খোদার সকল কাজই মালিকত্বের অন্তর্ভুক্ত। যেভাবে তিনি কখনো পাপের শাস্তি দেন, সেভাবেই তিনি কখনো পাপ ক্ষমাও করে দেন। অর্থাৎ, উভয়ক্ষেত্রে তাঁর শক্তি বা কুদরত কার্যকর। এবং তা কার্যকর হয় তাঁর **মালিকিয়্যত**'-এর চাহিদা অনুযায়ী। আর যদি তিনি সব সময়েই পাপের শাস্তি দিতে থাকেন, তাহলে তো আর মানুষের কোন পাত্তাই থাকবে না। বরং অধিকাংশ গোনাহ্-ই তিনি মাফ করে দেন। তবে, সতর্ক করার জন্য কখনও কখনও কোন কোন পাপের শাস্তিও দেন, যাতে করে গাফেল মানুষ সতর্ক হয়ে তাঁর প্রতি মনেযোগী হয়। যেমন, কোরআন শরীফে বলা হয়েছে ঃ

وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا۟ عَن كَثِيرٍ ۝٣١

'এবং তোমাদের উপর যে সব বিপদ-আপদ নিপতিত হয়, তা তোমাদের (অসৎ) কৃতকর্মের কারণে, এবং তোমাদের বহু অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেন' ৪২ঃ৩১। আবার, এই সূরাতেই অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ

('এবং তিনিই তো নিজ বান্দাগণের তওবা কবুল করেন এবং পাপসমূহ ক্ষমা করেন' .... ৪২ঃ২৬)। অর্থাৎ, তোমাদের খোদা তো সেই খোদা যিনি তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং পাপসমূহ ক্ষমা করে দেন। কেউ যেন এই ধোঁকায় না পড়ে যে, কোরআন শরীফে এই কথাও তো বলা হয়েছে ঃ

وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝٩

('এবং কোন ব্যক্তি এক অণু-পরমাণুও অশুভ বা মন্দ কর্ম করে থাকলে সে তা দেখতে পাবে।' –৯৯ঃ৯)। অর্থাৎ, কোন ব্যক্তি এক জর্রা পরিমাণ অশুভ কাজ করলেও সে তার শাস্তি পাবে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, উক্ত আয়াতে এবং এই দ্বিতীয় আয়াতের মধ্যে কোন স্ববিরোধিতা নেই। কেননা, এই (পরবর্তী আয়াতে উল্লেখিত) পাপের দ্বারা সেই পাপকে বুঝানো হয়েছে, যার উপরে মানুষ লেগে থাকে এবং যা সম্পাদন করা থেকে বিরত হয় না, এবং তওবা করে না। এবং এ কারণেই এক্ষেত্রে শার্র, (অশুভ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, 'জুনুব' (পাপ) শব্দ ব্যবহার করা হয় নি। যাতে করে বুঝা যায় যে, এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন কোন অশুভ কাজ, যা থেকে দুষ্কৃতকারী বিরত হতে চায় না। বস্তুতঃ সারা কোরআন শরীফ তো এই কথায় ভরপুর যে, আত্মশুদ্ধি, অনুতাপ, মন্দকাজ পরিহার এবং ইস্তেগফার ও ক্ষমা-প্রার্থনা দ্বারা পাপ মাফ হয়ে যায়। বরং

খোদাতায়ালা অনুতাপকারীদেরকে ভালবাসেন। যেমন, আল্লাহ্‌তায়ালা কোরআন শরীফে বলেছেন ঃ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ

('নিশ্চয় আল্লাহ্ তওবাকারীগণকে ভালবাসেন এবং পবিত্রতা রক্ষাকারী-গণকেও ভালবাসেন, – ২ঃ২২৩)

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌তায়ালা অনুতাপকারীদের ভালবাসেন এবং এছাড়া ঐ সমস্ত লোকদেরকেও ভালবাসেন যারা এই বিষয়ে জোর দেয় যে, যে করেই হোক পাপ থেকে পবিত্র হতে হবে। সংক্ষেপে, পাপ বা বদকাজের জন্য শাস্তি দেওয়ার যে গুণ, তা খোদা'তায়ালার ক্ষমাশীলতা ও সহিষ্ণুতার যে গুণ, তার বিপরীত। কেননা, তিনি তো মালিক, তিনি তো কোন ম্যাজিস্ট্রেট নন। তিনি তো কোরআন শরীফের প্রথম সূরাতেই বলে দিয়েছেন যে, তাঁর নাম 'মালিক'। এবং বলেছেন ঃ **'মালিকে ইয়াওমেদ্দীন'**। অর্থাৎ খোদাতায়ালা পুরস্কার ও শাস্তি দান করার মালিক। এবং এটা তো জানা কথাই যে, কোন মালিকই মালিক হওয়ার দাবী করতে পারেন না, যতক্ষণ না তিনি উভয়ক্ষেত্রে পূর্ণ এখতিয়ার রাখেন। অর্থাৎ, চাইলে তিনি ধরতে পারেন, চাইলে ছেড়ে দিতে পারেন।' – (চশমা মা'রেফত, পৃ. ১৫, ১৬)

(৪৩)

'আবার আমরা আসল বিষয়ের দিকে দৃষ্টি ফিরায়ে লিখতে চাই যে, আর্যদের মতাদর্শ অনুসারে তাদের পরমেশ্বরকে 'মালিক' বলা যাবে না। কেননা, তাঁর কাছে যা আছে তাতে তিনি এই শক্তি বা কুদরত রাখেন না যে, অধিকার না জন্মালেও কাউকে তিনি কোন কিছু কৃপা করে পুরস্কারস্বরূপ দান করতে পারেন। কিন্তু আমরা তো দেখি যে, কোন ব্যক্তি যদি কোন সম্পদের মালিক হয়, তবে সে এই এখতিয়ার রাখে যে, সে যাকে চাহে যতটুকু চাহে দিয়ে দিতে পারে। কিন্তু, পরমেশ্বর সম্পর্কে আর্যদের বিশ্বাস হলো, না তিনি পাপ ক্ষমা করতে পারেন, না কাউকে কোন কিছু উপহারস্বরূপ বা দানস্বরূপ দিতে পারেন। আর যদি তিনি কখনও এরূপ করেন, তবে তাঁর প্রতি বেইনসাফীর অভিযোগ আরোপিত হবে। **সুতরাং, জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসীরা একথা কোনভাবেই বলতে পারে না যে, পরমেশ্বর এই সৃষ্টির মালিক**। এ কথা তো আমরা কয়েকবার লিখেছি যে, মালিক-এর উপরে সুবিচারের বাধ্যবাধকতা আরোপ করাটা সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক। তবে, হ্যাঁ, আমরা মালিকের উত্তম গুণাবলীর প্রেক্ষিতে একথা বলতে পারি যে, তিনি 'রহীম' তিনি দাতা, তিনি মহানুভব এবং তিনি পাপ ক্ষমাকারী। কিন্তু, একথা বলতে পারি না যে, তিনি তাঁর খরিদা গোলাম, ঘোড়া ও গরু-মহিষের প্রতি সুবিচার বা ইনসাফকারী। কেননা, ইনসাফ বা সুবিচার কথাটি কেবল সেক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে, যেক্ষেত্রে উভয়পক্ষই একপ্রকার স্বাধীনতা ভোগ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমরা পার্থিব সম্রাটদের সম্পর্কে বলতে পারি যে, তাঁরা মুন্সেফ বা সুবিচারকারী এবং তাঁরা তাঁদের প্রজাদের সঙ্গে ইনসাফের সঙ্গে

আচরণ করে থাকেন। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত প্রজারা তাঁর আনুগত্য করে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইনসাফের আইন তাঁর প্রতি এই বাধ্যবাধকতা আরোপ করে যে, তিনিও প্রজাকুলের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করবেন এবং তাদের খাজানা ও কর দান সাপেক্ষে তাদের জান ও মালের পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করবেন, এবং প্রয়োজনের সময় নিজের সম্পদ থেকে তাদেরকে সাহায্য করবেন। অতএব, একদিক থেকে সম্রাটরা তাঁদের প্রজাবর্গের উপরে হুকুম চালান, অপরদিক থেকে প্রজাগণও সম্রাটদের উপরে তাদের হুকুম চালায়। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এই উভয় অবস্থা সুষ্ঠু ও সমন্বিতভাবে কার্যকরী থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত সেই দেশে শান্তি থাকবে। এবং যখনই কোন পক্ষ থেকে – তা সে সম্রাটের পক্ষ থেকেই হোক, আর প্রজাদের পক্ষ থেকেই হোক – উক্ত সমন্বয় সাধনে ব্যর্থতা প্রদর্শন করা হবে, তখনই দেশ থেকে শান্তি তিরোহিত হয়ে যাবে। এখেকেই এটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠছে যে, আমরা রাজা-বাদশাহ্‌দেরকে প্রকৃত অর্থে অর্থাৎ হাকীকিভাবে 'মালিক' বলতে পারি না। কেননা, তাঁদের যেমন প্রজাদের প্রতি বাধ্যবাধকতা রয়েছে ইনসাফের, তেমনি প্রজাদেরও বাধ্যবাধকতা রয়েছে তাঁদের প্রতি ইনসাফের। কিন্তু, আমরা খোদাকে তাঁর 'মালিকিয়্যত' বা মালিকত্বের কারণে 'রহীম' তো বলতে পারি, কিন্তু মুন্সেফ বা বিচারক বলতে পারি না। **কোন বিক্রীত ব্যক্তি তার মালিকের কাছে ইনসাফ দাবী করতে পারে না।** তবে, সে বিনয় করে, কাকুতি-মিনতি করে তার মালিকের কাছে রহম বা দয়া ভিক্ষা চাইতে পারে। এ কারণেই, খোদাতায়ালা সারা কোরআন শরীফে নিজের নাম মুন্সেফ রাখেননি। কেননা, ইনসাফ-এর চাহিদা হচ্ছে উভয় পক্ষের সমতা। অবশ্য খোদাতায়ালাকে একভাবে মুন্সেফ বলা যায়, এবং তা হচ্ছে, তিনি বান্দাগণের পরস্পরের মধ্যে তাদের অধিকারের ব্যাপারে সুবিচার করে থাকেন। কিন্তু, তিনি এই অর্থে মুন্সেফ নন যে, কোন বান্দা অংশীদারের ন্যায় তার অধিকার দাবী করবে তাঁর কাছে। কেননা, বান্দা তো খোদার মালিকানার অধীন। এবং তাঁর এই এখ্‌তিয়ার রয়েছে যে, তিনি যেমন চাইবেন তেমন আচরণ করবেন তাঁর মালিকানাধীন বান্দার সঙ্গে। যাকে খুশী বাদশাহ্‌ বানাবেন, যাকে খুশী ফকীর বানাবেন। এবং যাকে খুশী অল্প বয়সে মৃত্যু দিবেন, যাকে খুশী দীর্ঘায়ু দান করবেন। এবং আমরাও তো যখন কোন সম্পদের মালিক হয়ে যাই, তখন সেই সম্পদের ব্যাপারে পুরোপুরি স্বাধীন হয়ে যাই। হ্যাঁ, খোদা 'রহীম' এবং তিনি 'আরহামুর রহেমীন'। তিনি কোন ইনসাফ করার বাধ্যকতার জন্য নয়, বরং আপনার রহম-এর চাহিদাতেই তাঁর সৃষ্টিকে প্রতিপালন করেন। কেননা, আমরা বারবার বলেছি যে, মালিক-এর বৈশিষ্ট্য এবং মুন্সেফ বা বিচারক-এর বৈশিষ্ট্য পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আমরা যখন তাঁর দ্বারাই সৃষ্ট, তখন আমাদের কি অধিকার রয়েছে যে, আমরা তাঁর কাছে ইনসাফের দাবী ওঠাই ? হ্যাঁ, অত্যন্ত বিনয় সহকারে তাঁর রহম-এর জন্য অবশ্যই প্রার্থনা জানাতে পারি। এটা বান্দার পক্ষে অতিশয় বজ্জাতি হবে, যদি সে খোদার কাছে তাঁর বান্দার ব্যাপারে সম্পাদিত কাজকর্ম সম্পর্কে সুবিচারের দাবী

তোলে। মানব-প্রকৃতির সমস্ত কিছুই যখন খোদাতায়ালার তরফ থেকেই, এবং তার সকল শক্তি-তা সে আত্মিক হোক, আর দৈহিক হোক – সবই তাঁর দান এবং তাঁরই দেওয়া সামর্থ্য ও সাহায্য দ্বারা প্রত্যেকটি সৎকাজ সম্পাদিত হয়, তখন নিজের আমলের বা কর্মের উপরে ভরসা করে তাঁর কাছে সুবিচারের দাবী করাটা কঠিন বেঈমানী ও মুর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এবং এইরূপ শিক্ষাকে আমরা প্রকৃত জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা বলতে পারি না। বরং এইরূপ শিক্ষা প্রকৃত জ্ঞান থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। এবং তা স্রেফ নির্বুদ্ধিতা দ্বারা পরিপূর্ণ। তাই, খোদাতায়ালা তাঁর পবিত্র গ্রন্থ কোরআন শরীফে আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, বান্দার মোকাবেলায় খোদাকে মুন্সেফ বা বিচারক বলাটা শুধু পাপই নয়, বরং তা পরিষ্কার কুফরী।' – (চশমা মা'রেফত, পৃ. ২৪–২৬)

(৪৪)

'এই যে, এক কুধারণা বা ওয়াছওয়াছা যে, আদল ও রহম–বিচার ও দয়া – এই উভয় গুণ খোদাতায়ালার সত্তার মধ্যে একত্রে অবস্থান করতে পারে না। কারণ, বিচার-এর চাহিদা হচ্ছে শাস্তিদান, পক্ষান্তরে দয়া-এর চাহিদা হচ্ছে সহিষ্ণুতা ও কোমলতা। এ এক এমন ধোঁকা যার মধ্যে যথার্থ উপলব্ধির অভাবে অদূরদর্শী খৃষ্টানরা সবাই নিপতিত। তারা এটা চিন্তা করে না যে, খোদাতায়ালার বিচারও এক প্রকার দয়া। কেননা, এর সাকল্যটাই মানব-কল্যাণের জন্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ, খোদাতায়ালা যদি এক খুনীকে আদল-এর খাতিরে মেরে ফেলার হুকুম দেন, এতে তাঁর উলুহিয়্যত বা খোদায়ীত্বের কোন ফায়দা হবে না, বরং তিনি এটা এজন্যই চাইবেন যে, মানবজাতি যেন একে অপরকে মেরে মেরে শেষ হয়ে না যায়। এ তো মানব-জাতির জন্য এক প্রকার 'রহম'। এবং বান্দাগণের এই সমস্ত অধিকার খোদাতায়ালা এজন্যই কায়েম করেছেন যেন এতদ্দ্বারা শান্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে, এবং যেন একদল অন্যদলের উপরে যুলুম করে পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি না করে। সুতরাং, সমস্ত হক্ বা অধিকার এবং শাস্তি যা জান, মাল, মান-ইজ্জত ইত্যাদি সম্পর্কে নির্ধারিত করা হয়েছে তা সবই মানব জাতির প্রতি এক 'রহম' . . . . . অতএব, আদল ও রহম-এর মধ্যে কোনও সংঘর্ষ নেই। এরা যেমন দু'টি নদী, দু'টি পৃথক পৃথক ধারায় সমান্তরালভাবে প্রবাহিত, এবং একটা অপরটার গতিতে কোনও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। পৃথিবীর রাষ্ট্র-সমূহেও এটাই দেখা যায়। যে ব্যক্তি অপরাধী সে সাজাপ্রাপ্ত হয়, পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার উত্তম কাজের দ্বারা সরকারকে খুশী করে সে সম্মান ও পুরস্কার লাভ করে।

এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, খোদাতায়ালার আসল গুণ হচ্ছে 'রহম'। এবং আদল বা বিচার - এর অবস্থা সৃষ্টি হয় যুক্তি ও কানুন প্রতিষ্ঠার পর। প্রকৃত প্রস্তাবে, এটাও এক প্রকার রহম যা কিনা প্রকাশ পায় ভিন্ন আকারে। যখন কোন

মানুষকে আকল্‌ বা যুক্তিবুদ্ধি দান করা হয় এবং সেই যুক্তি-বুদ্ধি দ্বারা সে খোদাতায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত সীমাসমূহ বা 'হদুদ' এবং আইনসমূহ সম্পর্কে অবগত হয়, তখন এই অবস্থায় সে আদল বা সুবিচার-এর কার্যকারিতার অধীন হয়ে পড়ে। কিন্তু রহম-এর জন্য আকল্‌ বা আইন-এর কোন শর্ত নেই। এবং যেহেতু, খোদাতায়ালা রহম বা দয়া করে মানুষকে সর্বাপেক্ষা বেশী ফযিলত বা শ্রেষ্ঠত্ব ও ঔৎকর্ষ দিতে চেয়েছেন, সেহেতু মানুষের জন্য বিচার-এর কানুন ও হদুদ বা আইন ও সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং আদল ও রহম – বিচার ও দয়া–কে পরস্পর বিরোধী মনে করাটা নিতান্তই মূর্খতা'। – (কিতাবুল বারিয়াহ্‌, পৃ. ৭৩, ৭৪)

(৪৫)

'এ এক অতি সূক্ষ্ম সত্যতা বা সাদাকাত সম্পর্কিত প্রশ্ন যে, খোদাতায়ালার জ্ঞান – যা কিনা পরিপূর্ণতার কারণে সকল প্রকাশ্য ও গোপন অণু-পরমাণু সম্পর্কে অবগত ও সতর্ক থাকছে – তা কি করে এবং কীভাবে সম্ভব হচ্ছে ? যদিও তার আসল কৈফিয়ৎ বা প্রকৃত অবস্থা সামগ্রিকভাবে যুক্তি-বুদ্ধি দ্বারা অনুধাবন করা সম্ভব নয়, তবু একথা বললে পুরোপুরি সত্যই বলা হবে যে, ঐ জ্ঞান সকল প্রকারের উপলব্ধ জ্ঞানের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী, উত্তম এবং পূর্ণ। যখন, আমরা আমাদের জ্ঞান আহরণের পদ্ধতিগুলির উপর দৃষ্টিপাত করি, এবং সেগুলির প্রকার ভেদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করি, তখন আমাদের কাছে আমাদের যাবতীয় সাধারণ বা মামুলী জ্ঞানের মধ্যে সেই জ্ঞানকেই সব চাইতে উন্নত, নিশ্চিত ও নিরংকুশ বলে মনে হয়, যা আমাদের অস্তিত্ব সম্পর্কিত। কেননা, আমরা কোন একজন মানুষও কোন অবস্থাতেই নিজস্ব অস্তিত্বকে না ভুলে যেতে পারি, না এর প্রতি কোন সংশয় বা সন্দেহ পোষণ করতে পারি। সুতরাং, আমাদের আক্‌ল বা যুক্তি-বুদ্ধির বিস্তার যতটা, ততটাই আমরা দেখতে পাই যে, এই প্রকারের জ্ঞানই হচ্ছে অধিকতর উন্নত, নিশ্চিত, নিরংকুশ বা পরিপূর্ণ। এবং এটা খোদাতায়ালার পূর্ণ ও পারফেক্ট সত্তার সঙ্গে সম্পূর্ণ অসঙ্গতিপূর্ণ যে, এক্ষেত্রে তাঁর জ্ঞান তাঁর বান্দাদের জ্ঞানের চাইতে কম হবে। কেননা, একথা কখনই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না যে, যে সর্বোত্তম জ্ঞান মানবচিত্তে আহূত হতে পারে, তা খোদাতায়ালার মধ্যে পাওয়া যাবে না। তাছাড়া এই আপত্তিও উঠতে পারবে যে, কি-ই বা এমন সেই কারণটা, যে জন্য খোদাতায়ালার জ্ঞান সর্বোন্নত স্তরের জ্ঞানের চাইতে কম হতে হবে ? এটা কি তাঁর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, না তাঁর কোন বাধ্যবাধকতার কারণে ? যদি বল যে, এটা তাঁর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, তাহলে তা গ্রাহ্য হবে না। কেননা, কেউই তো স্বেচ্ছাকৃতভাবে তার নিজের ক্ষতিসাধন করে না। তাহলে, সেক্ষেত্রে, খোদাতায়ালা–যিনি স্বয়ং পূর্ণ ও পারফেক্ট সত্তার অধিকারী, তিনি কী করে এই জাতীয় ক্ষতি বা অপূর্ণতা নিজের প্রতি আরোপ করতে পারেন ? আর যদি বল যে, কোন বাধ্যবাধকতার কারণে এই ক্ষতি সম্ভব

হয়েছে। তাহলে তো এটাও সম্ভব হতে পারবে যে, এই শ্রেণীর বাধ্যবাধকতা খোদাতালার শক্তি ও ক্ষমতার উপরে বিজয় লাভ করবে এবং খোদাকে তাঁর ইচ্ছা–এরাদার ক্ষেত্রেও প্রতিহত করবে। কিন্তু, এটা আদতেই অসম্ভব। কেননা, খোদাতায়ালার উপরে এমন আর কোন বাধ্যবাধকতা আরোপকারী (কোন সুপ্রীম সত্তা) কেউ নেই যার বাধা দানের দরুণ তিনি মজবুর বা অপারগ হয়ে পড়বেন। অতএব, প্রমাণিত সত্য এটাই যে, খোদাতায়ালার জ্ঞান অবশ্যই পরিপূর্ণ ও নিরংকুশ ও কামেল। এবং আমরা প্রথমেই প্রমাণ করে এসেছি যে, জ্ঞানের যাবতীয় প্রকারভেদের মধ্যে নিরংকুশ ও পূর্ণ-কামেল হচ্ছে সেই জ্ঞান, যাকে এমন হতে হবে যে, তা হবে মানুষের আপন অস্তিত্ব সম্পর্কিত জ্ঞানের ন্যায়। সুতরাং, মানতেই হবে যে, খোদাতায়ালার জ্ঞান তাঁর সৃষ্টির ক্ষেত্রে এমন এক জ্ঞানের অনুরূপ, যার আসল পরিচয় বা বৈশিষ্ট্য যদিও আমরা সামগ্রিকভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম নই, তবু আমরা আমাদের বুদ্ধি-আকল্ দ্বারা, অনুধাবনের সমস্যা সত্ত্বেও, এতটুকু বুঝতে পারি যে, **সেটাই হচ্ছে সর্বোত্তমরূপে বিশুদ্ধ ও নিশ্চিত জ্ঞান, যেক্ষেত্রে জ্ঞানী ও জ্ঞাতব্যের মধ্যে কোন প্রকার বাধা বা পর্দা থাকবে না**। অতএব, এটাই হচ্ছে সেই প্রকারের জ্ঞান। এবং যেভাবে, একজন মানুষকে তার অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য অন্য কোন মাধ্যমের প্রয়োজন পড়ে না, বরং প্রাণধারী হওয়া এবং নিজের সত্তাকে প্রাণধারী জানা, এই উভয় বিষয়ই পরস্পর এত ওতঃপ্রোতভাবে একস্থিত যে, এর মধ্যে এক চুল পরিমাণও তফাৎ নেই। অতএব, এমনটিই হওয়া উচিত সমগ্র সৃষ্টি সম্পর্কে খোদাতায়ালার জ্ঞান। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও জ্ঞানী ও জ্ঞাতব্যের মধ্যে এক অণু পরিমাণও পার্থক্য ও দূরত্ব থাকতে পারবে না। এই উচ্চ স্তরের জ্ঞান, যা কিনা খোদাতায়ালার খোদায়ী প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই প্রয়োজন, তা কেবল সেই অবস্থাতেই তাঁর জন্য প্রযোজ্য হতে পারে, যখন প্রথমে তাঁর সম্পর্কে এটা স্বীকার করে নেওয়া হবে যে, তাঁর মধ্যে এবং তাঁর জ্ঞাতব্যের মধ্যে এরূপ নৈকট্য ও নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান যে, তার চাইতে বেশী আর কল্পনা করাও অসম্ভব। এবং জ্ঞাতব্যের সঙ্গে এই অবিচ্ছেদ্য নিবিড় সম্পর্ক তাঁর সঙ্গে কেবল সেই অবস্থায় হতে পারে যখন জ্ঞানীর সমস্ত জিনিসই–যা তাঁর জ্ঞতব্যের আওতাভুক্ত–তা সবই তাঁর কুদরতের হাত থেকেই নির্গত হয়েছে এবং তা সবই তাঁরই সৃষ্ট এবং তাঁরই সৃষ্টি এবং তাঁরই অস্তিত্ব থেকেই ঐ সমস্ত কিছুর অস্তিত্ব। অর্থাৎ, অবস্থা যখন এটাই যে, প্রকৃত বা হাকীকি অস্তিত্ব একমাত্র তিনিই, এবং অপরাপর সমস্ত কিছুই তাঁর থেকেই সৃষ্টি হয়েছে, এবং তারই সঙ্গে কায়েম বা স্থিতিশীল রয়েছে ; অর্থাৎ সৃষ্টি হওয়ার পরও আপন সত্তায় তাঁর থেকে স্বাধীন নয়, এবং তাঁর থেকে আলাদা নয়। বরং, প্রকৃতপক্ষে সব কিছু সৃষ্টি হওয়ার পরও প্রকৃত জীবন্ত তিনিই। এবং অপরাপর সকল জীবন তাঁর থেকেই জন্মলাভ করেছে। এবং তাঁরই সঙ্গে কায়েম রয়েছে। এবং প্রকৃত মুক্ত বা স্বাধীন একমাত্র তিনিই এবং অন্যান্য সকল কিছুই – তা সে আত্মাই হোক আর দেহ-ই হোক – তাঁর নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট বন্দীত্বের মধ্যে বন্দী,

এবং তাঁরই হাতের বন্ধন দ্বারা বান্ধা এবং তাঁরই নির্ধারিত সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং তিনি সমস্ত কিছুকেই ঘিরে আছেন, এবং অপর সমস্ত কিছুই তাঁর 'রবুবিয়্যত'-এর আয়ত্তের মধ্যে অবস্থিত। এবং এমন কোন কিছুই থাকবে না, যা তার হাত থেকে নির্গত হবে না এবং তার 'রবুবিয়্যত'-এর আয়ত্তাধীন হবে না, কিংবা তাঁর সহায়তা দ্বারা কায়েম হবে না। সংক্ষেপে, অবস্থা এরূপ হলেই তবে খোদাতায়ালার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, যা কিনা পূর্ণ জ্ঞানের জন্য শর্ত, তা সৃষ্টি হতে পারবে জ্ঞাতব্যের সঙ্গে। এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ্তায়ালা কোরআন শরীফে এক জায়গায় তাঁর নির্দেশ দান করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন ঃ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ

অর্থাৎ, আমরা মানুষের জীবন শিরার চাইতেও অধিক নিকটবর্তী – (৫০ঃ১৭) একইভাবে তিনি কোরআন শরীফের অন্যত্র বলেছেন ঃ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ

অর্থাৎ প্রকৃত প্রমায়ূ বা হায়াত একমাত্র তাঁরই ; এবং অন্যান্য সমস্ত কিছুই তাঁর থেকেই পয়দা হয়েছে এবং তাঁর সঙ্গে জীবিত রয়েছে। অন্য কথায়, প্রকৃত প্রস্তাবে, সকল প্রাণের প্রাণ এবং সকল সক্ষমতার ক্ষমতা তিনিই . . . . . . যদি আত্মার সৃষ্টি হওয়াকে স্বীকার করা না হয়, কিংবা তাকে সৃষ্ট বলে স্বীকার করা না হয়, তাহলে, একথা স্বীকার করারও কোনই কারণ নেই যে, এক সম্পর্কহীন সত্তা যে পরমেশ্বর বলে ভূয়া আখ্যায় আখ্যায়িত, সে আত্মার হাকীকত অর্থাৎ সত্যতা বা রিয়ালিটি সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখে, এবং তার জ্ঞান আত্মার চুড়ান্ত স্তর পর্যন্ত উন্নীত। কেননা, যে ব্যক্তি কোন বস্তু সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান রাখে, সে অবশ্যই ঐ বস্তু বানাতেও পারে। আর যদি বানাতে না পারে, তাহলে বুঝতে হবে যে, তার জ্ঞানের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন না কোন ঘাট্তি রয়ে গেছে। আর যদি পূর্ণ জ্ঞান না থাকে তাহলে একই ধরনের বা সাদৃশ্যের জিনিষের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করাও যাবে না, আসল বস্তু বানানো তো দূরের কথা। অতএব, খোদাতায়ালা যদি সব কিছুর স্রষ্টা না-ই হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর মধ্যে শুধু এই ঘাট্তিই দেখা যাবে না যে, তাঁর জ্ঞান অপূর্ণ ; বরং এথেকে এটাও প্রমাণিত হবে যে, তিনি কোটি কোটি আত্মার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতেও পারবেন না, এবং কার আত্মা কোন্টি তা সনাক্ত করতেও অহরহ ধোঁকার মধ্যে পড়বেন, এবং কখনও কখনও জায়েদের আত্মাকে বকরের আত্মা বলে চিহ্নিত করে বসবেন। কেননা, অপূর্ণ জ্ঞানের পক্ষে এরূপ ধোঁকা খাওয়াই স্বাভাবিক। আর যদি বল যে, ধোঁকা খাবে না, তাহলে এ সম্পর্কে প্রমাণ পেশ করো।' – (সূরমা চশমা আরিয়া, পৃ. ১৭৩-১৭৮ পাদটীকা)

(৪৬)

'হতে পারে, এখানে কারো মনে এই কুধারণা বা ওয়াছওয়াছা সৃষ্টি হতে পারে যে, কোন জিনিস সম্পর্কিত জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তে এসে গেলে সেই জিনিস সৃষ্ট জিনিস হয়ে যায়। সুতরাং, হক্ সোবহানুহুতায়ালা সম্পর্কিত জ্ঞান, যা

তাঁর নিজস্ব সত্তা সম্পর্কিত এবং পরিপূর্ণও বটে, তার দরুণ খোদাতায়ালা কি নিজেই নিজের সত্তার স্রষ্টা ? অথবা তিনি কি তাঁর সদৃশ কোন সত্তা সৃষ্টি করতে সক্ষম ? এই আপত্তির প্রথমাংশের জবাব তো এই যে, যদি খোদাতায়ালা স্বয়ং নিজের অস্তিত্বের স্রষ্টা হন, তাহলে তো ধরে নিতে হবে যে, তিনি তাঁর অস্তিত্বের পূর্ব থেকেই মজুদ বা অস্তিত্ববান ছিলেন। অথচ, এটা তো জানা কথাই যে, কোন কিছুই তার আপন অস্তিত্বের পূর্ব থেকে অস্তিত্ববান থাকতে পারে না। অন্যথায়, বস্তুই হবে তার আত্মার পূর্ববর্তী (Matter shall preceed its soul) । **কিন্তু, খোদাতায়ালা, যিনি তাঁর সত্তার পূর্ণজ্ঞান রাখেন, তাঁর ক্ষেত্রে, জ্ঞানী এবং জ্ঞান এবং জ্ঞাত একই জিনিষ, যার মধ্যে পার্থক্য বা ভিন্নতা এবং দ্বিত্বের কোন অবকাশ নেই**। তাহলে, এখানে সেই ভিন্ন জিনিষ কোন্‌টি হবে যাকে চিহ্নিত করা যাবে সৃষ্ট বলে ? সুতরাং খোদাতায়ালার নিজের জ্ঞান, যা তাঁর সত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত, তার সঙ্গে অপর আর কিছুর তুলনা হতে পারে না। মোদ্দা কথা, **আল্লাহ্‌তায়ালার নিজস্ব জ্ঞান, যা তাঁর সত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত, সেই জ্ঞান ও জ্ঞানী ও জ্ঞাত এমন কোন ভিন্ন ভিন্ন জিনিষ নয়, যার একটিকে স্রষ্টা এবং অন্য একটিকে সৃষ্ট বলা যাবে**। এবং হ্যাঁ, তাঁর অস্তিত্ব সৃষ্ট বা মখলুক বলার পরিবর্তে এটাই বলতে হবে যে, সেই অস্তিত্ব অপর কারো পক্ষ থেকেই সৃষ্ট নয়, বরং চিরস্থায়ী ও চিরন্তনরূপে নিজের পক্ষ থেকে নিজেই প্রকাশিত হয়েছে। আর, খোদা হওয়ার অর্থ তো এটাই যে, খোদ এসেছে। (স্বয়ম্ভূ হওয়ার অর্থই তো স্বয়ং উদ্ভূত)।

আপত্তির দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে, উল্লিখিত আলোচনা থেকে এটাই প্রমাণিত হবে যে, খোদাতায়ালা তাঁর নিজের মেছাল বা সদৃশ সৃষ্টি করতেও সক্ষম। এর উত্তর হচ্ছে, কুদরতে ইলাহী বা ঐশীশক্তি কেবল ঐ সকল জিনিষের দিকেই মনোনিবেশ করে থাকে, যেগুলি তার চিরস্থায়ী ও চিরন্তন গুণাবলীর পরিপন্থী বা বিরোধী নয়। নিঃসন্দেহে এ কথা তো সঠিক এবং সব দিক থেকেই সমপ্রমাণিত ও যথার্থ যে, যে জিনিষের জ্ঞান খোদাতায়ালার পূর্ণ বা কামেল, সেই জিনিসকে তিনি চাইলে সৃষ্টি করতেও পারেন। কিন্তু, একথা, কোনমতেই সঠিক নয় এবং আবশ্যকও নয় যে, তিনি যা কিছু করতে সক্ষম, তার সবকিছুকেই, তিনি বিনা বিবেচনায় নিজের পূর্ণ গুণাবলীর কারণে, করেই দেখাবেন। বরং, তিনি তাঁর প্রত্যেক শক্তিকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে তিনি অবশ্যই তাঁর কামেল গুণাবলীর মর্যাদা রক্ষা করেন ; যাতে করে তিনি যা করতে চান তাতে যেন তাঁর কামেল গুণাবলীর কোন অন্যথা না হয় এবং অসঙ্গতিপূর্ণ কিছু না হয়। যেমন ধরুন, তিনি চাইলে একজন অতিপরহেযগার সৎ বা সালেহ ব্যক্তিকেও দোযখের আগুনে জ্বালিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু, তাঁর রহম, তাঁর সুবিচার ও তাঁর পুরস্কারদানকারী গুণ তাঁর সেই কাজে বাধা দান করবে। অতএব, তিনি হেন কাজ কখনই করবেন না। তেমনিভাবে, তাঁর শক্তি এদিকে কখনই মনোনিবেশ করবে না যে, তিনি

তাঁর নিজেকেই যেন ধ্বংস করে ফেলেন। কেননা, এই কাজ তাঁর জীবনের চিরন্তনতার পরিপন্থী। **একইভাবে এটাও বুঝা দরকার যে, তিনি তাঁর মত কোন খোদাও বানান না। কেননা, তাঁর একত্ব বা এককত্বের গুণ, তাঁর বেমেছাল বা অনুপম হওয়ার গুণ, যা তাঁর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে চিরন্তন ও চিরস্থায়ীরূপে, তা এদিকে মনোনিবেশ করতে তাঁকে বাধা দান করে।** অতএব, একটুখানি চক্ষু উন্মীলন করে বুঝে নেওয়া উচিত যে, কোন কাজ করতে সক্ষম না হওয়াটা এক কথা, আর সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও, পরিপূর্ণ গুণের মর্যাদার কারণে, সেই গুণের পরিপন্থী কোন কিছু করার প্রতি মনোনিবেশ না করাটা ভিন্ন কথা।' – (সুরমা চশমা আরিয়া পৃ. ১৮২-১৮৫, পাদটীকা)

(৪৭)

'আপন ব্যক্তিগত ক্ষমতা এবং আপন ব্যক্তিগত অবস্থার কারণে **'আলেমুল গায়েব'** বা গোপন বিষয়ে জ্ঞাত হওয়াটাও খোদাতায়ালার এক ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য। আদিকাল থেকেই 'আহ্‌লে হক্‌' বা সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা এই বিশ্বাস পোষণ করে এসেছেন যে, সেই ওয়াজেবুল ওজুদ' বা অপরিহার্য সত্তা (The Necessary Being) -এর জন্য এটাই যথোপযুক্ত যে, তিনি আপন সত্তায় আলেমুল গায়েব হবেন। এক্ষেত্রে, তাঁর যেমন কোনও অংশীদার থাকার কোনরূপ সম্ভাবনা নেই, তেমনি তাঁর সব মহিমান্বিত নামের ক্ষেত্রেও তাঁর কোনও অংশীদার নেই। অর্থাৎ বিশ্বাস এটাই যে, খোদাতায়ালার জন্য আপন সত্তায় আলেমুল গায়েব হওয়াটা আবশ্যক। এবং তাঁর সত্য-সম্পূর্ণ সত্তার এটা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য যে, তা আলেমুল গায়েব হবে। কিন্তু, সেই সব সম্ভাবনা, যা ধ্বংসশীল ও যার সত্যতা বা হকীকত বাতিলযোগ্য, তার কোনটারই অংশীদারিত্ব মহিমান্বিত গুণাবলীর অধিপতির (খোদাতায়ালার) সত্তায় বৈধ নয়, না এই গুণের ক্ষেত্রে, না অন্য আর কোন গুণাবলীতে। এবং **যেমন ব্যক্তিসত্তার ক্ষেত্রে খোদার কোন শরীক থাকাটা নিষিদ্ধ, তেমনি তাঁর গুণাবলীর ক্ষেত্রেও তা নিষিদ্ধ**। অতএব, এটা কারো পক্ষেই সম্ভব নয় যে, সে আলেমুল গায়েবের ব্যক্তিগত জ্ঞান সম্পর্কে অবগত হয়, তা সেই ব্যক্তি নবী হউন, আর মুহাদ্দেস হউন, আর ওলী হউন। তবে, হ্যাঁ, ইল্‌হামে ইলাহী বা ঐশীবাণীর মাধ্যমে গোপন বা গায়েবের রহস্য জানা সম্ভব এবং বিশেষ বিশেষ ও মনোনীত বান্দারা সেই জ্ঞান লাভ করেও থাকেন, এবং তা এখনও লাভ করা সম্ভব। তবে, শর্ত এটাই যে, তাঁরা আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুসারী হবেন।'–তাসদীকুন নবী, পৃ. ২৬, ২৭)

(৪৮)

'আমাদের জিন্দা হাইয়্যূন ও কাইয়্যূম খোদা – চিরঞ্জীব ও চিরন্তন খোদা- আমাদের সঙ্গে মানুষের মতই কথা বলেন। আমরা যখন কোন কথা জিজ্ঞেস করি, এবং প্রার্থনা করি, তখন তিনি কুদরত-ভরা শব্দাবলী দ্বারা উত্তর দান করেন। এই অবস্থা যদি হাজার বার ধরে জারি থাকে, তবু তিনি জবাব দানে মুখ

ফিরিয়ে নেন না। তিনি তাঁর কথায় বিস্ময় থেকে বিস্ময়কর সব বিষয়াদি প্রকাশিত করে থাকেন। এবং অসামান্য অলৌকিক সব নিদর্শন প্রদর্শন করেন। এমন কি, তিনি এই দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি করে দেন যে, তিনিই সে-ই যাকে খোদা বলা উচিত। তিনি প্রার্থনাসমূহ কবুল করেন এবং কবুল করার খবরও দেন। তিনি বড় বড় সমস্যা সমাধান করে দেন। এবং মৃতপ্রায় রোগীকে পর্যন্ত তার বেশী বেশী দোয়ার ফলে জীবন্ত করে দেন। এবং তাঁর এই সব অভিপ্রায়ের কথা সময়ের পূর্বেই আপন কালামের দ্বারা জানিয়ে দেন। খোদা হচ্ছেন সে-ই খোদা যিনি আমাদের খোদা। তিনি তাঁর কথার মাধ্যমে, যা ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর প্রকাশক, তার দ্বারা প্রমাণ করেন যে, তিনিই পৃথিবী ও আসমানসমূহের খোদা। তিনিই সে-ই যিনি আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন, আমি তোমাকে প্লেগের মৃত্যু থেকে বাঁচাবো, এবং এছাড়া, সেই সবাইকে বাঁচাবো যারা তোমার গৃহের মধ্যে পুণ্য ও পরহেযগারীর সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করে। এই যামানায় এমন আর কে আছে যে, আমি ছাড়া এইরূপ ইলহাম বা ঐশীবাণী প্রকাশিত করেছে ? এবং সে তার নিজের,তার বিবি ও বাচ্চাদের এবং অন্যান্য সৎ মানুষদের–যারা এই গৃহের চার দেওয়ালের মধ্যে বসবাস করে – তাদের জন্য খোদাতায়ালার জিম্মাদারী ঘোষণা করেছে ?' – (নাসীমে দাওয়াত, পৃ. ৮২)

(৪৯)

'মানুষের স্বভাবজ অবস্থাসমূহ – যা কিনা তার প্রকৃতির জন্য অপরিহার্য - তার মধ্যে একটি অবস্থা হচ্ছে, এক উচ্চতর অস্তিত্বের অনুসন্ধান করা, যার জন্য মানুষের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে এক প্রকার আকর্ষণ বিদ্যমান রয়েছে। এবং এই অনুসন্ধানের ক্রিয়াশীলতা সেই সময় থেকেই অনুভূত হতে থাকে, যখন বাচ্চা মায়ের পেট থেকে বেরিয়ে আসে। কেননা, বাচ্চা পয়দা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম তার যে রূহানী বৈশিষ্ট্য সে প্রদর্শন করে তা হচ্ছে, সে তার মায়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়, এবং স্বভাবগতভাবে সে মায়ের প্রতি ভালবাসা পোষণ করে। পরে যতই তার বৃত্তিসমূহ বিকশিত হতে থাকে এবং যতই তার প্রকৃতি প্রস্ফুটিত হতে থাকে, ততই সেই ভালবাসার আকর্ষণ–যা তার অন্তরে সুপ্ত অবস্থায় ছিল – তা আপন রঙে ও রূপে উদ্ভাসিত হতে থাকে, প্রকাশিত হতে থাকে। অবস্থা এই-ই হয় যে, সে তার মায়ের কোল ছাড়া অন্য আর কোথাও কোন আরাম পায় না। এবং সকল আরাম সে তার মায়ের স্নেহের আঁচলেই পায়। তাকে যদি মায়ের কাছ থেকে আলাদা করা হয় এবং দূরে কোথাও সরিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে তার সকল স্বস্তি নষ্ট হয়ে যায়। তখন যদি তার সামনে নানা প্রকার নেয়ামত জমা করেও দেওয়া হয়, তবু সে তার প্রকৃত আনন্দ দেখতে পায় তার মায়ের কোলেই। মা ছাড়া অন্য আর কিছুতেই সে আরাম পায় না। এই যে ভালবাসার আকর্ষণ, যা তার মায়ের প্রতি সৃষ্টি হয়, তা আসলে কী ?

প্রকৃতপক্ষে, এ হচ্ছে সেই আকর্ষণ, যা মাবূদে হাকীকি অর্থাৎ প্রকৃত উপাস্যের জন্য বান্দার স্বভাবের মধ্যে উপ্ত রাখা হয়। বরং প্রত্যেক জায়গায় মানুষ যে ভালবাসার সম্পর্ক সৃষ্টি করে, বস্তুতঃ সেই আকর্ষণই সেখানে কাজ করে। এবং প্রত্যেক জায়গায় সে যে আশেকানা জোশ বা প্রেমিক-সূলভ আবেগ প্রকাশ করে, তা-ও, প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ ভালবাসারই এক প্রতিবিম্ব। সে যেন অপর সকল বস্তুকে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে এক হারানো বস্তুর সন্ধান করে, যার নাম এখন সে ভুলে গেছে। অতএব, মানুষ তার মাল-সম্পদ, তার সন্তান অথবা তার স্ত্রীর প্রতি যে ভালবাসা প্রদর্শন করে, কিংবা কোন সুমধুর সঙ্গীতের প্রতি তার যে আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়, তা সবই, বস্তুতঃ, ঐ হারানো বন্ধুরই অন্বেষণ। এবং মানুষ, যেহেতু, সেই অতিক্রান্ত থেকে অতিক্রান্ত, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অস্তিত্বকে – যা বস্তুর মধ্যে নিহিত আগুনের মতই গুপ্ত এবং গুপ্ত সবারই কাছে, যা দৈহিক চক্ষু দ্বারা দেখা সম্ভব নয়, যা অসম্পূর্ণ বুদ্ধি দ্বারা অনুধাবন করা যায় না, তাকে জানতে গিয়ে মানুষ বড় বড় ভুলের শিকারে পরিণত হয়েছে, এবং ভুল করে তার হক, তার অধিকার অন্যকে দিয়ে বসেছে।

খোদাতায়ালা কোরআন শরীফে একটি চমৎকর উপমা দিয়েছেন। বলেছেন যে, এই পৃথিবী একটি শীশ্ মহলের মত, যার মেঝে অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সুনির্মল কাঁচ দ্বারা নির্মীত, এবং সেই কাঁচের তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে পানি এবং তা প্রবাহিত হচ্ছে প্রবল বেগে। দৃষ্টি যখন সেই কাঁচের উপর পড়ে, যখন সেই কাঁচকেই পানি বলে ভ্রম হয়। মানুষ তখন সেই কাঁচের উপর দিয়ে চলতে চায় না, ভয় পায়, যেমন সে ভয় পায় পানির উপর দিয়ে চলতে। অথচ, তা আসলে পানি নয়, কাঁচ। অতিশয় সাফ ও স্বচ্ছ কাঁচ। অতএব, ঐ যে বড় বড় বস্তুপিন্ড, যা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, যেমন, সূর্য এবং চন্দ্র প্রভৃতি, তা সবই সেই স্বচ্ছ কাঁচ, যার উপাসনা করা হয়েছে ভুল করে। অথচ ঐগুলির অন্তরালে এক মহানশক্তি নিরন্তর কাজ করে চলেছে, যা ঐ কাঁচগুলির তলদেশে প্রবহমান পানির মতই প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এবং সৃষ্টির পূজারীদের দৃষ্টি এই ভুল করেছে যে, তারা ঐ কার্যকে মনে করেছে ঐ কাঁচগুলোরই কার্য। অথচ, সে কার্য সম্পাদিত হয়ে চলেছে ঐ কাঁচের অন্তরালবর্তী সেই মহাশক্তির দ্বারাই। এটাই হচ্ছে ভাষ্য বা তফ্সীর নিম্নের এই আয়াতে করীমার ঃ

إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ

('নিশ্চয় উহা পালিশ করা কাঁচ-নির্মীত মহল।' – ২৭ঃ৪৫)

আল্লাহতায়ালার অস্তিত্ব যেহেতু অতীব উজ্জ্বল হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত গোপন, সেহেতু তাঁকে সনাক্ত করার জন্য শুধু এই বিশাল বস্তুজগৎ, যা আমাদের দৃষ্টির সামনে বিদ্যমান, তা যথেষ্ট ছিল না। তাই, এই (মহাবিশ্বের বিপুল) সৃজন-বিন্যাসের উপরে নির্ভরশীল মানুষেরা এর সুসমন্বিত শৃংখলা ও সুনিপুণ নিয়ন্ত্রণ যা

শত শত বিস্ময়ে ভরা, তার প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত করে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছে। তারা জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেছে। তারা যেন পৃথিবী ও আকাশের সব গহীন গহীন প্রদেশে প্রবেশ করেছে। কিন্তু, তথাপি তারা সন্দেহ ও সংশয়ের অন্ধকার থেকে পরিত্রাণ পায়নি। তাদের অধিকাংশই নানা প্রকার ভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হয়েছে। এবং অর্থহীন কল্পনার বশবর্তী হয়ে কোথা থেকে কোথায় চলে গেছে। আর যদিবা, সেই সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের সম্পর্কে তাদের কোন প্রকার ধারণারও সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে তা শুধু এই পর্যন্তই যে, এই অতি উন্নত, উত্তম ও সুশৃংখল সৃষ্টিজগতকে অবলোকন করে তাদের মনে এই চিন্তার উদ্রেক ঘটেছে যে, এই যে মহিমান্বিত আজিমুশ্‌শান সৃষ্টি জগৎ-যার সৃজন ও শৃংখলা গভীর প্রজ্ঞায় ভরপুর – তার কোন সৃষ্টিকর্তা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু, এত স্বতঃস্পষ্ট যে, এই ধারণা অপূর্ণ এবং এই উপলব্ধি অগভীর। কেননা, এই কথা বলা যে, এই সৃষ্টিজগতের জন্য একজন স্রষ্টা থাকা প্রয়োজন, কিছুতেই সেই কথার সমান হতে পারে না যে, সেই স্রষ্টা সত্যিই আছেন। সংক্ষেপে, এ ছিল তাদের এক অনুমান নির্ভর জ্ঞান, যা হৃদয়ে প্রশান্তি আনতে পারে না, স্বস্তি দিতে পারে না। এবং তা হৃদয় থেকে সন্দেহ-সংশয়কে সাকল্যে দূরীভুত করতেও পারে না। এবং এ এমন কোন পেয়ালাও নয় যে, তা সেই পূর্ণ জ্ঞান বা মা'রেফতের সেই পিপাসা নিবারণ করতে পারে, যে পিপাসা মানুষের স্বভাবের মধ্যে নিহিত। বরং এইরূপ অসম্পূর্ণ জ্ঞান বা উপলব্ধি অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে থাকে। কেননা, এতে বহু বাক-বিতণ্ডার পরও আখেরে কিছুই মিলে না এবং যোগফল শূন্যই থেকে যায়।

বস্তুতঃ, আল্লাহ্‌তায়ালা যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁর অস্তিত্বের কথা স্বয়ং নিজের কথায় প্রকাশ করেন, যেমন তিনি তা প্রকাশ করেছেনও নিজের কথায় বা কালামে, – ততক্ষণ পর্যন্ত শুধু তাঁর কাজ দেখেই সন্তুষ্টি লাভ করা সম্ভব নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি আমরা এমন একটি কামরা দেখি যা ভিতর থেকে খুব নিপুণভাবে শিকল লাগিয়ে বন্ধ করা। তাহলে, এই কাজ দেখে আমরা অবশ্যই প্রথমে এই ধারণাই করবো যে, ভিতরে কোন মানুষ আছে যে ভিতর থেকে শিকল আটকে দিয়েছে। কেননা, বাইরে থেকে ভিতরে শিকল আটকানো সম্ভব নয়। কিন্তু, যদি কিছুদিন পর্যন্ত, বরং বছরের পর বছর ধরে ডাকাডাকি করা সত্ত্বেও, সেই মানুষের পক্ষ থেকে কোন সাড়া পাওয়া না যায়, তাহলে ভিতরে কেউ আছে বলে আমাদের যে ধারণা তা পাল্টে যাবে। আমরা তখন এই ধারণা করবো যে, ভিতরে কেউ নেই। বরং, বিশেষ কোন কৌশলে ভিতরের শিকল আটকানো হয়েছে। এই অবস্থাই হচ্ছে ঐ সকল দার্শনিকদের যারা শুধু কাজ দেখেই নিজেদের জ্ঞান সমাপ্ত করেছে। এ বড়ই ভ্রান্তির কথা যে, খোদাকে এক মৃতের ন্যায় মনে করা হয়, যাকে কবর থেকে বের করাই কেবল মানুষের কাজ। খোদা যদি এরূপই হন যে, তিনি মানুষের চেষ্টাতেই আবিষ্কৃত হয়েছেন, তাহলে

সেই খোদাকে নিয়ে আমাদের যে এত আশা-ভরসা তা সবই বৃথা হয়ে যাবে। বরং, খোদা তো তিনি-ই যিনি সর্বদাই এবং আদি কাল থেকেই স্বয়ং **আনাল মওজুদ'–'আমি** আছি' বলে ঘোষণা দিয়ে মানুষকে তাঁর দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন। এটা একটা নিকৃষ্ট অপরাধ হবে, যদি আমরা এই ধারণা পোষণ করি যে, তাঁকে জানার ব্যাপারটা মানুষের এহ্সান বা কৃপার উপর নির্ভরশীল, এবং যদি ফিলোসফাররা না থাকতো, তাহলে তিনি যেন চির-নিখোঁজ বা গুম হয়ে থাকার অবস্থায় থেকে যেতেন। আর, এই কথা বলা যে, খোদা কীভাবে কথা বলতে পারেন ? তার কি কোন জবান আছে ? এটাও একটা নিকৃষ্ট ধৃষ্টতা। কেন? তিনি কি জড়-হস্ত ছাড়াই আকাশের গ্রহ নক্ষত্ররাজি এবং পৃথিবীকে সৃষ্টি করেন নি ? কেন ? তিনি কি জড়-চক্ষু ছাড়াই সমস্ত জগতকে দেখতে পান না ? তিনি কি জড়-কর্ণ ছাড়াই আমাদের আওয়াজ শুনতে পান না ? তাহলে, এটারও কি প্রয়োজন ছিল না যে, তিনি একইভাবে কথা-ও বলেন ? একথা কোনমতেই ঠিক নয় যে, খোদা আর ভবিষ্যতে কোন কথা বলবেন না, যা বলবার ছিল অতীতেই বলেছেন। আমরা তাঁর কথা বলা এবং তাঁর সম্বোধন-সম্ভাষণ করার উপরে কোন যুগ বা কালের সীমা বেঁধে দিতে পারি না। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, তিনি এখনও অন্বেষণকারীদেরকে ইল্হাম বা ঐশীবাণীর ঝর্ণাধারায় অভিসিক্ত করতে তেমনি প্রস্তত রয়েছেন, যেমন তিনি অতীতে ছিলেন। এবং এখনও তাঁর কৃপা ও কল্যাণরাজির দুয়ার তেমনই উন্মুক্ত রয়েছে, যেমন তা পূর্বে ছিল। তবে, হ্যাঁ, প্রয়োজন শেষ হওয়ার কারণে, শরীয়ত ও হদুদ (Law and Limitations) প্রবর্তনের বিষয়টি এখন শেষ হয়ে গেছে। এবং সমস্ত রেসালাত ও নবুওয়ত আপন আপন সেই শীর্ষ বিন্দু–যা ছিল আমাদের নেতা ও প্রভু সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের সত্তা-তার মধ্যে উপনীত হয়ে চরম ঔৎকর্ষে উত্তীর্ণ হয়েছে।' – (ইসলামী উসূল কি ফিলাসফী, পৃ. ৪৯-৫৩)

(৫০)

'খোদা সম্পর্কিত প্রকৃত জ্ঞান যার উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল তা হচ্ছে, সেই জীবন্ত খোদা পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া, যিনি তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের সঙ্গে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে কথাবার্তা বলেন। এবং তাঁর মহিমামন্ডিত ও সুমধুর বাণী দ্বারা তাদেরকে প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তি দান করেন। এবং যেভাবে একজন মানুষ আর একজন মানুষের সঙ্গে কথা বলে, সেইভাবে, নিশ্চিতরূপে, – যা কিনা সকল প্রকারের সন্দেহ ও সংশয় থেকে মুক্ত, – তিনি তাদের সঙ্গে কথা বলেন। তাদের কথা শোনেন এবং তাদের কথার উত্তর দেন। এবং তাদের প্রার্থনা শোনেন, শুনে সেই প্রার্থনা কবুল করার কথা তাদেরকে জানিয়ে দেন। একদিকে মহিমামন্ডিত ও সুমধুর কথা দ্বারা এবং অপরদিকে অলৌকিক কর্মের দ্বারা এবং শক্তিশালী ও ক্ষমতাসম্পন্ন নিদর্শন দ্বারা প্রমাণিত করে ঘোষণা করেন, **'আমি-ই খোদা'**। তিনি প্রথমে, ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে তাদেরকে তাঁর সাহায্য, সমর্থন ও

বিশেষভাবে পথ-প্রদর্শনের প্রতিশ্রুতি দান করেন, এবং অপরদিকে নিজের ওয়াদাসমূহের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করবার জন্য এক জগতকে তাদের বিরুদ্ধবাদীরূপে খাড়া করেন। এবং সেই সমস্ত লোক তাদের সমস্ত শক্তি, সমস্ত মক্কর ও ফেরেববাজি বা প্রতারণা এবং প্রত্যেক প্রকারের চক্রান্ত ও কারসাজি দ্বারা প্রচেষ্টা চালাতে থাকে, যেন তারা খোদাতায়ালার ঐ সকল প্রতিশ্রুতি নস্যাৎ করে দিতে পারে, যা তিনি তাঁর প্রিয় মকবুল বান্দাদের সঙ্গে করেছেন তাদেরকে সাহায্য ও সমর্থন দানের জন্য, তাদের বিজয়-এর জন্য। কিন্তু খোদা তাদের (বিরুদ্ধবাদীদের) সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেন, বরবাদ করে দেন। তারা দুষ্কৃতির বীজ বপন করতে থাকে। খোদা সেগুলিকে উৎপাটিত করতে থাকেন। তারা আগুন লাগাতে থাকে। খোদা নির্বাপিত করতে থাকেন। তারা তাদের সকল প্রচেষ্টাকে চরমে পৌঁছে দেয়। কিন্তু, খোদা তাদের সেই সমস্ত চক্রান্তকে বুমেরাং করে তাদেরই দিকে ছুঁড়ে মারেন। খোদাতায়ালার গৃহীত বা মকবুল ও ধর্মপরায়ণ বান্দারা সহজ-সরল প্রকৃতির হয়ে থাকে, এবং তারা খোদাতায়ালার কাছে ঐ সকল শিশুর ন্যায় যারা মায়ের কোলে থাকে। দুনিয়া তাদের সাথে দুশ্‌মনী করে, কেননা, তারা দুনিয়ার লোক নয়। তাই, নানা প্রকার চক্রান্ত ও ফেরেব ও প্রতারণা করা হয় তাদেরকে সমূলে উৎপাটিত করে ফেলার জন্য। জাতিসমূহ তাদেরকে দুঃখ-কষ্ট দেওয়ার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়। এবং সমস্ত ইতর লোকেরা একত্র হয়ে একই ধনুক থেকে তাদের প্রতি তীর ছুঁড়তে থাকে এবং নানা প্রকার অপবাদ ও কলংক রটাতে থাকে। যেন, যে কোন উপায়েই হোক তাদেরকে ধ্বংস করা যায় এবং তাদের কোন নাম-নিশানাও না থাকে। কিন্তু, অবশেষে, খোদাতায়ালা তাঁর অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করে দেখিয়ে দেন। একইভাবে তাদের জীবনব্যাপী এইসব ঘটনা অব্যাহতরূপে জারি হয়ে যায়। একদিকে তারা খোদাতায়ালার সত্য বাণী, যা কিনা সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত, তার দ্বারা সম্মানিত হতে থাকেন, এবং সেই গোপন বিষয়াদি সম্পর্কিত জ্ঞান, যা মানুষের ক্ষমতা বহির্ভূত, – তা খোদায়ে কাদের ও করীম আপনার সুস্পষ্ট কালামের মাধ্যমে প্রকাশিত করতে থাকেন। এবং অপরদিকে, মো'জেযানা বা অলৌকিক কর্মকাণ্ড – যা সব প্রতিশ্রুতিকে পূর্ণ করে দেখায়, – তদ্দারা তাদের বিশ্বাস বা ইয়াকীনকে 'নূরুন আলা নূর'-আলোর উপরে আলো-তে রূপান্তরিত করে দেন। এবং যতটা মানুষের প্রকৃতিতে এই চাহিদা থাকে যে, খোদাকে দৃঢ়-বিশ্বাসের সাথে সনাক্ত করা হোক, ততটাই মা'রেফত–তা সেই মা'রেফত কথায় হোক আর কাজে হোক, তাকে তাজাল্লী বা জ্যোতির্বিকাশ দ্বারা পূর্ণ করা হয়। এমনকি যে, এক অণু পরিমাণ অন্ধকারও আর মাঝখানে থাকে না। এই হচ্ছে সেই খোদা যার সম্পর্কে ঐ সমস্ত কথার ও কাজের তাজাল্লিয়াত বা জ্যোতির্বিকাশের পর – যার মধ্যে হাজারো পুরস্কার ও নেয়ামত বিদ্যমান থাকে এবং যা হৃদয়ের উপরে অত্যন্ত শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করে, – তারই মাধ্যমে মানুষের সৌভাগ্য হয় জীবন্ত ঈমান লাভের। এবং খোদার সঙ্গে এক প্রকৃত ও পবিত্র সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়ার কল্যাণে

তার প্রবৃত্তির যাবতীয় কলুষিত তাড়নাও দূরীভূত হয়ে যায়। তখন সমস্ত দুর্বলতা বিদূরিত হয়ে গেলে স্বর্গীয় আলোর লেলিহান শিখা দর্শনে অভ্যন্তরীণ অন্ধকার বিদায় গ্রহণ করে। এবং এক বিস্ময়কর পরিবর্তন প্রকাশিত হয়। অতএব, যে ধর্ম এই খোদাকে – যিনি এই সকল গুণাবলীতে গুণান্বিত বলে সাব্যস্ত – তাঁকে পেশ করতে পারে না, এবং ঈমানকে স্রেফ অতীতের কেচ্ছা কাহিনী এবং এমন সব কথাবার্তায় বা অলীক ক্রিয়াকান্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে, যা না কখনও শোনা যায়, না দেখা যায়, – তা কখনই খাঁটি বা সত্য ধর্ম হতে পারে না। এই প্রকারের ভূয়া খোদার আনুগত্য করা ঠিক তেমনি, যেমন এক মৃত সম্পর্কে এই বিশ্বাস ও আশা পোষণ করা যে, সে জীবিতদের ন্যায় কাজ করবে। সেই খোদার থাকা না থাকা একই কথা, যে সর্বদা জীবন্তরূপে আপন অস্তিত্বকে স্বয়ং প্রমাণিত করতে সক্ষম নয়, সে তো এক মূর্তিই ; সে না কথা বলে, না শোনে, এবং না সে প্রশ্নের উত্তর দেয়। না সে তার শক্তিকে এমন প্রবলরূপে প্রকাশিত করতে সক্ষম, যা দেখে একজন কট্টর নাস্তিকও আর সন্দেহ করতে পারে না।' – (বারাহীনে আহ্‌মদীয়া, পঞ্চম খন্ড, পৃ. ২১–২৩)

(৫১)

'আপত্তি (সপ্তম) ঃ মানুষের খোদার সঙ্গে কথা বলার ধারণা বা অভিমতটা আদব বা শিষ্টাচার বহির্ভূত। নশ্বর যা, তার সঙ্গে অবিনশ্বর ও চিরন্তন সত্তার কী সম্পর্ক ? এবং শাশ্বত ও নিত্য আলোর সঙ্গে এক মুষ্টি ধূলিকণার কী সাদৃশ্য ?

জবাব ঃ এইরূপ ধারণা সম্পূর্ণরূপে অমূলক ও অযৌক্তিক। এর মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করার জন্য মানুষের পক্ষে এই কথাটা বুঝাই যথেষ্ট যে, করীম ও রহ্‌মান খোদা বনী আদমের কামেল ব্যক্তিদের হৃদয়ে নিজের মা'রেফত বা পূর্ণ উপলব্ধির জন্য এমন সীমাহীন প্রেরণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং আপনার মহব্বত ও প্রেম ও আপনার আসক্তির প্রতি এমন আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন যে, তারা নিজেদের অস্তিত্ব থেকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে গিয়েছে। এমতাবস্থায়, এই ধারণা পোষণ করা যে, খোদা তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চান না, ঐ কথারই সমতুল্য যে, তাদের সকল ভালবাসা ও প্রেম ব্যর্থ হয়ে গেছে, এবং তাদের সকল প্রেরণা স্রেফ এক তরফা কল্পনা মাত্র। কিন্তু, চিন্তা করে দেখা উচিত যে, এই জাতীয় ধারণা কত অলীক ও কত অযৌক্তিক। কেন ? যিনি মানুষকে তাঁর নৈকট্য লাভের জন্য যোগ্যতা দান করেছেন, এবং আপনার প্রেম ও ভালবাসার জন্য প্রেরণা দিয়ে ব্যাকুল ও বেকারার করে তুলেছেন, তাঁর বাণীর কল্যাণময়তা থেকে কি তাঁর অন্বেষণকারী বঞ্চিতই থেকে যাবে ? কেন, এটা কি সত্য নয় যে, খোদার প্রেম এবং খোদার মহব্বত, এবং খোদার জন্য আত্মহারা ও আত্মবিলীন হওয়া – সবই সম্ভব এবং বৈধ, এবং এতে খোদার মহিমার মধ্যে কোন তারতম্য হয় না ? তাহলে প্রকৃত প্রেমিকের হৃদয়ে খোদার কালাম বা বাণী অবতীর্ণ হওয়াটা অসম্ভব

ও অবৈধ হবে কেন ? এবং তাতে খোদার মহিমার তারতম্যই বা ঘটবে কেন ? মানুষের পক্ষে খোদার প্রেমের অসীম অতল দরিয়ায় ডুব দেওয়া এবং কোন এক মোকাম বা স্থানে থেমে না যাওয়া – এই কথার অকাট্য প্রমাণ যে, তার আশ্চর্য আত্মাকে খোদার মা'রেফত বা সত্যোপলব্ধির জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব, যে জিনিষ খোদার মা'রেফত লাভের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে, তাকে যদি সেই পূর্ণ মা'রেফত লাভের যে মাধ্যম সেই ইলহাম বা ঐশীবাণী দান করা না হয়, তাহলে এই কথাই বলতে হবে যে, খোদা তাকে তাঁর মা'রেফত-এর জন্য সৃষ্টি করেন নি। অথচ, একথা ব্রাহ্মসমাজীরাও অস্বীকার করে না যে, পুণ্য প্রকৃতির মানুষের আত্মা খোদার মা'রেফত-এর জন্য ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত। অতএব, এখন এটা তাদের নিজেদেরকেই বুঝতে হবে যে, **বিশুদ্ধ প্রকৃতির মানুষ স্বয়ং প্রকৃতিগত কারণেই খোদার মা'রেফতের অনুসন্ধানী ; এবং এটাও প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, মা'রেফতে ইলাহীর সর্বোত্তম মাধ্যম ঐশীবাণী বা ইলহামে-ইলাহী ছাড়া অন্য কিছু নয়।** অতঃপর যদি বলা হয় যে, পূর্ণ জ্ঞান বা কামেল মা'রেফত লাভের সেই মাধ্যম লাভ করাই সম্ভব নয়, বরং তার অন্বেষণ করাটাই শিষ্টাচার বহির্ভূত, তাহলে তাতে খোদাতায়ালার প্রজ্ঞা বা হেকমতের উপরে এই কঠিন অপবাদ আরোপ করা হবে যে, তিনি মানুষকে তাঁর মা'রেফতের জন্য প্রেরণ তো দিয়েছেন বটে, কিন্তু সেই মা'রেফত লাভের জন্য কোন মাধ্যম দেননি। যেন, ক্ষুধা যে পরিমাণ ছিল, সেই পরিমাণে রুটি দিতে চান নি। এবং যে পরিমাণে তৃষ্ণার সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন সেই পরিমাণে পানি সরবরাহ করাটা মঞ্জুর করেননি। কিন্তু, বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ একথা খুব ভাল করেই বুঝতে পারে যে, এই জাতীয় ধারণা সম্পূর্ণরূপে খোদাতায়ালার আজিমুশ্শান–অতি মহান রহমতসমূহকে চিনতে না পারারই শামিল। পরম প্রজ্ঞাময় খোদা মানুষের সকল সৌভাগ্য তো রেখেছেন এরই মধ্যে যে, সে এই দুনিয়াতেই উলুহিয়্যত বা খোদায়িত্বের উজ্জ্বল রশ্মিমালাকে সুস্পষ্টরূপে দেখতে পাবে, যাতে করে তাকে সেই অতি শক্তিশালী আকর্ষণ দ্বারা খোদার দিকে টেনে নেওয়া যায়। তাহলে, এইরূপ করীম ও রহীম-এর সম্পর্কে এই ধারণা পোষণ করা যে, তিনি মানুষকে তার কাংখিত সৌভাগ্য এবং তার প্রকৃতির বাঞ্ছিত মর্যাদায় বা স্তরে উন্নীত করতে চান না, তা ব্রাহ্মসমাজীদের একটা উদ্ভট খেয়াল।' – (বারাহীনে আহ্মদীয়া, পৃ. ২২২ – ২২৫)

(৫২)

'খোদাতায়ালা মানুষকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছিলেন, সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি প্রথম থেকেই তার মধ্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত শক্তি বা বৃত্তি (ফ্যাকাল্টি) সৃষ্টি করে রেখেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, মানুষের আত্মার মধ্যে এক প্রেমের শক্তি বিদ্যমান রয়েছে। এবং কোন মানুষ যদি ভুল করেও অপর কারো সঙ্গে প্রেম করে, তার প্রেমের পাত্র যদি অন্য কাউকে নির্ধারণ করে, তবু সুস্থ বুদ্ধি অতি

সহজেই বুঝতে পারে যে, এই প্রেমের শক্তি তার আত্মার মধ্যে এজন্যই রাখা হয়েছিল যেন সে তার প্রকৃত প্রেমাষ্পদ, যে তার খোদা, তার সঙ্গে সমস্ত হৃদয় দিয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে সমস্ত আগ্রহ ও আকর্ষণসহ প্রেম করতে পারে।

অতএব, আমরা কি একথা বলতে পারি যে, এই যে প্রেমের শক্তি, যা মানবাত্মার মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে, যার তরঙ্গমালা সীমাহীন, যার চরম উত্তাল অবস্থায় মানুষ নিজের প্রাণকে পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়, তা আদি থেকে আপনা আপনিই আত্মার মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে গেছে ? না, কক্ষণো নয়। খোদা যদি মানুষ এবং তাঁর নিজ সত্তার মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আত্মার মধ্যে প্রেমের শক্তি সৃষ্টি করার মাধ্যমে এই সম্পর্ক স্বয়ং সৃষ্টি করে না থাকেন, তাহলে, বলতে হবে যে, বিষয়টি স্রেফ আকস্মিক। এবং তাদের পরমেশ্বর-এর এটা পরম সৌভাগ্য যে, আত্মাগুলির মধ্যে প্রেমের শক্তি রয়ে গেছে। নইলে, বিষয়টা যদি আকস্মিকভাবেই অন্য রকম কিছু ঘটে যেত, অর্থাৎ আত্মাগুলোর মধ্যে যদি প্রেম করার শক্তি না থাকতো, তাহলে, পরমেশ্বরের প্রতি মানুষ কোন প্রকার খেয়ালই কখনো করতো না। এবং ঐ পরমেশ্বরও এর জন্য কোন প্লান-প্রচেষ্টা চালাতে পারতেন না। কেননা, তাঁর দ্বারা তো নাস্তি থেকে অস্তি হওয়াই সম্ভব নয়। কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়টাও ভেবে দেখতে হবে যে, পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি ও উপাসনা এবং সৎকর্মের জন্য দাবী করাটা এই কথার প্রমাণ যে, তিনি স্বয়ং প্রেম ও আরাধনার শক্তি মানুষের আত্মার মধ্যে সংস্থাপিত করেছেন। কাজেই, তিনি প্রত্যাশা রাখেন যে, মানুষের মধ্যে তিনি স্বয়ং যে সমস্ত শক্তি দিয়ে রেখেছেন, তজ্জন্য মানুষের উচিত তার প্রেম ও আরাধনার মধ্যে নিমগ্ন হওয়া। অন্যথায়, পরমেশ্বরের মনে এই খাহেশ কেনই বা সৃষ্টি হবে যে, মানুষেরা তাঁর সঙ্গে প্রেম করুক। এবং তাঁর আনুগত্য করুক। এবং তাঁর মর্জি মোতাবেক কাজ-কর্ম সম্পাদন করুক।' – (নাসীমে দাওয়াত, পৃ. ২৪)

(৫৩)

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا

['যে একে (আত্মাকে) পবিত্র করেছে, সে নিশ্চয়ই সফলকাম হয়েছে' – ৯১:১০]

'কেহ যদি চায় হৃদয় লাগাতে সেই সে পবিত্র সনে
নিজেকে পবিত্র করিলে তাহাকে পাইবে সংগোপনে।'

'প্রত্যেকটি জাতিই এই দাবী করে যে, তাদেরই মধ্যে সব ভাল লোক, যারা খোদাতায়ালাকে ভালবাসেন। কিন্তু, এই দাবীটা প্রমাণিত করার জন্য যা প্রয়োজন, তা হচ্ছে, খোদাতায়ালাও তাদেরকে ভালবাসেন কি না, তা দেখা। এবং খোদাতায়ালার ভালবাসা হচ্ছে, প্রথমে তিনি ওদের হৃদয়ের উপর থেকে সেই

পর্দা অপসারিত করবেন, যার দরুন মানুষ খোদাতায়ালার অস্তিত্বের প্রতি দৃঢ়ভাবে ঈমান আনতে পারে না। এবং এক প্রকার কুয়াশাচ্ছন্ন বা অন্ধকারাচ্ছন্ন উপলব্ধি নিয়ে তাঁর অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে। বরং, কখনও কখনও পরীক্ষার সময় তাঁর অস্তিত্ব অস্বীকার করে বসে। এবং এই পর্দা অপসারিত করা ঐশীবাণী বা 'মুকালামাতে ইলাহীয়া' ছাড়া অন্য আর কোন উপায়েই সম্ভব নয়। অতএব, মানুষ প্রকৃত মা'রেফতের প্রস্রবণ থেকে কেবল সেই দিনই প্রাণ ভরে পান করতে পারে, যেদিন খোদাতায়ালা তাকে সম্বোধন করে **'আনাল মওজুদ' – আমি আছি'**-এর শুভ সংবাদ স্বয়ং তাকে দান করেন। তখন মানুষের উপলব্ধি বা মা'রেফত কেবল যুক্তি-তর্ক অথবা সংশয়যুক্ত চিন্তা-চেতনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং তখন খোদাতায়ালার সঙ্গে তার এমন সান্নিধ্য লাভ হয় যে, সে যেন তাঁকে দেখতে পায়। এবং এটাই সঠিক এবং সম্পূর্ণ সঠিক যে, খোদাতায়ালার প্রতি পূর্ণ ঈমান সেদিনই মানুষের ভাগ্যে জুটে, যেদিন আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু নিজের অস্তিত্বের সংবাদ নিজেই দান করেন।

খোদাতায়ালার ভালবাসার দ্বিতীয় নিদর্শন হচ্ছে, তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে শুধু তাঁর অস্তিত্বের খবর দিয়েই ক্ষান্ত হন না, বরং আপনার রহমত ও কৃপার কার্যকারিতাও খাসভাবে তাদের উপর প্রকাশিত করেন। এবং তিনি একইভাবে তাদের প্রার্থনাসমূহ – যা বাহ্যিকভাবে পূর্ণ হওয়াটা এক দুরাশা মাত্র, তা কবুল করে আপন বাণী ও ইলহাম দ্বারা তাদেরকে তা জানিয়ে দেন। তখন তাদের হৃদয়ে এই প্রশান্তি জন্মে যে, এ হচ্ছে আমাদের সেই সর্বশক্তিমান খোদা, যে আমাদের দোয়াসমূহ শোনে এবং আমাদের তা জানিয়ে দেয় এবং আমাদেরকে দুঃখ-দুর্দশা থেকে পরিত্রাণ দান করে। সেদিন থেকে পরিত্রাণ বা নাজাতের বিষয়টিও উপলব্ধিতে আসে। এবং খোদাতায়ালার অস্তিত্ব সম্পর্কেও সঠিক জ্ঞান জন্মে। যদিও জাগ্রত করার জন্য এবং সতর্ক করার জন্য কখনো কখনো অন্যরাও সত্য-স্বপ্ন দেখে থাকে, তথাপি এই পদ্ধতির স্তর ও মর্যাদা ও প্রকার ভিন্ন ভিন্ন। খোদাতায়ালার যে কথাবার্তা তা শুধু বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাই লাভ করে এবং যখন কোন নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রার্থনা করে তখন খোদাতায়ালার আপন খোদায়ী প্রখর প্রতাপের সঙ্গে প্রকাশিত হয়, এবং আপন আত্মাকে তার উপরে অবতীর্ণ করেন এবং আপনার মহব্বত-ভরা শব্দাবলী দ্বারা তাকে দোয়া কবুল করার সুসংবাদ দান করেন। এবং যে ব্যক্তির সঙ্গে এইরূপ কথাবার্তা প্রচুর পরিমাণে হয়ে থাকে, তাকেই নবী বা মুহাদ্দস বলা হয়।' – (হুজ্জাতুল ইসলাম, পৃ. ৩০২)

(৫৪)

'মনে রাখতে হবে যে, বান্দা তো উত্তম আচরণ দেখিয়ে নিজের আন্তরিকতাপূর্ণ ভালবাসা প্রকাশ করে, কিন্তু খোদাতায়ালা তার বদলায় বিস্ময়করূপে সাড়া দিয়ে থাকেন। বান্দার দ্রুত অগ্রসর হওয়ার মোকাবেলায় তিনি তার দিকে বিদ্যুতের গতিতে ধেয়ে আসেন। এবং পৃথিবী ও আকাশ থেকে তার জন্য নিদর্শন প্রকাশিত করেন। এবং তার বন্ধুদের বন্ধু ও শত্রুদের শত্রু হয়ে

যান। আর যদি পঞ্চাশ কোটি মানুষও তার বিপক্ষে খাড়া হয়ে যায়, তাহলে তাদেরকে এমনভাবে লাঞ্ছিত, পঙ্গু ও অসহায় করে দেন যেন তারা একটা মরা পোকা মাত্র। এবং একজন মানুষের খাতিরেই একটা জগতকে ধ্বংস করে দেন। এবং নিজের যমীন ও আসমানকে তাঁর খাদেম বানিয়ে দেন। এবং তাঁর কথার মধ্যে কল্যাণ ঢেলে দেন। এবং তাঁর সমস্ত ঘর-দুয়ারে আলোকের বৃষ্টিধারা বর্ষণ করেন। এবং তার পোষাকে ও তার খাদ্য-পানীয় এবং সেই মাটি–যার উপরে তার পদক্ষেপ পড়ে তাতেও কল্যাণ দান করেন। তিনি তার চক্ষু হয়ে যান যদ্বারা সে দেখে, এবং তার কর্ণ হয়ে যান দ্বারা সে শোনে, এবং তার জিহ্বা হয়ে যান দ্বারা সে কথা বলে, এবং তার পা হয়ে যান যদ্বারা সে চলা-ফেরা করে, এবং তার হাত হয়ে যান যদ্বারা সে দুশমনের উপরে হামলা চালায়। তিনি তার দুশমনদের বিরুদ্ধে স্বয়ং বেরিয়ে পড়েন, এবং দুষ্কৃতকারীরা – যারা তাকে দুঃখ দেয়, কষ্ট দেয় – তাদের বিরুদ্ধে নিজেই তলোয়ার চালান। এবং প্রত্যেক ময়দানেই তাকে বিজয়ী করেন। এবং আপনার কাজা ও কদর অর্থাৎ নিয়তির রহস্য তাকে জানিয়ে দেন। সংক্ষেপে, তার আধ্যাত্মিক রূপ ও সৌন্দর্য যা সৃষ্টি হয় উত্তম আচরণ ও ব্যক্তিগত ভালবাসায়, তার প্রথম খরিদ্দার হন স্বয়ং খোদা-ই। অতএব, কতই না হতভাগ্য সেই সকল লোক যারা এরূপ যামানা পায় এবং এমন সূর্য তাদের উপরে উদিত হয়, অথচ তারা অন্ধকারেই বসে থাকে!' – (যামিমা বারাহীনে আহমদীয়া, খ. ৫, পৃ. ৬৫–৬৬)

(৫৫)

'আধ্যাত্মিক গড়ন পূর্ণ হয়ে গেলে পর ব্যক্তিগত ঐশী-ভালবাসার শিখা মানুষের হৃদয়ের উপরে একটি রূহ বা প্রেরণার ন্যায় পতিত হয় এবং তাকে (খোদার সামনে) সার্বক্ষণিক ও স্থায়ী উপস্থিতির অবস্থা দান করে। পূর্ণত্বে পৌঁছে দেয়। এবং তখনই তার রূহানী সৌন্দর্য পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়। কিন্তু, এই যে সৌন্দর্য যা রূহানী সৌন্দর্য, যাকে উত্তম আচরণ বলে আখ্যায়িত করা যায়, তা হচ্ছে সেই সৌন্দর্য যা তার আকর্ষণের শক্তির গুণে চেহারার সৌন্দর্যকে অতিক্রম করে যায়। কেননা, চেহারার সৌন্দর্য মাত্র দু'এক ব্যক্তির পার্থিব – প্রেমের কারণ হতে পারে, যা অচিরেই ফুরিয়ে যেতে পারে, এবং যায়ও। এবং তার আকর্ষণও অত্যন্ত অগভীর হয়। কিন্তু, সেই রূহানী সৌন্দর্য, যাকে উত্তম আচরণ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, তা আপনার আকর্ষণে এত দৃঢ় ও প্রবল যে, তা এক জগতকে তার দিকে টেনে নেয়। এবং পৃথিবী ও নভোমন্ডলের প্রতিটি অণু-পরমাণু তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। এবং প্রার্থনা মঞ্জুর বা কবুলিয়তে দোয়ারও প্রকৃত প্রস্তাবে ফিলোসফী এটাই যে, এইরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী মানুষ–যার ভেতরে ঐশী প্রেমের রূহ বা প্রাণ প্রবিষ্ট হয়ে যায়–যখন কোন অসম্ভব ও অত্যন্ত কঠিন বিষয়ের জন্য দোয়া করে, এবং সেই দোয়ার উপরে পুরোপুরি জোর দেয়, ভরসা রাখে ; তখন যেহেতু সে তার সত্তায় রূহানী সৌন্দর্য রাখে, সেহেতু

খোদাতায়ালার হুকুমে ও অনুমতিতে এই জগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু তার দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তখন এমন সব সামগ্রী–সরঞ্জাম জমা হয়ে যায়, যা তার সফলতার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। অভিজ্ঞতা এবং খোদাতায়ালার পবিত্র কেতাব থেকে প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীর প্রত্যেকটি অণু-পরমাণুর সঙ্গে স্বভাবতঃই এইরূপ ব্যক্তির সঙ্গে ভালবাসা সৃষ্টি হয়ে যায়। এবং তার প্রার্থনাসমূহ সকল অণু-পরমাণুকে ঠিক সেইভাবে তার দিকে আকৃষ্ট করে যেভাবে চুম্বক আকর্ষণ করে লৌহকে। অতএব, অতি অসাধারণ ঘটনাবলী, যেগুলির উল্লেখ বিজ্ঞান ও ফিলোসফীতে কোথাও নেই, তা সবই এই আকর্ষণের কারণে প্রকাশিত হয়ে যায়। যখন থেকে মহান সৃষ্টিকর্তা বিশ্বের বস্তুপুঞ্জকে পরমাণু থেকে শুরু করে গঠিত ও রূপায়িত করে তুলেছেন, তখন থেকেই তিনি প্রতিটি পরমাণুর মধ্যে সেই আকর্ষণও রেখে দিয়েছেন এবং প্রতিটি পরমাণুই আধ্যাত্মিক বা রূহানী সৌন্দর্যের প্রকৃত প্রেমিক। প্রতিটি সাধু আত্মাও তা–ই। কেননা, ঐ সৌন্দর্য হচ্ছে সত্য-এর প্রকাশস্থল। ইহাই ছিল সেই সৌন্দর্য যার জন্য বলা হয়েছিল ঃ

اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ

'তোমরা আদমকে (আনুগত্যের) সিজ্‌দা কর, তখন তারা (আনুগত্যের) সিজ্‌দা করলো, কেবল ইবলীস ব্যতীত'–২ঃ৩৫। এবং এখনও বহু ইবলীস রয়েছে যারা ঐ সৌন্দর্যকে চিন্‌তে পারে না ; কিন্তু সৌন্দর্য তার বড় বড় কাজ সম্পাদন করে চলেছে।

নূহ (আঃ)-এর মধ্যে ঐ সৌন্দর্যই ছিল, যার খাতিরে মর্যাদা ও গৌরবের মহান অধিপতি অবিশ্বাসকারীদেরকে পানির (প্লাবনের) শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করে দিয়েছেন। অতঃপর, মূসাও (আঃ) এসেছিলেন ঐ রূহানী সৌন্দর্য নিয়ে, যিনি দিন কতক দুঃখ-কষ্ট পোহাবার পর অবশেষে ফেরাউনের ধ্বংসের কারণ হয়েছিলেন। অতঃপর–, সকলের শেষে এলেন আমাদের প্রভু ও নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম অতি মহামহিমান্বিত, আজিমুশ্‌শান রূহানী সৌন্দর্য নিয়ে, যাঁর প্রশংসার জন্য এই একটি আয়াতে করীমার উদ্ধৃতি দেওয়াই যথেষ্ট ঃ

دَنَا فَتَدَلّٰى ۝ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ۝

'সে নিকবর্তী হলো (আল্লাহ্‌র) তখন তিনিও (মুহাম্মদ সাঃ-এর প্রতি) নীচে নেমে এলেন। অতঃপর, সে উভয় ধনুকের একতন্ত্রী হয়ে গেল, অথবা তা থেকেও ঘনিষ্ঠতর হয়ে গেল।' – (৫৩ঃ৯, ১০)

অর্থাৎ, সেই নবী (সাঃ) জনাবে ইলাহীর (আল্লাহ্‌তায়ালার) অত্যন্ত কাছাকাছি চলে গেলেন এবং আবার মখলুক অর্থাৎ সৃষ্টির দিকে ঝুঁকে পড়লেন, এবং এইভাবে উভয় প্রকারের হক্‌ বা অধিকারকে – হুকুকুল্লাহ্‌ ও হুকুকুল ইবাদ – (আল্লাহ্‌র অধিকার ও সৃষ্টির অধিকার) –পূর্ণ (আদায়) করে দিলেন ; এবং উভয় প্রকারের আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য প্রকাশিত করলেন।' – (যামীমা বারাহীনে আহমদীয়া, ৯.৫, পৃ. ৬১,৬২)

'জলসায় যে প্রবন্ধটি পাঠ করা হয়েছিল, সেই প্রবন্ধে বক্তা বর্ণনা করেছেন যে, পরমেশ্বর ক্রোধ, ঘৃণা, বিদ্বেষ ও হিংসা থেকে মুক্ত। হতে পারে ঐ বক্তৃতার উদ্দেশ্য একটাই ছিল যে, কোরআন শরীফে যেহেতু, খোদাতায়ালা সম্পর্কে **গযব** বা ক্রোধ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সেহেতু তিনি সম্ভবতঃ তাঁর উক্ত প্রবন্ধে কোরআন শরীফের মোকাবেলায় দেখাতে চেয়েছেন যে, বেদ-এর শিক্ষা এইরূপ ধারণা থেকে মুক্ত যে, খোদা রাগও করে থাকেন। কিন্তু, এটা তাঁর সম্পূর্ণ ভুল (ধারণা)। মনে রাখতে হবে যে, কোরআন শরীফে কোন অযথা ও অত্যাচারমূলক ক্রোধের কথা খোদাতায়ালার প্রতি আরোপ করা হয়নি। বরং, এর উদ্দেশ্য শুধু এতটুকুই যে, অত্যন্ত পাক-পবিত্র হওয়ার কারণে খোদাতায়ালার মধ্যে এক প্রকার ক্রোধ-সদৃশ গুণ রয়েছে, এবং সেই গুণ-এর চাহিদা হচ্ছে, যে ব্যক্তি না ফরমান বা অমান্যকারী এবং যে তার অবাধ্যতার একগুয়েমী বা বিদ্রোহ থেকে ফিরে না আসে, তাকে শাস্তি দেওয়া হোক। এবং এক-দ্বিতীয় গুণ তাঁর মহব্বত-সদৃশ, এবং এই গুণের চাহিদা হচ্ছে, ফরমাঁবরদার বা আনুগত্যকারীকে পুরস্কৃত করা হোক। তাই, বুঝানোর জন্য প্রথম গুণ-এর নাম রাখা হয়েছে গযব বা ক্রোধ, এবং দ্বিতীয় গুণ-এর নাম মহব্বত বা ভালবাসা। কিন্তু, না সেই ক্রোধ মানবীয় ক্রোধের ন্যায়, না সেই ভালবাসা মানবীয় ভালবাসার ন্যায়। যেমন, খোদাতায়ালা স্বয়ং কোরআন শরীফে বলেছেন ঃ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ

'কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়' – ৪২ঃ১২।

অর্থাৎ, খোদার সত্তা ও গুণাবলীর সদৃশ কিছু নেই। ভাল কথা, আমরা জানতে চাই যে, আর্যদের বেদ-এর শিক্ষানুসারে, তাদের পরমেশ্বর পাপীকে শাস্তি দেন কেন ? এমনকি যে, তিনি মানুষকে মানুষের স্তর থেকে বহু নীচে নিক্ষেপ করে কুত্তা, শূকর, বানর, বিড়াল প্রভৃতি বানিয়ে দেন। কাজেই তার মধ্যে এমন এক গুণ রয়েছে বলে স্বীকার করতেই হয়, যা তাঁর ঐ কাজের জন্য অপরিহার্য। এই গুণটির নামই কোরআন শরীফে বলা হয়েছে 'গযব'। .... যদি তাঁর মধ্যে এই প্রকারের গুণ না থাকে, যার চাহিদা হচ্ছে পরমেশ্বর পাপীদেরকে শাস্তি দিবেন, তাহলে পরমেশ্বরের প্রকৃতি শাস্তি দেওয়ার জন্য মনোযোগী হয় কেন ? আসলে, তাঁর মধ্যে এই গুণ রয়েছে, যা বদলা দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। অতএব, এই গুণেরই নাম হচ্ছে 'গযব' বা ক্রোধ। কিন্তু এই ক্রোধ মানবীয় ক্রোধের সদৃশ নয়, বরং তা খোদার মহিমার সদৃশ। আর এই ক্রোধের কথাই বলা হয়েছে কোরআন শরীফে। . . . . যখন তিনি কোন সৎকর্ম বা নেক আমলাকারীকে আপন পুরস্কারে ভূষিত করেন, তখন বলা হয় যে, তিনি তাকে ভালবাসেন। আর, যখন তিনি কোন অসৎ কাজ বা বদ আমলকারীকে শাস্তি দান করেন, তখন বলা হয় যে, তিনি তার প্রতি রাগান্বিত হয়েছেন। মোদ্দা কথা, বেদগুলির মধ্যে যেমন ক্রোধ বা গযব-এর কথা বলা হয়েছে, তেমনি কোরআন

শরীফের মধ্যেও বলা হয়েছে। পার্থক্য শুধু এতটাই যে, বেদগুলি খোদার 'গযব'কে এতদূর পর্যন্ত পৌছিয়ে দিয়েছে এবং এই ডিক্রীও দান করেছে যে, তিনি ভীষণ ক্রোধের বশে মানুষদেরকে তাদের পাপের কারণে পোকা-মাকড় পর্যন্ত বানিয়ে ছেড়েছেন। কিন্তু, কোরআন শরীফ খোদাতায়ালার গযবকে সেই সীমা পর্যন্ত পৌছায়নি। বরং, কোরআন শরীফে লিখিত আছে যে, খোদা শাস্তি দেওয়া সত্ত্বেও মানুষকে মানুষই রাখেন, অন্য আর কোন যোনিতে নিক্ষেপ করেন না। এথেকে প্রমাণিত হয় যে, কোরআন শরীফের দৃষ্টিতে খোদাতায়ালার মহব্বত ও রহমত তার গযব-এর চাইতে অনেক বেশী, অনেক বড়। পক্ষান্তরে, বেদ-এর দৃষ্টিতে পাপীদের শাস্তির কোন সীমা-পরিসীমা নেই, এবং পরমেশ্বরের মধ্যে কেবল গযব আর গযব, তাঁর মধ্যে রহমত-এর কোন নাম-নিশানাও নেই। কিন্তু, কোরআন শরীফ থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, অবশেষে, দোযখীদের উপরেও এমন একদিন আসবে যখন খোদা সবার উপরেই রহম করবেন।' – (চশমা মা'রেফত, পৃ. ৩৮-৪২)

(৫৭)

'ইঞ্জিলে আছে যে, তোমরা এইভাবে দোয়া করো ঃ হে আমাদের পিতা-যে আসমানে আছ – তোমার নামের পবিত্রতা ঘোষিত হোক, তোমার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হোক, তোমার ইচ্ছা যেভাবে স্বর্গে পূর্ণ হয়েছে, সেইভাবে পৃথিবীতেও পূর্ণ হোক। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য আজ আমাদেরকে দান করো। এবং যেভাবে আমরা আমাদের ঋণীদেরকে ক্ষমা করে দেই, সেইভাবে তুমি আমাদের ঋণ মওকুফ করে দাও। এবং আমাদেরকে পরীক্ষার মধ্যে ফেলিও না। বরং খারাপী থেকে রক্ষা করো। কেননা, রাজত্ব এবং ক্ষমতা এবং প্রতাপ কেবল তোমারই। পক্ষান্তরে, কোরআন বলে, এটা নয় যে, পৃথিবী পবিত্রতা থেকে খালি, বরং পৃথিবীতেও খোদার পবিত্রতা ঘোষিত হচ্ছে, শুধু আসমানেই নয়। যেমন, এতে বলা হয়েছে ঃ وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

'এমন কিছুই নেই যা তাঁর প্রশংসাসহ তসবীহ্ করছে না' – (১৭ঃ৪৫)

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

'আসমানসমূহে যা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সকলই আল্লাহ্‌র তস্‌বীহ্ (পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা) করছে' – (৬২ঃ২)

অর্থাৎ, যমীন ও আসমানে প্রতিটি অণু-পরমাণু খোদাতায়ালার প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা করে চলেছে এবং যা কিছু তাদের মধ্যে রয়েছে তা সবই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা কীর্তনে মশগুল বা মগ্ন রয়েছে। পাহাড় তাঁর স্মরণে বা যিক্‌রে মশগুল; দরিয়া তাঁর যিক্‌রে মশগুল ; বৃক্ষ তাঁর যিক্‌রে মশগুল। এবং অসংখ্য সাধু ব্যক্তি তাঁর যিক্‌র ও ধ্যানে মগ্ন রয়েছে। এবং যে ব্যক্তি হৃদয় ও বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে তাঁর স্মরণে মশগুল নয়, এবং খোদার সামনে অনুনয়-বিনয় করে না, তাকে থেকে থেকেই নানাবিধ দুঃখ যাতনা ও শাস্তি দিয়ে খোদাতায়ালার 'কাযা ও

কদর' বা নিয়তি তাকে বিনীত হতে বাধ্য করছে। এবং যা কিছু ফেরেশ্‌তাদের সম্পর্কে খোদার কিতাবে লিখিত আছে, যেমন, তারা চূড়ান্ত স্তরের আনুগত্য করে চলেছে, তেমনি একই অবস্থা এই পৃথিবীর প্রতিটি স্তর এবং প্রতি পরমাণু সম্পর্কে কোরআন শরীফে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, প্রতিটি জিনিষই তাঁর আনুগত্য করে চলেছে। একটি পাতাও তাঁর বিনা হুকুমে পতিত হয় না। তাঁর আদেশ ছাড়া, না কোন ঔষধ রোগ নিরাময় করতে পারে, না কোন খাদ্য খাবারের উপযোগী হতে পারে। এবং প্রত্যেকটি জিনিস চরম বিনয় ও ইবাদত-মগ্নতা বা উবূদিয়্যতসহ খোদাতায়ালার আস্তানায় পড়ে আছে। এবং তাঁর ফরমাঁবরদারী বা আজ্ঞানুবর্তিতায় নিমগ্ন রয়েছে। পর্বতসমূহ ও ভূমন্ডলের অণু-পরমাণু, নদ-নদী ও সাগর মহাসাগরের বিন্দু বিন্দু পানি এবং বৃক্ষরাজি ও লতা-গুল্মের প্রতিটি পাতা, প্রতিটি অংশ, এবং মানুষ ও প্রাণিকূলের প্রতিটি পরমাণু সবাই খোদাতায়ালাকে চিনে এবং তাঁর আনুগত্য করে, এবং তাঁর স্তুতি ও প্রশংসা কীর্তনে মশগুল রয়েছে। এ কারণেই আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন ঃ

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

'আসমানসমূহে যা কিছু আছে এবং ভু-মন্ডলে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র তসবীহ্ (পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা) করছে।'

অর্থাৎ, আকাশের উপরে যেমন প্রতিটি বস্তু খোদার মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করছে, তেমনি ভূমন্ডলের প্রতিটি বস্তুও তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে। তাহলে, একথা কী করে বলা যায় যে, পৃথিবীতে খোদাতায়ালার মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষিত হচ্ছে না ? এ ধরনের কথা কোন প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী বা কামেল-আরেফ-এর মুখ থেকে নির্গত হতে পারে না। বরং, **পৃথিবীর বস্তুসমূহের মধ্যে কোন কোন বস্তু শরীয়তের হুকুম-আহ্‌কাম পালন করে চলেছে এবং কোন কোন বস্তু কাযা ও কদরের বা নিয়তির বিধান মেনে চলেছে, আর কোন কোন বস্তু উভয় নিয়মেরই পূর্ণ আনুগত্য করে যাচ্ছে**। কি মেঘ, কি হাওয়া, কি আগুন, কি মৃত্তিকা সব কিছুই খোদার আনুগত্য ও প্রশংসায় রত রয়েছে। **যদি কোন মানুষ ঐশী শরীয়ত বা বিধানের হুকুম অমান্য করে, তাহলেও সে ঐশী কাযা ও কদর-এর তলে থাকবেই। কেউই এই উভয় শাসন-ব্যবস্থার বাইরে নয়**। কোন না কোন আসমানী বা স্বর্গীয় শাসন বা হুকুমত-এর জোঁয়াল প্রত্যেকেরই ঘাড়ে রয়েছে। এটা ঠিক যে, মানব-হৃদয়ের পবিত্রতা ও পংকিলতা অনুপাতে খোদার যিক্‌র ও গাফলতি পৃথিবীতে পর্যায়ক্রমে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। কিন্তু, এই জোয়ার–ভাটা খোদার হেকমত ও মুসলেহাত (প্রজ্ঞা ও আবশ্যকতা) ব্যতীত কখনই আপনা আপনি সংঘটিত হয় না। খোদা চেয়েছেন যে, পৃথিবীতে এমনই ঘটুক, তাই তা ঘটছেও। অতএব, হেদায়াত ও জাহালত – পথ প্রদর্শন ও পথ-ভ্রষ্টতার আবর্তন দিন ও রাত্রির আবর্তনের ন্যায় খোদার বিধান ও অনুমতি অনুসারে ঘটে চলেছে, আপনা আপনি ঘটছে না। এতদ্‌সত্ত্বেও, প্রত্যেকটি বস্তু তাঁর আওয়াজ শুনে থাকে। এবং তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে। কিন্তু, ইঞ্জিল বলে যে, পৃথিবী খোদার পবিত্রতা ঘোষণা

থেকে শূন্য পড়ে আছে। এর কারণ, উপর্যুক্ত ইঞ্জিলী দোয়ার পরবর্তী বাক্যে ইশারার আকারে, বর্ণনা করা হয়েছে। এবং তা হচ্ছে এই যে, এখনও এতে (পৃথিবীতে) খোদার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নি। সে জন্যই, শাসন বা হুকুমত না থাকার দরুন, অন্য কোনভাবে, খোদার ইচ্ছা-এরাদা ঠিক সেইভাবে পৃথিবীর বুকে প্রবর্তিত হতে পারেনি, যেভাবে তা প্রবর্তিত হয়েছে আকাশের বুকে। কিন্তু কোরআনের শিক্ষা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এ তো স্পষ্ট ভাষায় বলে যে, চোর, খুনী, ব্যভিচারী, কাফের, ফাসেক, অবাধ্য ও দুষ্কৃতকারী কেউই কোন প্রকারের অপকর্ম পৃথিবীতে করতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আসমান থেকে তাকে এখতিয়ার বা স্বাধিকার দেওয়া হয়। তাহলে, কীভাবে বলা যায় যে, আসমানী বা স্বর্গীয় রাজত্ব পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত নেই। কেন, কোন বিরোধী আধিপত্য কি পৃথিবীতে খোদার হুকুম জারি হতে বাধা দিতে পারে ? সোবহানাল্লাহ্ ! এটা কখনই হতে পারে না। বরং খোদা স্বয়ং আসমানে ফেরেশ্‌তাদের জন্য পৃথক কানুন প্রবর্তন করেছেন এবং পৃথিবীতে মানুষের জন্য পৃথক কানুন। এবং খোদা তাঁর আসমানী বাদশাহাত বা রাজত্বে ফেরেশ্‌তাদেরকে কোনও এখতিয়ার দেননি। বরং, তাদের স্বভাবের মধ্যে শুধু আনুগত্যেরই উপাদান রেখে দিয়েছেন। তারা বিরুদ্ধাচরণ করতেই পারে না। ভ্রান্তি ও বিস্মৃতি তাদের উপরে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। কিন্তু, মানব-স্বভাবের মধ্যে মান্যতার ও অমান্যতার এখ্‌তিয়ার দেওয়া হয়েছে। এবং যেহেতু, এই এখ্‌তিয়ার উপর থেকে দেওয়া হয়েছে, সেহেতু একথা বলা যাবে না যে, অমান্যকারী বা ফাসেক লোকদের বিদ্যমানতায় খোদার রাজত্ব পৃথিবীর বুক থেকে উঠে যাচ্ছে। বরং, একথাই বলতে হবে যে, সর্বাবস্থায় খোদাতায়ালার–রাজত্ব বা বাদশাহাত বলবৎ রয়েছে। তবে, হ্যাঁ, **কানুন রয়েছে দু'প্রকারের। এক, – আসমানের ফেরেশ্‌তাদের জন্য নিয়তি বা কাযা ও কদর-এর কানুন ; এবং তা হচ্ছে, ফেরেশ্‌তারা খারাপী কিছু করতেই পারে না। অপর কানুন, যা পৃথিবীর বুকে মানুষের জন্য খোদাতায়ালার কাযা ও কদর অনুযায়ী নির্ধারিত ; তা হচ্ছে আসমান থেকেই তাদেরকে খারাপী করবারও এখ্‌তিয়ার বা চয়েচ (Choice) দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, যখন তারা খোদার কাছে শক্তি প্রার্থনা করে, অর্থাৎ ইস্তেগফার করে, তখন রূহুল কুদ্দুস বা পবিত্র আত্মার সহায়তায় তাদের দুর্বলতা দূর হয়ে যেতে পারে, এবং পাপের তাড়না থেকে বেঁচে যেতে পারে, খোদার নবী-রসূলদের মতই। আর যদি এমন লোক থাকে যে, সে পাপী হয়ে গেছে, তাহলে 'ইস্তেগফার' তাকে এই ফায়দা পৌঁছাবে যে, পাপের প্রতিফল থেকে অর্থাৎ আযাব থেকে সে বেঁচে যাবে।** কেননা, আলো এসে গেলে অন্ধকার টিকে থাকতে পারে না। এবং এমন দুষ্কৃতকারী, যে 'ইস্তেগফার' করে না' অর্থাৎ খোদার কাছে শক্তি ভিক্ষা চায় না, সে তার অপরাধের শাস্তি পেতেই থাকে। দেখো ! ইদানিং, প্লেগও শাস্তির আকারে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছে, এবং খোদার অবাধ্য লোকেরা এর দ্বারা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। অতএব, কী করে বলা যায় যে, খোদার রাজত্ব পৃথিবীতে নেই ? এই ধারণা কক্ষণো পোষণ করবে না যে, পৃথিবীতে যদি খোদার রাজত্ব থাকবেই, তাহলে আবার, লোকেরা পাপে লিপ্ত হয়

কী করে ? কেননা, পাপও খোদার কাযা ও কদর বা নিয়তির অধীন। সুতরাং, যদিও ঐ সমস্ত লোক শরীয়তের কানুনের বাইরে যায়, তবু তারা নিয়তির বিধানের বা কাযা ও কদরের বাইরে যেতে পারে না। অতএব, কী করে বলা যাবে যে, পাপী ব্যক্তি ইলাহী সালতানাত বা ঐশী রাজত্বের জোঁয়াল নিজের স্কন্ধে রাখে না ? .... এই মুহূর্তে যদি খোদাতায়ালার কানুন কঠোর হয়ে যায়, এবং প্রত্যেক ব্যভিচারীর উপরে বজ্রপাত হয়, এবং প্রত্যেক চোর যদি এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় যে, পচে গিয়ে গলে যায়, এবং প্রত্যেক বিদ্রোহী যে খোদাকে অস্বীকার করে, খোদার ধর্মকে অস্বীকার করে, সে যদি প্লেগের কবলে পড়ে মারা যায়, তাহলে তো এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই সমগ্র পৃথিবী ধর্ম পরায়ণতা ও পুণ্য-আচরণের চাদর পরিধান করবে। কাজেই, খোদার রাজত্ব পৃথিবীর বুকে তো আছেই; কিন্তু আসমানী কানুনের অনুকম্পা এই স্বাধীনতাও দিয়ে রেখেছে যে, পাপীকে সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেফতার করা হয় না। তবে হ্যাঁ, শাস্তিও হতেই থাকে। ভূমিকম্প হয়, বজ্রপাত হয়, আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত আতশবাজির ন্যায় ছড়িয়ে পড়ে এবং হাজারো প্রাণের ক্ষতিসাধন করে। জাহাজ-ডুবী হয়ে, রেল-দুর্ঘটনা ঘটে শত শত প্রাণ বিনষ্ট হয়ে যায়। তুফান আসে, ঘরবাড়ী ধ্বংস হয়। সাপে কামড়ায়। হিংস্রজন্তু চিরে ফেলে। মহামারী দেখা দেয়। ধ্বংস করার জন্য একটি নয় বরং এইরূপ হাজার হাজার দরজা উন্মুক্ত রয়েছে, যা কিনা পাপীদের শাস্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে খোদাতায়ালার প্রাকৃতিক বিধানে বা কানুনে কুদরতে। অতঃপর, কী করে বলা যাবে যে, খোদার রাজত্ব পৃথিবীর বুকে নেই ? সত্য তো এটাই যে, রাজত্ব আছেই। প্রত্যেক অপরাধীর হাতে হাতকড়ি পরানো আছে, পায়ে জিঞ্জির লাগানো আছে। কিন্তু, ঐশী-প্রজ্ঞা অর্থাৎ ইলাহী হেকমত স্বীয় কানুনকে এতটুকু নরম বা শিথিল করে দিয়েছে যে, ঐ সকল হাতকড়া ও জিঞ্জির সঙ্গে সঙ্গেই কার্যকর হয় না। অবশেষে, মানুষ যদি পাপ থেকে বিরত না হয়, ফিরে না আসে, তাহলে তাকে তা দীর্ঘস্থায়ী জাহান্নামে পৌঁছে দেয় এবং তাকে সেই আযাবে নিক্ষেপ করে, যার মধ্যে পাপী না বাঁচে, না মরে।'

সংক্ষেপে, **কানুন দু'প্রকার**। এক হচ্ছে সেই কানুন, যা ফেরেশ্‌তাদের জন্য। তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে শুধু আনুগত্য বা এতায়াত করার জন্যই। এবং তাদের এতায়াত হচ্ছে তাদের উজ্জ্বল স্বভাবের এক বৈশিষ্ট্য। তারা পাপ করতে পারে না, পুণ্যের ক্ষেত্রেও উন্নতি করতে পারে না।

দ্বিতীয় প্রকার কানুন হচ্ছে সেই কানুন, যা মানুষের জন্য প্রযোজ্য। মানুষের স্বভাবে এটা নিহিত রাখা হয়েছে যে, সে পাপ করতে সক্ষম। কিন্তু সে পুণ্যের ক্ষেত্রে উন্নতিও করতে সক্ষম। এই উভয় ফিৎরতী বা স্বাভাবিক কানুন অপরিবর্তনীয়। ফেরেশ্‌তা যেমন মানুষে রূপান্তরিত হতে পারে না, তেমনি মানুষও ফেরেশ্‌তা হতে পারে না। এই উভয় কানুন পরিবর্তিত হতে পারে না। এগুলি অটল ও চিরন্তনী। এ কারণেই, স্বর্গীয় ঐ কানুন যমীনের উপরে আসতে পারে না। এবং যমীনের কানুনও ফেরেশ্‌তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না। মানবীয় পাপ ও অপরাধ যদি তওবা বা অনুতাপের মাধ্যমে শেষ হয়ে যায়,

তাহলে তা মানুষকে ফেরেশ্‌তার চাইতেও উত্তম করতে পারে। কেননা, ফেরেশ্‌তাদের মধ্যে উন্নতির উপাদান নেই। মানুষের পাপ তওবা দ্বারা মাফ হয়ে যায়। এবং ইলাহী হেকমত–ঐশী প্রজ্ঞা কোন কোন ব্যক্তির মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি করবার ধারা অবশিষ্ট রেখে দেয়, যাতে করে পাপ করবার পর সে তার দুর্বলতাসমূহ উপলব্ধি করতে পারে এবং তওবা করে ক্ষমা প্রাপ্ত হয়। এটাই সেই কানুন যা মানুষের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে। এবং মানব-প্রকৃতিও এটাই চায়। ভুল-ত্রুটি করা এবং ভুলে যাওয়া মানুষের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, ফেরেশ্‌তার নয়। কাজেই, যে কানুন ফেরেশ্‌তাদের জন্য নির্ধারিত তা মানুষের ক্ষেত্রে কী করে কার্যকর হবে ? এটা তো ভুল বা অন্যায় কথা যে, খোদাতায়ালার প্রতিও কোন প্রকার দুর্বলতা আরোপ করা হয়। পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে তা প্রাকৃতিক নিয়ম বা কানুনের ফলেই ঘটছে। নাউযুবিল্লাহ্ ! খোদা কি এতই দুর্বল যে, তাঁর বাদশাহাত বা রাজত্ব এবং শক্তি এবং প্রতাপ শুধু আকাশেই সীমাবদ্ধ ? কিংবা পৃথিবীতে অন্য আর কোন খোদা আছেন যিনি পৃথিবীতে বিরুদ্ধ আধিপত্য বজায় রেখেছেন ?

খৃষ্টানদের এ কথার উপরে জোর দেওয়া ঠিক নয় যে, শুধু আকাশের উপরেই খোদার রাজত্ব বজায় রয়েছে, পৃথিবীতে তা এখনও কায়েম হয়নি। কেননা, তারা এটা বিশ্বাস করে যে, আকাশ কোন পদার্থ নয়। অতএব, আকাশ যেহেতু কোন পদার্থই নয়, সেহেতু সেখানে তো খোদার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আর পৃথিবীতেও খোদার রাজত্ব এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কাজেই, দেখা যাচ্ছে যে, খোদার রাজত্ব এখনও কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয় নি। অথচ, পৃথিবীতে খোদার রাজত্ব আমরা স্বয়ং স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। তাঁর প্রাকৃতিক বিধান অনুসারেই আমাদের আয়ূ শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। এবং শত শত প্রকারের সুখ ও দুঃখ আমরা ভোগ করছি। হাজার হাজার মানুষ খোদার হুকুমে মারা যাচ্ছে, এবং হাজার হাজার জন্ম গ্রহণ করছে। প্রার্থনা গৃহীত হচ্ছে। নিদর্শন প্রকাশিত হচ্ছে। যমীন হাজারো ধরনের উদ্ভিদ এবং ফুল ও ফল তাঁর হুকুমে উৎপন্ন করছে। এ সব কিছুই কি, তাহলে খোদার বাদশাহাত ছাড়াই হচ্ছে ? পক্ষান্তরে আসমানী বস্তুসমূহ তো একই অবস্থায় ও নিয়মে চলমান রয়েছে। এগুলোর মধ্যে তো এমন কোন আবর্তন ও পরিবর্তন অনুভূত হয় না, যদ্দরুন বুঝা যেতে পারে যে, কোন আবর্তন ও পরিবর্তনকারী রয়েছে। কিন্তু, পৃথিবীতে তো হাজারো ধরনের আবর্তন, বিবর্তন ও পরিবর্তন ঘটে চলেছে। প্রতিদিন কোটি কোটি মানুষ দুনিয়া থেকে চলে যাচ্ছে, কোটি কোটি জন্মগ্রহণ করছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি পন্থায় একজন শক্তিশালী স্রষ্টার নিয়ন্ত্রণ অনুভূত হচ্ছে। এর পরও কি বলতে হবে যে, পৃথিবীতে খোদার রাজত্ব নেই ? এবং ইঞ্জিলও তো এ ব্যাপারে কোনও প্রমাণ বা দলীল পেশ করতে পারেনি যে, কেন আজও অব্দি পৃথিবীর বুকে খোদাতায়ালার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এটা ঠিক যে, মসীহ্ (যীশু) নিজের জান বাঁচানোর জন্য বাগানের মধ্যে রাতভর যে দোয়া করেছিলেন, সেই দোয়া কবুল হওয়া সত্ত্বেও (যেমনটা লিখিত রয়েছে হিব্রুঃ

অধ্যায় ৫, শ্লোক ৭-এ) খোদার পক্ষে তাঁকে মুক্ত করতে না পারাটা খৃষ্টানদের মতে একটা প্রমাণ হতে পারে যে, সেই যামানায় পৃথিবীতে খোদার রাজত্ব ছিল না। কিন্তু, আমরা তো এর চাইতেও কঠিন পরীক্ষায় পড়েছি এবং তাথেকে পরিত্রাণও পেয়েছি। আমরা কী করে খোদার বাদশাহাতকে অস্বীকার করবো ? কেন ? সেই যে খুনের মোকদ্দমা, যা আমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে মার্টিন ক্লার্কের পক্ষ থেকে ক্যাপ্টেন ডগলাস-এর আদালতে দায়ের করা হয়েছিল, তা কি ঐ মোকদ্দমা থেকে কোন অংশে কম বিপজ্জনক ছিল, যা কেবল ধর্মীয় মতভেদের কারণে ইহুদীদের পক্ষ থেকে করা হয়েছিল, কোন খুনের অভিযোগে করা হয়নি ? কিন্তু, যেহেতু, খোদাতায়ালা পৃথিবীরও বাদশা যেমন তিনি আসমানেরও বাদশাহ, সেহেতু তিনি এই মোকদ্দমার পূর্বেই খবর দিয়ে রেখেছিলেন যে, বিপদ আসন্ন। এবং এই খবরও দিয়েছিলেন, আমি তোমাকে উদ্ধার করবো। এবং সেই খবর শত শত মানুষকে ঘটনার পূর্বেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এবং অবশেষে, আমাকে উদ্ধারও করা হয়েছিল। অতএব, এটা ছিল সেই খোদারই বাদশাহাত, যিনি আমাকে উদ্ধার করেছিলেন সেই মোকদ্দমা থেকে যা খাড়া করা হয়েছিল মুসলমান এবং হিন্দু এবং খৃষ্টানদের পক্ষ থেকে সমবেতভাবে। এমনটা শুধু একবারই নয় বরং বহু বহু বার আমি খোদার আধিপত্য বা বাদশাহাত পৃথিবীর বুকে প্রত্যক্ষ করেছি এবং বাধ্য হয়েছি আমি ঈমান আনতে খোদাতায়ালার এই আয়াতে উপরে ঃ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

'আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর স্বত্বাধিকার তাঁরই' -(৫৭ঃ৩)। অর্থাৎ যমীনের উপরেও আল্লাহ্‌র বাদশাহাত, আকাশের উপরেও। আবার এই আয়াতের প্রতিও ঈমান আনতে বাধ্য হয়েছি ঃ اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ۝

'তাঁর কর্মপদ্ধতি তো এইরূপ যে, যখন তিনি কোন কিছু ইচ্ছা করেন, তখন তিনি তাকে শুধু বলেন, 'হও', তখন তা হয়ে যায়-'(৩৬ঃ৮৩)। অর্থাৎ, তামাম যমীন ও আসমান তাঁর আনুগত্য করে চলেছে। যখন কোন কাজকে চান, তখন বলেন, হয়ে যাও, আর তৎক্ষণাৎই সেই কাজ হয়ে যায়। আরও বলেছেন ঃ

وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰٓى اَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ۝

'আল্লাহ্ তাঁর কার্য সম্পাদনের উপরে পূর্ণ ক্ষমতাবান, কিন্তু অধিকাংশ লোকে তা জানে না' - (১২ঃ২২)। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছা অভিপ্রায়ের উপরে বিজয়ী, কিন্তু অধিকাংশ লোকে খোদাতায়ালার 'কহর ও জবর' বা ক্ষমতা ও প্রাধান্য সম্পর্কে অজ্ঞ।

বস্তুতঃ, এ তো হচ্ছে ইঞ্জিলের সেই দোয়া যা কিনা মানুষকে খোদার রহমত থেকে নিরাশ করে ফেলে, এবং তাঁর রবুবিয়্যত বা প্রতিপালকত্ব ও কৃপা-অনুগ্রহ এবং পুরস্কার ও শাস্তি থেকে খৃষ্টানদেরকে উদাসীন বা লা-পরওয়া করে তোলে। এবং তাঁকে পৃথিবীর বুকে সাহায্য করতে সক্ষম মনে করে না ; কেননা, এখনও পৃথিবীতে তাঁর রাজত্বই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। কিন্তু, এর মোকাবেলায় যে

দোয়া খোদাতায়ালা মুসলমানদেরকে কোরআন করীমে শিখিয়েছেন তা এই কথাই ব্যক্ত করছে যে, পৃথিবীর উপরে খোদা রাজ্যহারা লোকদের ন্যায় অসহায় নন। বরং, তাঁর রবুবিয়্যত, রহমানিয়্যত, রহীমিয়্যত ও মালিকিয়্যত বা মু'জাযাতে-এর ধারা পৃথিবীতে জারি রয়েছে ; এবং তিনি আপন বান্দাদেরকে সাহায্য করতেও সক্ষম এবং অপরাধীদেরকে তাঁর গযব দ্বারা ধ্বংস করতেও সক্ষম। এবং সেই দোয়া হচ্ছে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি জগতসমূহের প্রভু- প্রতিপালক, অযাচিত অসীম দাতা, পরম কৃপা ও করুণাময়, বিচার দিবসের মালিক। আমরা তোমারই এবাদত করি এবং তোমারই নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করি। তুমি আমাদেরকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত কর – তাদেরই পথে যাদেরকে তুমি পুরষ্কৃত করেছ ; কোপগ্রস্তদের (পথে) নয়, এবং পথভ্রষ্টদেরও (পথে) নয়।' (আমীন)।

অর্থাৎ, তিনিই তো সেই খোদা যিনি যাবতীয় প্রশংসার একমাত্র অধিকারী। অন্যকথায়, তাঁর বাদশাহাত-এর মধ্যে কোন প্রকারের কোন ত্রুটি নেই, বিচ্যুতি নেই। এবং তাঁর সৌন্দর্যাবলীর জন্য এমন কোন কিছুরই অপেক্ষা করতে হয় না, যা আজ নয় কাল পাওয়া যাবে। তাঁর রাজত্বে কোনও কিছুই ব্যর্থ নয়। তিনি সকল জগতকে লালন-পালন করছেন। তিনি কর্মফল ছাড়াই রহমত করছেন। এবং কর্মফলের কারণেও রহমত করছেন। পুরস্কার ও শাস্তি যথাসময়ে দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরই এবাদত করি আমরা এবং তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি আমরা। এবং এই দোয়া আমরা করি যে, আমাদেরকে সকল প্রকার নেয়ামত-এর পথ দেখাও, এবং ক্রোধ বা গযব-এর পথ ও ভ্রষ্টতার পথ থেকে আমাদেরকে বাঁচাও। আমীন।

এই যে দোয়া, যা শিখানো হয়েছে 'সূরা ফাতেহা'-এর মধ্যে, তা ইঞ্জিলের দোয়ার সম্পূর্ণ উল্টো-'এন্টিথেসিস'। কেননা, ইঞ্জিলে পৃথিবীর বুকে খোদার রাজত্ব কায়েম থাকাটাকে অস্বীকার করা হয়েছে। সুতরাং ইঞ্জিলের দৃষ্টিতে পৃথিবীর উপরে খোদাতায়ালার না রবুবিয়্যত কার্যকর রয়েছে, না রহমানিয়্যত, না রহীমিয়্যত, না পুরষ্কার ও শাস্তি দানের ক্ষমতা। কেননা, এখনও পর্যন্ত পৃথিবীর উপরে খোদার রাজত্বই কায়েম হয়নি। কিন্তু, সূরা ফাতেহা থেকে জানা যাচ্ছে যে, পৃথিবীর উপরে খোদার বাদশাহাত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এ জন্যই সূরা ফাতেহায় বাদশাহাতের যাবতীয় সরঞ্জামের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, বাদশাহ্-এর মধ্যে এই গুণ থাকা অপরিহার্য যে, তিনি মানুষের প্রতিপালনের ক্ষমতা রাখবেন। সুতরাং সূরা ফাতেহায় **'রব্বুল আলামীন'** বলার

মাধ্যমে সেই গুণকেই সাব্যস্ত করা হয়েছে। আবার, দ্বিতীয় গুণ বাদশাহ্‌র মধ্যে এই থাকা আবশ্যক যে, প্রজাদের আবাদীর জন্য বা জীবনযাপনের জন্য অতি আবশ্যকীয় যে সমস্ত জিনিসের প্রয়োজন, তা সবই তিনি স্বয়ং তাদের কোন কর্মের বিনিময়ে নয়, বরং রাজোচিত কৃপাবশেই তাদেরকে দান করবেন ; এবং এই গুণ তাঁর সাব্যস্ত করা হয়েছে আর **'রহমান'** শব্দের দ্বারা। তৃতীয় গুণ বাদাশাহ্‌র জন্য এটাই থাকতে হবে যে, প্রজাগণ যে কাজকে তাদের প্রচেষ্টায় পূর্ণ সফলতা দিতে পারবে না, তা সফল করার জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য করবে। তাই, **'আর-রহীম'** শব্দ দ্বারা সেই গুণকেই প্রতিপন্ন করা হয়েছে। চতুর্থ গুণ বাদশাহ্‌র যা থাকা প্রয়োজন তা হচ্ছে, তিনি পুরস্কার ও শাস্তিদানের ক্ষমতা রাখবেন, যাতে করে রাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়। সুতরাং তা-ও বলে দেওয়া হয়েছে **'মালিকে ইয়াওমেদ্দীন'** বলার মাধ্যমে। সার কথা হচ্ছে, উপরে উল্লিখিত সূরাটির মধ্যে বাদশাহ্‌র জন্য সেই সকল অপরিহার্য গুণ-এর কথা বর্ণনা করা হয়েছে, যার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, পৃথিবীর উপরেও খোদাতায়ালার বাদশাহাত ও বাদশাহীর কার্যক্রম প্রতিষ্ঠিত এবং অব্যাহত রয়েছে . . . . ।

শোন এবং বুঝতে চেষ্টা করো যে, সব চাইতে বড় মা'রেফত হচ্ছে, পৃথিবীর প্রতিটি অণু-পরমাণু ঠিক তেমনি খোদাতায়ালার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, যেমন তাঁর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে আসমানের প্রতিটি অণু-পরমাণু। এবং যেমন আসমানের উপরে এক আজিমুশ্‌শান তাজাল্লী বা মহান জ্যোতির্বিকাশ বিদ্যমান রয়েছে, তেমনি পৃথিবীর উপরেও এক আজিমুশ্‌শান বা মহিমান্বিত জ্যোতির্বিকাশ বিদ্যমান রয়েছে। বরং আসমানী জ্যোতির্বিকাশ তো হচ্ছে এক ঈমানী বিষয়। সাধারণ মানুষ না আসমানে গেছে, না তা প্রত্যক্ষ করেছে। কিন্তু পৃথিবীর উপরে খোদার রাজত্বের যে জ্যোতির্বিকাশ, তা তো প্রত্যেক ব্যক্তি পরিষ্কারভাবে স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছে। প্রত্যেক ব্যক্তি, তা সে যতই বিত্তশালী হোক না কেন, আপন ইচ্ছার বিরুদ্ধেই মৃত্যুর পেয়ালা পান করে। অতএব, দেখো ! সেই প্রকৃত সম্রাটের হুকুম পৃথিবীর বুকে কীভাবে জ্যোতির প্রকাশ ঘটিয়ে চলেছে, যখন হুকুম এসে যায়, তখন কেউ তার মৃত্যুকে এক সেকেণ্ডের জন্যেও বাধা দান করতে পারে না। যখন কোন মারাত্মক ও দুরারোগ্য ব্যাধি আক্রমণ করে তখন কোনও চিকিৎসক তা নিরাময় করতে পারে না। সুতরাং, চিন্তা করে দেখো ! পৃথিবীর বুকে খোদাতায়ালার রাজত্বের বা জ্যোতির প্রতাপ কত প্রখর যে, তার হুকুম রদ্ হতেই পারে না। তাহলে, কী করে বলা যাবে যে, পৃথিবীর উপরে খোদার রাজত্ব এখন নেই, ভবিষ্যতে কোন এক যুগে তা প্রতিষ্ঠিত হবে ? দেখো ! এই যুগেই খোদাতায়ালার আসমানী হুকুম প্লেগের দ্বারা পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দিয়েছে, যেন তা প্রতিশ্রুত মসীহ্-এর জন্য এক নিদর্শন হয়। কে আছে এমন যে, একে দূরীভূত করে তাঁর মর্জি ছাড়াই ? তাহলে, কী করে বলা যাবে যে, পৃথিবীর উপরে এখন

খোদার বাদশাহাত নেই ? তবে হ্যাঁ, দুষ্কৃতিকারীরা কয়েদীদের মত এই পৃথিবীতে জীবন অতিবাহিত করে, এবং আশা করে যে, তারা যেন কখনো না মরে। কিন্তু, খোদার সত্য বাদশাহাত তাদেরকে ধ্বংস করে দেয় এবং তারা অবশেষে যমদূত বা মালেকুল মউত-এর হাতে গ্রেফতার হয়ে যায়। তাহলে, কী করে বলা সম্ভব যে, এখনও পর্যন্ত পৃথিবীতে খোদার রাজত্ব কায়েম হয়নি ? দেখো ! পৃথিবীর বুকে খোদার হুকুমে হররোজ এক মুহূর্তেই কোটি কোটি মানুষ মারা যাচ্ছে, এবং কোটি কোটি তাঁরই ইচ্ছায় জন্মগ্রহণ করছে। এবং কোটি কোটি লোক তাঁর মর্জিমাফিক ফকীর থেকে আমীর হচ্ছে এবং আমীর থেকে ফকীর হচ্ছে। অতঃপর কী করে বলা যায় যে, পৃথিবীতে আজও পর্যন্ত খোদার বাদশাহাত প্রতিষ্ঠিত হয় নি ? আকাশের উপরে তো ফেরেশ্‌তারা থাকে। কিন্তু মাটির উপরে মানুষও আছে, ফেরেশ্‌তারাও আছে খোদার কর্মচারীরূপে এবং তারা তাঁরই রাজ্য বা সালতানাতের সেবক–যাদেরকে মানুষের বিভিন্ন কর্মের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিয়োজিত করা হয়েছে। এবং তারা সব সময় খোদার আনুগত্য করছে এবং নিজেদের কাজের রিপোর্ট পাঠাচ্ছে। অতঃপর কী করে বলা সম্ভব যে, পৃথিবীতে খোদার রাজত্ব নেই ? বরং, খোদা তাঁর পৃথিবীর এই রাজত্বের মাধ্যমেই সব চাইতে বেশী করে পরিচিত হয়েছেন। কেননা, প্রত্যেকটি ব্যক্তি মনে করে যে, আকাশের রহস্য গোপন এবং তা প্রত্যক্ষ করা অসম্ভব। বরং, আধুনিককালে প্রায় সকল খৃষ্টান এবং তাদের ফিলোসফাররা আসমানসমূহের অস্তিত্বই বিশ্বাস করে না। অথচ, এই আসমানের উপরেই, ইঞ্জিলের মতে, খোদার বাদশাহাতের সমস্ত ভিত্তি স্থাপিত। পক্ষান্তরে, পৃথিবী তো হচ্ছে আমাদের পায়ের নীচেই একটা গ্লোব। এবং নিয়তির হাজার হাজার ঘটনা অহরহ ঘটে চলেছে, যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, এই সমস্ত বিবর্তন ও পরিবর্তন এবং জন্ম ও মৃত্যু প্রভৃতি কোন এক খাস মালিক-এর হুকুমে ঘটে চলেছে। তাহলে, কী করে বলা সম্ভব যে, পৃথিবীতে এখনও খোদার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নি ? ....

আমাদের মহামহিমান্বিত এবং মহাপ্রতাপান্বিত খোদা সূরা ফাতেহায় না আসমানের নাম নিয়েছেন, না যমীনের ; এবং এই কথা বলে আমাদেরকে প্রকৃত তত্ত্ব বা হকীকত জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি হচ্ছেন 'রব্বুল আলামীন'। অর্থাৎ, যতদূর পর্যন্ত আবাদী-বসতি রয়েছে, এবং যতদূর পর্যন্ত কোন প্রকারের কোন অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে, তা সে দেহ-ই হোক আর আত্মা-ই হোক, সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা এবং প্রতিপালনকর্তা হচ্ছেন খোদা, যিনি সর্বক্ষণই সকলের প্রতিপালন করছেন এবং সকলের অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। এবং সকল জগতের উপরে সর্বদা সর্বক্ষণ তাঁর 'রবুবিয়্যত' এবং 'রহ্‌মানিয়্যত' এবং 'রহীমিয়্যত' এবং পুরস্কার ও শাস্তিদান বা 'মালেকিয়্যত-এর ধারা জারি রয়েছে। এবং মনে রাখতে হবে যে, সূরা ফাতেহায় বর্ণিত 'মালেকে ইয়াওমেদ্দীন' – এর উদ্দেশ্য শুধু এতটুকুই নয় যে, কেবল কেয়ামত বা পুনরুত্থান দিবসেই পুরস্কার ও শাস্তি দান

করা হবে, বরং কোরআন শরীফে বারবার অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, কেয়ামত হচ্ছে 'মু'জাযাতে কোবরা' অর্থাৎ প্রতিফল দানের মহান বা চূড়ান্ত সময়। কিন্তু, এক প্রকার 'মুজাযাত' বা প্রতিফল দান ইহজগতেই শুরু হয়ে যায়। এবং এরই প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এই আয়াতে ঃ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا

'(. . তিনি তোমাদের জন্য এক ফুরকান (প্রভেদকারী উপকরণ) সৃষ্টি করে দিবেন . . . .' ৮ঃ৩০) কিশ্‌তী-এ-নূহ, পৃ. ৪৩-৫৬

(৫৮) এটা স্বতঃস্পষ্ট যে, কোরআন শরীফের শিক্ষামতে খোদাতায়ালা যেমন আকাশে রয়েছেন, তেমনি পৃথিবীতেও রয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন ঃ

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ

('তিনিই আকাশেও উপাস্য পৃথিবীতেও উপাস্য'–৪৩ঃ৮৫) অর্থাৎ, পৃথিবীতেও তিনিই খোদা, আসমানেও তিনিই খোদা। আরও বলেছেন যে, এমন কোন তিন ব্যক্তির গোপন পরামর্শ হয় না যেখানে চতুর্থ জন খোদা থাকেন না (দ্রঃ ৫৮ঃ৮)। আরও বলেছেন যে, তিনি অসীম। যেমন, এই আয়াতে বলা হয়েছে ঃ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ

('দৃষ্টি তাঁর নাগাল পায় না, কিন্তু তিনি দৃষ্টির নাগাল পান' – ৬ঃ১০৪) ; অর্থাৎ, চক্ষু তাঁর সীমা পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে না, কিন্তু তিনি চক্ষুর শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছেন। একইভাবে, খোদাতায়ালা কোরআন শরীফে আরও বলেছেন ঃ

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

'এবং আমরা (তার) জীবন-শিরা অপেক্ষাও তার অধিকতর নিকটে আছি' (৫০ঃ১৭)।

অর্থাৎ আল্লাহ্ মানুষের জীবন-শিরা থেকেও তার অধিকতর নিকটবর্তী। এবং এক জায়গায় এ কথাও বলেছেন যে, খোদা প্রতিটি জিনিষকে পরিবেষ্টন করে আছেন। এবং এ কথাও বলেছেন ঃ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ

('নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষ ও তার হৃদয়ের মাঝখানে এসে উপস্থিত হন'- ৮ঃ২৫)। অর্থাৎ, খোদা তো তিনিই যিনি মানুষ ও তার হৃদয়ের মধ্যবর্তী হন। এবং এ কথাও বলেছেন ঃ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

'(আল্লাহ্ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর আলো – নূর', – ২৪ঃ৩৬)। অর্থাৎ তিনিই যাঁর চেহারার ঝলক যমীন ও আসমানে উদ্ভাসিত। আরও বলেছেন ঃ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝

['তার (পৃথিবীর) উপরে যা কিছু আছে সবই নশ্বর, এবং অবিনশ্বর থাকবে (শুধু) তোমার প্রভু-প্রতিপালকের সত্তা যিনি প্রতাপ ও সম্মানের অধিপতি' –

৫৫ঃ২৭, ২৮)। অর্থাৎ প্রত্যেকটি জিনিষ ধ্বংসশীল ও পরিবর্তনশীল, এবং কেবল যিনি বাকী বা অবিনশ্বর হয়ে থাকবেন তিনিই হচ্ছেন খোদা। অন্য কথায়, প্রত্যেকটি জিনিষ ফানা বা লয়প্রাপ্ত হয়ে যায় এবং পরিবর্তিত হয়ে যায়। কিন্তু, মানব-প্রকৃতি এই কথা মানতে বাধ্য বা মজবুর যে, এই সমস্ত পার্থিব ও আসমানী জগতসমূহের মধ্যে এমন এক সত্তা রয়েছে যা সমস্ত কিছু ফানা বা লয়প্রাপ্ত এবং পরিবর্তিত হয়ে গেলেও, তার উপরে ফানা বা পরিবর্তন কোন প্রভাব ফেলতে পারবে না। সে আপন অবস্থায় অবিকল ও অপরিবর্তিত রয়েছে। সেই হচ্ছে খোদা। কিন্তু, যেহেতু, পৃথিবীর বুকে পাপ এবং অপরাধ এবং অপবিত্র কাজ সংঘটিত হয়ে থাকে, তাই খোদাকে শুধু পৃথিবী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখে যারা, তারা পরিণামে মূর্তির পূজারী ও সৃষ্টির পূজারী হয়ে যায়। যেমন, হিন্দুরা হয়ে গেছে। এজন্যই কোরআন শরীফ তো একদিকে এই বর্ণনা করেছে যে, খোদার সঙ্গে তাঁর সৃষ্টির নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে এবং তিনি প্রতিটি প্রাণের প্রাণ এবং প্রত্যেকটি অস্তিত্ব তাঁরই আশ্রয়ে রয়েছে ; তেমনি অপরদিকে—এই ভুল থেকে রক্ষা করার জন্য যে, তাঁর যে সম্পর্ক মানুষের সঙ্গে রয়েছে তা থেকে যেন কোন ব্যক্তি ধারণা করে না বসে যে, মানুষই স্বয়ং খোদা, যেমনটা বেদান্ত-এর অনুসারীরা মনে করে থাকে — এ কথাও বলে দিয়েছে যে, খোদা সব কিছুর ঊর্ধে এবং তিনি সমগ্র সৃষ্টির অতিক্রান্ত থেকে অতিক্রান্ত অবস্থানে – ওরাউল ওরা মোকামে– অধিষ্ঠিত, যাকে শরীয়তের বাগ্‌ধারায় বলা হয় **আরশ'**। এবং আর্‌শ কোন সৃষ্ট বস্তু নয়। এ শুধু অতিক্রান্ত থেকে অতিক্রান্ত এক মর্তবা বা মর্যাদার নাম। এ এমন কোন সিংহাসনও নয় যার উপরে খোদাতায়ালা মানুষের ন্যায় বসে আছেন বলে মনে করা যাবে। বরং, যা সৃষ্টি থেকে অতিক্রান্ত এবং সম্পূর্ণ অতিক্রান্ত ও পবিত্র এক মোকাম বা ঐশী অবস্থান, তাকেই বলে 'আর্‌শ'। যেমন, কোরআন শরীফে লিখিত আছে যে, খোদাতায়ালা, স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যেকার যে সম্পর্ক তা স্থাপন করার পর, আরশ-এর উপরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। অর্থাৎ তিনি সম্পর্ক সত্ত্বেও পৃথক থেকেও পৃথক রয়ে গেছেন, এবং সৃষ্টির সঙ্গে মিশে যান নি।

সংক্ষেপে, খোদার মানুষের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়া এবং সমস্ত কিছুকেই পরিবেষ্টন করা বা সমস্ত কিছুতেই অনুস্যূত হওয়া হচ্ছে খোদার সাদৃশ্যসূচক গুণ – তাশ্‌বিহী সিফাত (Immanent Attribute)। খোদাতায়ালা কোরআন শরীফে তাঁর এই গুণ-এর কথা এজন্যই উল্লেখ করেছেন যে, এর মাধ্যমে তিনি যেন মানুষের সঙ্গে তাঁর নৈকট্যের বিষয়টি সাব্যস্ত করতে পারেন। এবং সমস্ত সৃষ্টি থেকে খোদার ওরাউল ওরা – অতিক্রান্ত থেকে অতিক্রান্ত - Beyond of Beyond – হওয়া এবং সমস্ত কিছু থেকে ঊর্ধে হওয়া, উন্নত হওয়া, এবং অতিদূর হওয়া, এবং সেই চরম অতিক্রান্ত ও পবিত্র মোকাম যা কিনা সৃষ্টি থেকে দূর, যা **আরশ** বলে আখ্যায়িত হয়, – তারই পরে অধিষ্ঠিত হওয়াকে বলা হয়েছে

তাঁর **তানযিহী সিফাত** বা অতিক্রান্তসূচক গুণ (Transcendental Attribute) ; এবং খোদাতায়ালা কোরআন শরীফে এই গুণেরও বর্ণনা এইজন্য করেছেন যে, এর মাধ্যমে যেন তিনি তাঁর তৌহীদ বা একত্ব, তাঁর এক ও অংশীবিহীন অর্থাৎ ওয়াহেদ ও লা-শরীক হওয়া এবং সৃষ্টির গুণ থেকে আপন সত্তাকে অতিক্রান্ত ও মুক্ত হওয়া সাব্যস্ত করতে পারেন। অন্যান্য জাতিগুলি খোদাতায়ালার সত্তা সম্পর্কে তান্‌যিহী অর্থাৎ অতিক্রান্তসূচক (Transcendental) গুণ-কে তো স্বীকার করে নিয়েছে – যাকে তারা বলেছে 'নির্গুণ' কিন্তু তাকেই আবার 'সিরগুণ' বলে তাঁর প্রতি তাশ্‌বিহী' বা সাদৃশ্যসূচক বা অনুস্যূত (Immanent) গুণ এমনভাবে আরোপ করেছে যে, তিনি স্বয়ং সৃষ্টি হয়ে গেছেন। ফলে, তারা এই উভয় গুণ-কে একস্থ করতে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু, খোদাতায়ালা কোরআন শরীফে এই উভয় গুণ-এর দর্পণে আপনার চেহারা প্রদর্শন করেছেন। **এবং এটাই হচ্ছে পূর্ণ ও পারফেক্ট একত্ব – কামাল তৌহীদ।'** – (চশমা মা'রেফত, পৃ. ৮৯–৯১)

(৫৯)

'মুসলমানদের আকিদা বা বিশ্বাস এটা নয় যে, **'আরশ্‌'** কোন বস্তুগত (আসন) এবং সৃষ্ট কোন পদার্থ বা স্থান যার উপরে খোদা বসে আছেন। সমগ্র কোরআন শরীফ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে দেখো, এর মধ্যে কোথাও একথা পাবে না যে, আরশ কোন সীমাবদ্ধ বস্তু এবং সৃষ্ট। খোদা বার বার কোরআন শরীফে বলেছেন যে, যে কোন জিনিস, যার কোন অস্তিত্ব রয়েছে, তার স্রষ্টা আমি-ই। আমি-ই যমীন ও আসমান এবং সমস্ত আত্মা ও তাদের সমস্ত শক্তির সৃষ্টিকর্তা। আমি আপন সত্তায় আপন-ই প্রতিষ্ঠিত। এবং প্রত্যেকটি জিনিষ আমারই কারণে প্রতিষ্ঠিত। প্রতিটি অণু-পরমাণু এবং প্রত্যেকটি বস্তু, যার অস্তিত্ব রয়েছে, তা আমারই সৃষ্টি। কিন্তু, তিনি একথা কোথাও বলেননি যে, আরশ্‌–ও এক দৈহিক বস্তু যার সৃষ্টিকর্তা আমি। . . . . . .

কোরআন শরীফে যেখানে যেখানে আর্‌শ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে সেখানেই এর উদ্দেশ্য হচ্ছে খোদাতায়ালার মাহাত্ম্য এবং তাঁর অসীম ক্ষমতা এবং তাঁর মহিমা ও সর্বশ্রেয়ত্ব প্রতিপন্ন করা, প্রকাশ করা। এ কারণেই আরশকে সৃষ্টবস্তুর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। এবং খোদাতায়ালার মহিমা–মাহাত্ম্য এবং অসীম ক্ষমতা ও শ্রেষ্ঠতার, অর্থাৎ – আযমত এবং জবরুত–এর প্রকাশ চার প্রকার। এগুলিকে বেদ আখ্যায়িত করেছে চার দেবতা বলে। কিন্তু, কোরআনের বাগ্‌ধারায় ঐগুলিকে ফেরেশ্‌তা বলা হয়েছে।'

– (নসীমে দাওয়াত, পৃ. ৮৬–৮৯)।

'আর্‌শ' বলতে কোরআন শরীফে সেই মোকাম বা অবস্থানকে বুঝানো হয়েছে যা তাশ্‌বিহী বা সাদৃশ্যসূচক ব অনুস্যূত অবস্থা থেকে উর্ধ এবং প্রত্যেক জগৎ থেকে শ্রেষ্ঠতর এবং দূরতম থেকে দূরতর এবং পবিত্র এবং অতিক্রান্ত। এটি এমন কোন স্থান নয়, যা পাথর বা ইট বা অন্য কোন পদার্থ দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে এবং তার উপরেই বসে আছেন খোদা। এ জন্যই আরশকে বলা হয় যে, তা অ-সৃষ্ট। এবং খোদাতায়ালা বলেছেন যে, তিনি যেমন কখনো কখনো মু'মিনের হৃদয়ে তাঁর জ্যোতির প্রতিফলন ঘটান, তেমনি তিনি এ-ও বলেছেন যে, আরশ-এর উপরেও তাঁর জ্যোতির প্রকাশ ঘটে। এবং তিনি পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, প্রত্যেকটি জিনিষকে আমিই উঠিয়ে বা তল্‌তিয়ে রেখেছি। একথা কোথাও বলেন নি, কোন জিনিষ আমাকেই তল্‌তিয়ে রেখেছে। 'আরশ' যা কিনা প্রত্যেক জগৎ থেকে উর্ধে এক মোকাম, তা হচ্ছে তাঁর তানযিহী সিফাত বা অতিক্রান্ত গুণের প্রকাশক। এবং আমরা বার বার লিখেছি যে, আদি থেকেই খোদার মধ্যে দু'প্রকার গুণ বিদ্যমান রয়েছে। এক–সাদৃশ্যসূচক বা তাশবিহী গুণ; দুই- অতিক্রান্ত বা তানযিহী গুণ। যেহেতু খোদার কালামের মধ্যে উভয় গুণের বর্ণনা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, অর্থাৎ তাশ্‌বিহী ও তান্‌যিহী গুণের বর্ণনা – সেহেতু, খোদা তাশ্‌বিহী গুণের প্রকাশের জন্য তাঁর হস্ত, চক্ষু, ভালবাসা, ক্রোধ ইত্যাদি গুণের বর্ণনা দিয়েছেন। আবার সদৃশ–সৃষ্টির সংশয়কে দূরীভূত করার জন্য বলে রেখেছেন ঃ

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ

'তাঁর সদৃশ কিছু নেই' –(৪২ঃ১২)। আবার অন্যত্র বলেছেন ঃ

ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ

('তিনি আরশ-এর উপরে অধিষ্ঠিত হলেন' – ১৩ঃ৩)

সূরা রা'আদ-এর এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اَللّٰهُ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ

'আল্লাহ্ তিনি, যিনি আকাশমন্ডলীকে কোন স্তম্ভ ছাড়াই উঠিয়ে রেখেছেন যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। অতঃপর, তিনি আরশ-এর উপরে অধিষ্ঠিত হলেন' (১৩ঃ৩)। এই আয়াতের বাহ্যিক অর্থের আলোকে এখানে সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, কেন, খোদা কি এর আগে আরশে অধিষ্ঠিত ছিলেন না ? এর জবাব হচ্ছে, **আরশ কোন বস্তুগত স্থান নয়। বরং অতিক্রান্ত থেকে অতিক্রান্ত (Beyond of Beyond) হওয়ার এক অবস্থা মাত্র, যা কিনা তাঁর এক গুণ।** অতএব, খোদা যখন যমীন ও আসমান, এবং প্রত্যেকটি জিনিষকে সৃষ্টি করেছেন এবং প্রতিচ্ছবি রূপে আপনার নূর বা আলো থেকে সূর্য-চন্দ্র এবং নক্ষত্ররাজিকে আলো দান করেছেন এবং মানুষকেও রূপকভাবে আপন সূরতে বা আকৃতিতে সৃষ্টি

করেছেন এবং আপন মহান চারিত্র্য তার মধ্যে ফুৎকার করে দিয়েছেন, তখন এই পদ্ধতিতে খোদা তার নিজের জন্য এক সাদৃশ্য কায়েম করেছেন। কিন্তু, যেহেতু তিনি প্রত্যেক প্রকারের সাদৃশ্য থেকেও মুক্ত ও পবিত্র, সেহেতু আরশের উপরে অধিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে আপন অতিক্রান্ত (Transcendental বা তানাযুযাহ্) অবস্থার উল্লেখ করেছেন। মোদ্দা কথা, তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করার পরও সৃষ্টি নন। বরং, সবকিছু থেকে পৃথক এক অতিক্রান্ত থেকে অতিক্রান্ত মোকামে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। (চশমা মা'রেফত, পৃ. ২৬৪-২৬৬)

(৬১)

'আরও একটি আপত্তি উত্থাপন করে থাকে বিরুদ্ধবাদীরা। এবং তা হলো, কোরআন শরীফে বিভিন্ন জায়গা থেকে মনে হয় যে, কেয়ামত-এর দিনে আরশ-কে উঠাবে বা বহন করবে আটজন ফেরেশ্‌তা, যা থেকে নিশ্চিত রূপেই বুঝা যায় যে, পৃথিবীতে আরশ-কে বহন করে চারজন ফেরেশ্‌তা। কাজেই, এখানে আপত্তি উঠে যে, খোদাতায়ালা তো এথেকে পবিত্র এবং ঊর্ধে যে, কেউ তাঁর আরশ-কে উত্তোলন করবে। এর জবাব হচ্ছে, এখনই তোমরা শুনেছ যে, আরশ কোন বস্তুগত স্থান নয়, যা উত্তোলন করা যায় বা উত্তোলন করা সম্ভব। বরং স্রেফ (সৃষ্টি থেকে) অতিক্রান্ত ও পবিত্র মোকামের নাম 'আরশ'। এজন্যই আরশকে বলা হয় যে, তা সৃষ্ট নয়, অ-সৃষ্ট। নইলে, এক মূর্তিমান বা দেহধারী বস্তু কী করে খোদার সৃষ্টি বহির্ভূত হতে পারে ! এবং আরশ সম্পর্কে যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে, তা সবই রূপক। অতএব, এথেকে যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝতে সক্ষম যে, এই ধরণের আপত্তি স্রেফ নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত।

এখন আমরা ফেরেশ্‌তা কর্তৃক (আরশ) উত্তোলন করার আসল ভেদ পাঠকদের কাছে উন্মোচন করছি। এবং তা হচ্ছে, খোদাতায়ালা তাঁর অতিক্রান্ত (Transcendental) মোকামে-অর্থাৎ সেই মোকাম যেখানে তাঁর অতিক্রান্ত গুণ তাঁর অন্য সমস্ত গুণকে আবৃত করে, যখন তাঁকে অতিক্রান্ত থেকে অতিক্রান্ত এবং গোপন থেকে গোপন করে তোলে, যে মোকামকে কোরআন শরীফের বাগ্‌ধারায় 'আরশ' বলা হয়েছে, সেখানে তখন খোদা মানবীয় বুদ্ধি-কল্পনার ঊর্ধে অবস্থান করেন, এবং বুদ্ধি-কল্পনার কোন শক্তি থাকে না যে, তাঁকে জানতে পারে। তখন, সেই চারটি গুণ যেগুলোকে চার ফেরেশ্‌তা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, যারা এই জগতে প্রকাশিত হয়েছে, তারা তাঁর গোপন অস্তিত্বকে প্রকাশ করে দেয়।

১) প্রথম গুণ হচ্ছে - রবুবিয়্যত বা প্রতিপালকত্ব, যার মাধ্যমে তিনি মানুষকে আত্মিকভাবে এবং দৈহিকভাবে পরিপূর্ণতা দান করেন। বস্তুতঃ, আত্মা এবং

দেহের বিকাশ রবুবিয়্যত—এর চাহিদা থেকেই সম্পন্ন হয়। এবং একইভাবে, খোদার কালাম (বাণী) অবতীর্ণ হওয়া এবং তাঁর অতি অসাধারণ নিদর্শনাবলী প্রকাশিত হওয়াও 'রবুবিয়্যত-এরই চাহিদা।

২) দ্বিতীয়গুণ খোদাতায়ালার 'রহমানিয়্যত' – যা প্রকাশিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ, যা কিছু তিনি মানুষের কর্মের পূর্বেই দিয়ে রেখেছেন। যেমন, মানুষের জন্য তিনি অগণিত নেয়ামত সরবরাহ করে রেখেছেন (মানুষের জন্মেরও পূর্ব থেকেই)। এইগুণ-ও তাঁর গোপন অস্তিত্বকে প্রকাশিত করছে।

৩) খোদাতায়ালার তৃতীয় গুণ তাঁর 'রহীমিয়্যত'। অর্থাৎ নেক আমলকারী বা সৎকর্মশীলদেরকে প্রথমে তো 'রহমানিয়্যত-এর চাহিদা অনুসারে সৎকাজ করবার শক্তি ও সামর্থ্য দান করেন, এবং পরে 'রহীমিয়্যত'-এর চাহিদা মোতাবেক তাদের দ্বারা সৎকর্ম সম্পাদন করান, এবং এভাবেই তাদেরকে দুর্যোগ-দুর্ভাগ্য থেকে বাঁচান। এবং এই গুণ-ও তাঁর গোপন অস্তিত্বকে প্রকাশিত করে।

৪) খোদাতায়ালার চতুর্থ গুণ হচ্ছে, 'মালিকে ইয়াওমেদ্দীন'। এই গুণও তাঁর গোপন অস্তিত্বকে প্রকাশিত করে। কেননা, তিনি সৎ লোকদেরকে পুরস্কার এবং বদ্ লোকদেরকে শাস্তি দান করেন।

এই হচ্ছে সেই চারটি গুণ—যেগুলি তাঁর 'আরশ'কে উত্তোলন করে রেখেছে। অর্থাৎ, তাঁর গোপন অস্তিত্বকে জগৎ এই চারটি গুণের কল্যাণেই চিনতে পারে। এবং এই উপলব্ধি বা মা'রেফত পরকালের জগতে দু'গুণ হয়ে যাবে, যেন চার-এর স্থলে আট ফেরেশ্‌তা হয়ে যাবে।' – (চশমা মা'রেফত, পৃ. ২৬৬–২৬৭)

(৬২)

'তৌহীদ এক নূর –আলো, যা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সমস্ত উপাস্যকে নাস্তি করে দেওয়ার পরে হৃদয়ে সৃষ্টি হয়। এবং তা অস্তিত্বের সমস্ত অণু-পরমাণুতে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। অতএব, তা কী করে খোদা ও তাঁর রসূল-এর মাধ্যম ছাড়া শুধু নিজস্ব শক্তিতেই লাভ করা সম্ভব ? মানুষের কাজ শুধু এতটুকুই যে, সে তার অহং-এর এক মৃত্যু আনয়ন করবে এবং এই শয়তানী অহমিকা বর্জন করবে যে, 'আমি জ্ঞানী হয়ে গেছি'। বরং সে নিজেকে একজন মূর্খ বা অজ্ঞ বলেই জানবে, এবং প্রার্থনায় নিমগ্ন থাকবে। তাহলেই তৌহীদের নূর খোদার পক্ষ থেকে তার উপরে অবতীর্ণ হবে এবং তাকে তখন এক নতুন জীবন দান করা হবে।' – (হকীকাতুল ওহী, পৃ. ১৪৪)।

(৬৩)

অতএব, যেহেতু, **আদিকাল থেকে এবং যখন দুনিয়া পয়দা হয়েছে তখন থেকেই খোদা-কে সনাক্ত করা নবী-কে সনাক্ত করার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, সেহেতু, এটা অসম্ভব এবং অবাস্তব যে, নবীর মাধ্যম ছাড়াই নিজে নিজেই 'তৌহীদ' বা খোদার একত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়।** নবী হচ্ছেন খোদার সূরত বা আকৃতি দেখার আয়না। এই আয়নার মধ্য দিয়েই খোদার চেহারা দৃষ্টিগোচর হয়। খোদাতায়ালা যখন আপন সত্তাকে দুনিয়ার কাছে প্রকাশ করতে চান, তখন তিনি দুনিয়াতে নবী প্রেরণ করেন, এই নবী-ই হচ্ছেন তাঁর শক্তিসমূহের প্রকাশস্থল, প্রকাশক। এই নবীর উপরেই তিনি তাঁর ওহী বা ঐশীবাণী অবতীর্ণ করেন। তাঁরই (নবীর) মাধ্যমে আপনার 'রবুবিয়্যত' বা প্রতিপালকত্বের শক্তিসমূহ প্রদর্শন করেন। তখন দুনিয়া বুঝতে পারে যে, খোদা আছেন। অতএব, যে সকল মানুষের অস্তিত্বকে, খোদার আদি ও চিরন্তন কানুনের আওতায়, খোদাকে চেনার জন্য মাধ্যম নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তাঁদের উপরে ঈমান আনা তৌহীদ-এর একটি অংশ। এবং এইরূপ ঈমান ছাড়া প্রকৃত বা কামেল তৌহীদ জানা অসম্ভব। কেননা, এটা সম্ভবই নয় যে, স্বর্গীয় বা আসমানী নিদর্শন এবং শক্তিশালী বিস্ময়কর ঘটনাবলী, যা প্রদর্শিত করে থাকেন নবী এবং তার মাধ্যমে জ্ঞান বা মা'রেফত দান করেন অন্যদেরকে, – তাঁর দ্বারাই সেই খাঁটি তৌহীদ (সম্পর্কে জ্ঞান) পয়দা হয়, যা দৃঢ়-বিশ্বাস বা একীনের প্রস্রবণ। এঁরাই (নবীগণ) সেই গোষ্ঠী যাঁরা খোদা-প্রদর্শনকারী, যাঁদের মাধ্যমে সেই সে খোদা, যাঁর অস্তিত্ব সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম এবং গোপন থেকে গোপন এবং যিনি অদৃশ্যেরও অদৃশ্য, তিনি প্রকাশিত হন। এবং সর্বদা সেই যে গুপ্তধনের খনি, যার নাম খোদা, তা কেবল নবীগণের মাধ্যমেই সনাক্ত হয়েছে। নইলে, সেই যে তৌহীদ, যা খোদার কাছে তৌহীদ বলে সাব্যস্ত, তার সম্পর্কে নবী ছাড়া প্রকৃত কার্যকরী জ্ঞান লাভ করাটা যেমন যুক্তি-বুদ্ধির পরিপন্থী, তেমনি সত্যান্বেষীগণের অভিজ্ঞতারও পরিপন্থী।' – (হাকীকাতুল ওহী, পৃ. ১১২, ১১৩)

(৬৪)

'মনে রাখতে হবে যে, প্রকৃত একত্ব বা হাকীকি তৌহীদ, যার অঙ্গীকার খোদা আমাদের কাছে চান, এবং যার অঙ্গীকারের সঙ্গে নাজাত বা পরিত্রাণ জড়িত, তা হচ্ছে, – খোদাতায়ালাকে তাঁর সত্তায় প্রত্যেক প্রকারের অংশীবাদিতা বা শির্‌ক থেকে – তা সে মূর্তি হোক, মানুষ হোক, সূর্য অথবা চন্দ্র হোক, কিংবা নিজের নফ্‌স বা প্রবৃত্তি হোক কিংবা নিজের চেষ্টা-তদবীর, বা প্লান-প্রোগ্রাম ও চক্রান্ত–ষড়যন্ত্র হোক, সব কিছু থেকেই – পূর্ণ পবিত্র বলে জানা। এবং তাঁর মোকাবেলায় কাউকে শক্তিমান মনে না করা, কাউকে রায্‌যাক বলে মনে না করা, কাউকে মর্যাদা বা অমর্যাদা দাতা মনে না করা, কাউকে সাহায্য ও

সহায়তাকারীরূপে নির্দিষ্ট না করা। এবং অপরদিকে, তাঁরই জন্য শুধু আপন ভালবাসাকে খাস বা বিশিষ্ট করা, তাঁরই জন্য শুধু আপনার ইবাদতকে খাস বা বিশিষ্ট করা, তাঁরই জন্য শুধু আপনার বিনয় ও আনুগত্যকে খাস করা, তাঁরই জন্য শুধু আপন আশা-ভরসাকে বিশিষ্ট করা, শুধু তাঁরই জন্য আপন ভয়-ভীতিকে খাস বা বিশিষ্ট করা। অতএব, এই তিন প্রকারের বিশিষ্টতা ছাড়া কোন তৌহীদ কামেল বা পারফেক্ট হতে পারে না। অর্থাৎ, প্রথম, – সত্তা সম্পর্কিত তৌহীদ। অর্থাৎ, তাঁর অস্তিত্বের সামনে বা মোকাবেলায় সমস্ত সৃষ্টিকে অস্তিত্বহীন বলে মনে করা ; এবং সমস্ত কিছুকেই নশ্বর ও অ-সৎ (Unreal) মনে করা।

দ্বিতীয় ঃ – গুণাবলী সম্পর্কিত তৌহীদ। অর্থাৎ, রবুবিয়্যত (প্রতিপালকত্ব) এবং উলুহিয়্যত (খোদায়ী বা ঈশ্বরত্ব)-এর গুণাবলী স্রষ্টার সত্তা ব্যতীত অন্য কারো প্রতি আরোপ না করা। এবং, দৃশ্যতঃ যাদেরকে পালনকারী ও কল্যাণকারী বলে প্রতীয়মান হয়, তাদেরকে তাঁরই হাতে প্রবর্তিত এক পদ্ধতির অংশ বিশেষ মনে করা।

তৃতীয়ঃ, – ভালবাসা, আন্তরিকতা ও একাগ্রতা বা নিষ্ঠা সম্পর্কিত তৌহীদ। অর্থাৎ, ভালবাসা ইত্যাদি ইবাদত-এর পন্থাপদ্ধতিতে অপর কাউকে খোদাতায়ালার শরীক না জানা এবং তাঁরই মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া।' – (সিরাজুদ্দীন ঈসায়ী কি চার সওয়ালোঁ কা জওয়াব, পৃ. ২৩, ২৪)

(৬৫)

'আজকাল তৌহীদ এবং আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্বের বিরুদ্ধে খুব জোরেশোরে আক্রমণ চালানো হচ্ছে। খৃষ্টানরাও জোর হামলা চালাচ্ছে এবং লিখে চলেছে। কিন্তু, যা কিছু তারা বলেছে এবং লিখেছে তা সবই ইসলাম-এর খোদা সম্পর্কেই লিখেছে, লিখেনি তাদের এক মৃত, ক্রুশবিদ্ধ ও অসহায় খোদা সম্পর্কে। আমরা পূর্ণ দাবী ও আস্থার সঙ্গে বলছি যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব ও তাঁর সত্তার বিরুদ্ধে কলম উঠাবে, তাকে অবশেষে, সেই খোদার সমীপেই আসতে হবে যাঁকে পেশ করেছে ইসলাম। কেননা, প্রকৃতি-গ্রন্থের পাতায় পাতায় তাঁরই পরিচয় পাওয়া যায়। এবং সেই খোদারই ছবি অঙ্কিত মানবের স্বভাবেও। – (মলফুযাত, ১ম খন্ড, পৃ. ৭৯)

(৬৬)

'খৃষ্টানদের ভালভাবে মনে রাখা উচিত যে, (তাদের) মসীহ্, আলায়হিস্ সালামের পক্ষে 'কেয়ামতের নমুনা' হওয়াটা কোনভাবেই প্রমাণিত নয়। এবং খৃষ্টানরাও পুনরুত্থিত হয়নি। বরং, তারা মৃত এবং অন্যান্য মৃতদের চাইতেও মৃত এবং সংকীর্ণ ও অন্ধকার কবরগুলোর মধ্যে পড়ে রয়েছে। এবং তারা শির্‌ক ও অংশীবাদিতার গহ্বরে নিপতিত রয়েছে। তাদের মধ্যে না আছে ঈমানী রূহ্

(আত্মা), না ঈমানী রূহ-এর বরকত। তারা নিম্ন থেকে নিম্ন স্তরের তৌহীদ, যা শুধু সৃষ্টির পূজা পরিহার করলেই অর্জন করা যায়, তা-ও তাদের ভাগ্যে জুটেনি। এবং নিজেদের মতই এক দুর্বল ও অসহায় বান্দাকে স্রষ্টা মনে করে তারই উপাসনা করছে।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, 'তৌহীদ'-এর স্তর তিনটি। সর্বাপেক্ষা নিম্ন স্তর হচ্ছে, নিজের মতন কোন সৃষ্টির উপাসনা না করা। না পাথর, না অগ্নি, না মানুষ, না কোন নক্ষত্রের পূজা করা। দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে, বস্তুগত উপায়-উপকরণ বা সরঞ্জামের উপরে এত বেশী নির্ভরশীল না হওয়া, যাতে সেগুলোকে রবুবিয়্যত বা প্রতিপালকত্বের কার্যক্রমে একপ্রকার অংশীদার বলে মনে হতে পারে। বরং, সব সময়ে উপায়-উপকরণ দাতার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে, উপায় উপকরণের প্রতি না। তৌহীদের তৃতীয় স্তর হচ্ছে, তাজাল্লিয়াতে ইলাহীয়া বা ঐশী প্রকাশকে পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ করে অপরাপর প্রত্যেকটি অস্তিত্বকে অনস্তিত্ব মনে করা এবং একইভাবে নিজের অস্তিত্বকেও। সংক্ষেপে, প্রত্যেকটি বস্তু দৃষ্টিপটে নশ্বররূপে প্রতিভাত হবে একমাত্র আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব ছাড়া, যিনি সমস্ত পারফেক্ট ও পূর্ণ গুণাবলীর অধিকারী। এটাই হচ্ছে আধ্যাত্মিক জীবন-রূহানী জিন্দেগী, যা অর্জিত হয় এই তিন স্তরের তৌহীদের মাধ্যমে। এখন, গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখতে পাবে যে, **রূহানী জিন্দেগীর সমস্ত চিরন্তন প্রস্রবণ পৃথিবীতে এসেছে শুধু মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে।** এই সেই উম্মত, তারা নবী তো নয়, কিন্তু নবীদের মতই খোদাতায়ালার সঙ্গে কথা বলতে পারে। তারা রসূল তো নয়, কিন্তু রসুলের মতই তাদের হস্তেও প্রদর্শিত হয় খোদাতায়ালার উজ্জ্বল নিদর্শন। এবং রূহানী জিন্দেগীর দরিয়া তাদেরই মধ্যে প্রবাহিত হয়। এবং এমন কেউ নেই যে তাদের মোকাবেলা করে। কেউ কি আছে যে, কল্যাণ ও নিদর্শন দেখাবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় খাড়া হয়ে যাবে ? যদি থাক তো আমাদের এই চ্যালেঞ্জের জবাব দাও। -(আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, পৃ. ২২৩-২২৪)

(৬৭)

'আফসোস যে, আমি এমন শব্দাবলী পাচ্ছি না, যার মাধ্যমে আমি প্রকাশ করতে পারি যে, গায়রুল্লাহ্ অর্থাৎ 'আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছু'-এর প্রতি ঝুঁকে পড়ার মধ্যে, কত বেশী অমঙ্গল নিহিত। মানুষ মানুষের কাছে গিয়ে মিনতি করে, খোশামুদী করে। এটা এমন এক ব্যাপার যা কিনা খোদাতায়ালার গায়রত বা আত্মাভিমানকে জাগিয়ে তোলে। কেননা, এটাই ঐ সব মানুষের নামায। কাজেই তিনি এই নামায থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন, এবং এই নামাযকে দুরে, নিক্ষেপ করেন। আমি সাদামাটা কথায় বিষয়টাকে বর্ণনা করছি। যদিও, বিষয়টা প্রকৃত

প্রস্তাবে এমন নয়। তবু, বুঝতে সহজ হবে। যেমন, কোন আত্মা মর্যাদাবোধ সম্পন্ন ব্যক্তির গায়রত বা আত্মাভিমান এটা চাইতে পারে না যে, তার স্ত্রী অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করুক। এমনটি ঘটলে ঐ ব্যক্তি উক্ত দুশ্চরিত্রা স্ত্রীকে হত্যাযোগ্য বলে বিবেচনা করবে। এবং কখনো কখনো বাস্তবে এইরূপ ঘটনা (হত্যা) ঘটেও থাকে। ইলাহী জোশ ও গায়রতও ঠিক অনুরূপ। দাসত্ব এবং প্রার্থনা একমাত্র তাঁরই সত্তার জন্য সংরক্ষিত। তিনি এটা পসন্দ করতে পারেন না যে, অন্য কাউকে উপাস্য করা হোক, কিংবা অন্য কারো কাছে প্রার্থনা করা হোক। সুতরাং, মনে রেখো, এবং ভালভাবে মনে রেখো যে, গায়রুল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকে পড়ার অর্থই হচ্ছে খোদা থেকে কাটা পড়া, সেক্ষেত্রে নামায আর তৌহীদের কথা যা-ই বল না কেন কোন ফায়দা হবে না। কেননা, **তৌহীদের আমলী বা বাস্তব ও কার্যকর ঘোষণার নামই নামায**। এবং তা তখনই বরকত-শূন্য ও নিরর্থক হয়, যখন তার মধ্যে নাস্তি ও নম্রতার রূহ্ থাকে না!'– (মলফুযাত, প্রথম খন্ড, পৃ. ১৬০-১৬১)

(৬৮)

'**শির্‌ক** বা অংশীবাদিতা কয়েক প্রকার। এক তো হলো সেই মোটা ও সুস্পষ্ট শির্‌ক, যার মধ্যে হিন্দু, খৃষ্টান, ইহুদী এবং অন্যান্য মূর্তি-পূজকরা নিপতিত। যার মধ্যে কোন মানুষকে কিংবা পাথরকে কিংবা নিষ্প্রাণ কোন বস্তুকে কিংবা কোন শক্তিকে কিংবা কল্পিত সব দেব ও দেবীকে খোদা বানিয়ে নেওয়া হয়েছে। যদিও এখনও পর্যন্ত এই শির্‌ক পৃথিবীতে প্রচলিত রয়েছে, তবু এই যুগ আলোকের এবং শিক্ষা-দীক্ষার এমন এক যুগ যখন যুক্তি-বুদ্ধি এই প্রকারের শির্‌ককে ঘৃণার চক্ষে দেখা শুরু করেছে। এটা একটা আলাদা বিষয় যে, জাতীয় ধর্মের প্রেক্ষিতে বাহ্যতঃ এইসব বেহুদা ব্যাপারকে বহুলোকে মেনে চলে বটে, কিন্তু আসলে সুস্থবুদ্ধির লোকেরা এগুলোকে ঘৃণা করতেই শুরু করেছে। কিন্তু, আরও এক প্রকারের শির্‌ক আছে, যা গুপ্তভাবে বিষ-এর মত ক্রিয়া করে চলেছে; এবং তা এই যামানায় খুব বেশী বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং তা হচ্ছে, খোদায়ালার উপরে আস্থা এবং ভরসা ও নির্ভরশীলতা সম্পূর্ণ লোপ পেতে বসেছে।

আমরা একথা কখনই বলি না, এবং এটা আমাদের ধর্মবিশ্বাসও নয় যে, উপায়–উপকরণকে সম্পূর্ণরূপেই পরিত্যাগ করতে হবে। কেননা, খোদাতায়ালা আসবাব বা উপায় উপকরণ ব্যবহার করতে বলেছেন। তবে, তা হতে হবে ততটাই যতটা প্রয়োজন। উপায়–উপকরণের ব্যবহার যদি না করা হয়, তাহলে তো মানবীয় বৃত্তিসমূহের অবমাননা করা হবে, এবং খোদাতায়ালার মহান কর্মকান্ডকে হেয় করা হবে। কেননা, যখন উপায় উপকরণের কোন ব্যবহারই

করা হবে না, তখন সেই অবস্থায় খোদা-প্রদত্ত মানুষের সমস্ত শক্তি-বুদ্ধিকে সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় করে রাখতে হবে, সেগুলোকে কোথাও কোন কাজেই লাগানো যাবে না। সেগুলোকে কাজে না লাগানো এবং সেগুলোকে বেকার অবস্থায় রাখাটাই হবে খোদাতায়ালার কর্মকান্ডকে বৃথা ও অহেতুক প্রতিপন্ন করা, যা কিনা এক কঠিন পাপ। অতএব, আমাদের উদ্দেশ্য এবং ধর্ম বিশ্বাস এটা নয় যে, উপায় ও উপকরণের ব্যবহারকে সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দেওয়া হোক। তবে, উপায়-উপকরণ ব্যবহারের একটা সীমা থাকতে হবে, অর্থাৎ যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই। পরকাল বা আখেরাত-এর জন্যেও আয় উপকরণ আবশ্যক। খোদাতায়ালার হুকুম আহকাম পালন করা, পাপ থেকে বেঁচে চলা, এবং অন্যান্য সৎকাজ করা, পুণ্যের কাজ করা, এ সবকিছু এজন্যই যে, যাতে করে এই জগতে এবং পরজগতে সুখ পাওয়া যায়। কাজেই, এই পুণ্যকাজগুলি তো একপ্রকার উপায় উপকরণই। একইভাবে, খোদাতায়ালা এই নিষেধও করেন নি যে, পার্থিব প্রয়োজনে উপায়-উপকরণের ব্যবহার করো না। চাকুরীজীবি চাকুরী করবে। কৃষক কৃষিকাজ করবে। মজদুর মজদুরী করবে। যাতে করে তারা সবাই তাদের স্ত্রী-পরিজন ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের এবং নিজেদের প্রাণের প্রতি হক্ আদায় করতে পারে। অতএব, এক বৈধ সীমা পর্যন্ত এসবই ঠিক আছে। এবং এটাকে নিষেধও করা যাবে না। কিন্তু, যখন মানুষ সীমা ছাড়িয়ে গিয়ে উপায়-উপকরণের উপরেই পূর্ণ ভরসা করে, এবং উপকরণকেই সব কিছুর নিয়ামক মনে করে, তখন এটা শির্ক হয়ে যায় এবং মানুষকে তার আসল উদ্দেশ্য থেকে দূরে নিক্ষেপ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি কোন ব্যক্তি একথা বলে যে, এই উপায় যদি না হতো, তাহলে আমি না খেয়ে মরে যেতাম। কিংবা যদি অমুক সম্পত্তি বা অমুক কাজ না হতো, তাহলে আমার বারোটা বাজতো। অমুক বন্ধু না হতো তো অবস্থা শোচনীয় হতো। এই বিষয়টা এমন যে, খোদাতায়ালা কখ্খনো এটা পসন্দ করেন না যে, সম্পত্তি, অথবা উপায় উছিলা অথবা বন্ধু-বান্ধব অথবা অন্য কিছুর উপরে এমন ভরসা করা হোক যাতে খোদাতায়ালা থেকেই একেবারে দূরে সরে পড়ে। এ এক বিপজ্জনক শিরক, যা কোরআন শরীফের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী। যেমন, আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন ঃ وَفِي السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿٢٣﴾

আবার বলেছেন ঃ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ

আবারও বলেছেন ঃ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ﴿٣﴾ وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

এবং আবার বলেছেন ঃ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٩٧﴾

অনুবাদ ঃ ১. 'এবং আকাশে তোমাদের রিযক আছে এবং তা-ও রয়েছে যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছে' (৫১ঃ২৩)।

২. 'এবং যে আল্লাহ্র উপরে নির্ভর করে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট' – (৬৫ঃ৪)।

৩. 'এবং যে আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন করে তার জন্য তিনি কোন না কোন উদ্ধারের পথ করে দিবেন ; এবং তিনি তাকে এমন দিক থেকে রিযক দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না।' (৬৫ঃ৩-৪ দ্রঃ)।

৪. 'তিনিই সৎকর্মশীলদেকে রক্ষা করেন' – (৭ঃ১৯৭)।

কোরআন শরীফ এই ধরনের আয়াতে ভরপূর যে, তিনি মুত্তাকীদের অভিভাবক এবং নিশ্চয়তা দানকারী বা জিম্মাদার। কাজেই, মানুষ যখন উপায়-উপকরণের উপরে নির্ভর করে, তখন সে ঐগুলিকেই খোদাতায়ালার গুণাবলীর অংশীদার করে বসে এবং ঐ উপায়–উপকরণগুলোকেই নিজের জন্য আর এক খোদা বানিয়ে নেয়। যেহেতু, সে কেবল এক দিকেই ঝুঁকে পড়ে, সেহেতু সে শিরক-এর দিকেই কদম বাড়ায়। যারা প্রশাসনের দিকেই ঝুঁকে পড়ে এবং পুরস্কার ও খেতাব প্রাপ্ত হয়, তাদের হৃদয়ে ঐ প্রশাসকদেরই মাহাত্ম্য খোদার মাহাত্ম্যের মতই প্রবেশ করে। তারা ওদের পূজারী হয়ে যায়। এবং এটাও একটা বিষয় যা কিনা তৌহীদকে অপসারণ করে এবং মানুষকে তার আসল কেন্দ্র থেকে তাড়িয়ে দূরে নিক্ষেপ করে। কাজেই, আম্বিয়া আলায়হিমুস্‌সালাম এই শিক্ষাই দান করেছেন যে, উপায় উপকরণ এবং তৌহীদ-এর মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব থাকাই উচিত নয়। বরং প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ জায়গায় থাকবে। কিন্তু, শেষ হবে গিয়ে তৌহীদে। তাঁরা মানুষকে এটাই শিখাতে চেয়েছেন যে, সকল মান-ইজ্জত, সকল আরাম-আয়েশ, খোদাই দিয়ে থাকেন, এবং খোদাই পূর্ণ করেন সকল প্রয়োজন। অতএব, এই খোদার বিপক্ষে যদি অপর কাউকে খাড়া করে দেওয়া যায়, তাহলে এটা পরিষ্কার যে, এই উভয় দ্বন্দ্বকারীর একজন ধ্বংস হবেই। এবং বিজয়ী তো হবে খোদাতায়ালার তৌহীদ-ই। উপায়-উপকরণের ব্যবহার করবে। উপায়-উপকরণকে খোদা বানাবে না। এই তৌহীদ থেকেই খোদাতায়ালার প্রতি এক প্রকার ভালবাসার সৃষ্টি হয়। মানুষ যখন এটা বুঝতে পারে যে, লাভ-লোকসান তাঁরই হাতে, প্রকৃত কৃপাকারী তিনিই, প্রতিটি অণু-পরমাণু তাঁর থেকেই, মাঝখানে আর কেউ নেই। এবং যখন মানুষ এই পবিত্র অবস্থা লাভ করে, তখন সে নিজেকে একত্ববাদী বা তৌহীদ বলতে পারে।

সংক্ষেপে, তৌহীদ-এর একটা অবস্থা এই যে, মানুষ পাথর অথবা মানুষ অথবা অন্য কোন কিছুকে খোদা বানাবে না। বরং ঐগুলো খোদা বানানোর

ব্যাপারে অসন্তোষ ও ঘৃণা প্রকাশ করবে। এবং দ্বিতীয় অবস্থা হচ্ছে, শুধু উপায়–উপকরণ নিয়েই পড়ে থাকবে না। তৃতীয় অবস্থা হচ্ছে, নিজের অহং এবং অস্তিত্বের যাবতীয় গরজ বা উদ্দেশ্যকে মাঝখান থেকে অপসারিত করে ফেলবে, এবং এগুলোকে নাস্তি করে দিবে। কখনো কখনো, মানুষ তার নিজের গুণাবলী ক্ষমতার কথাও ভাবে ; এবং মনে করে যে, অমুক সৎকাজটি তো আমি নিজের যোগ্যতার বলেই করেছি। মানুষ অনেক সময়, তার শক্তির উপরে এত ভরসা করে যে, সে মনে করে যে, তার প্রত্যেকটি কাজ সে করে তার যোগ্যতার বলেই। কিন্তু, মানুষ কেবল তখনই একত্ববাদী বা তৌহীদবাদী হতে পারে যখন সে তার সাকল্য শক্তি ও ক্ষমতা প্রভৃতিকে নাস্তি করে দেয়।' – (মলফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৯-৮২)

(৬৯)

'খৃষ্টানদের বিশ্বাস হচ্ছে, যে ব্যক্তি ত্রিত্ববাদ-এর আকিদা (ধর্ম বিশ্বাস) এবং যীশুর প্রায়শ্চিত্ত মানে না, সে চিরকালের জন্য জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে . . . .

অসীম খোদাকে তিন অথবা চার অংশীদারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা, এবং প্রত্যেক অংশীদারকে পূর্ণ-পারফেক্ট ধারণা করা, আবার একত্রিত হওয়ার প্রয়োজন বোধ করা ; আবার এই ধারণা পোষণ করা যে, খোদা আদিতে ছিলেন কলেমা বা শব্দ, আবার সেই শব্দ (word) যা কিনা খোদা ছিল, তা মরিয়ম-এর পেটে নিপতিত হওয়া, এবং তারই রক্তে দেহ প্রাপ্ত হওয়া, এবং স্বাভাবিক পন্থায় জন্ম লাভ করা, শৈশবের সব কষ্ট যা সব মানুষেরই হয়ে থাকে, তা সবই বরদাশ্‌ত করা, অবশেষে জওয়ান হওয়ার পর গ্রেফতার হওয়া এবং ক্রুশবিদ্ধ হওয়া, – এ সবই জঘন্য শির্‌ক বা অংশীবাদিতা। এর মাধ্যমে মানুষকে খোদা বানানো হয়েছে। খোদা এথেকে সম্পূর্ণ পবিত্র যে, তিনি মানবীর পেটের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবেন, দেহ প্রাপ্ত হবেন এবং দুশমনের হাতে গ্রেফতার হবেন। মানব-স্বভাব এটা স্বীকার করতে পারে না যে, খোদার উপরে ইত্যাকার দুঃখ নেমে আসে, মুসিবত পতিত হয়; এবং যিনি স্বয়ং সকল মাহাত্ম্যের অধিপতি এবং সকল মান-মর্যাদার উৎস–প্রস্রবণ, তিনি নিজের প্রতি এই সব অবমাননা ও জিল্লতি মেনে নেন। খৃষ্টানরা এটা স্বীকার করে যে, খোদার উপরে এই সব কষ্ট ও অসম্মান এটাই প্রথম, ইতোপূর্বে খোদা আর কখনও এরূপ জিল্লতি বা অমর্যাদার সম্মুখীন হননি। কখনই এমন ঘটনা আর ঘটেনি যে, খোদাও মানুষের মত স্ত্রীলোকের গর্ভাশয়ে বীর্যের ভেতরে নিহিত থেকে পূর্ণতা লাভ করেছেন। যখন থেকে মানুষ খোদার নাম শুনেছে, কখনই এমন ঘটেনি যে, তিনিও মানুষের মতই কোন স্ত্রীলোকের

গর্ভে জন্মলাভ করেছেন। এ সবই হচ্ছে সেই সমস্ত কথা যা খৃষ্টানরা নিজেরাই স্বীকার করে, বিশ্বাস করে। এবং এই কথাও তারা স্বীকার করে যে, প্রথমে এই তিন অংশীদার তিন পৃথক পৃথক দেহধারী ছিল না, কিন্তু এই বিশেষ যুগে, যার ১৮৯৬ বৎসর এখন যাচ্ছে, এই তিন অংশীদারের জন্য তিনটি দেহ নিরূপিত করা হয়েছে। পিতার আকৃতি তো তা-ই, যা আদমের। কেননা, তিনি আদমকে তাঁর নিজের আকৃতি দিয়েই সৃষ্টি করেছেন – (দ্রঃ আদি পুস্তক ঃ ১.২৭)। এবং পুত্র আকৃতি প্রাপ্ত হন যীশুর (যোহন - ১.১)। এবং 'পবিত্র আত্মা' কবুতরের আকৃতি লাভ করে – (মথি ঃ ৩.১৬)। . . .

এই তিন দেহধারী খোদা, খৃষ্টানদের ধারণা মতে, সর্বদাই অভিন্ন দেহধারী এবং ভিন্ন ভিন্ন দেহধারীও বটেন। আবার এই তিন একত্রে এক খোদা। কিন্তু, কেউ যদি বলতে পারেন তো আমাদেরকে বলে দিন যে, স্থায়ীভাবে একস্থিত এবং ভিন্ন ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও, এই তিন কী করে এক হয় ? বেশ তো, আমাদেরকে কেউ ডঃ মার্টিন ক্লার্ক এবং পাদ্রী এমাদ উদ্দীন এবং পাদ্রী ঠাকুর দাসকে, তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন দেহ ধারী হওয়া সত্ত্বেও, তাদেরকে এক দেহধারী করে দেখিয়ে দিন না ? আমরা দাবী করে বলতে পারি যে, যদি তিনও জনকে কেটে কুটে একজনের হাড়-মাংস আর একজনের হাড়-মাংসের সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়, তবু যাদেরকে খোদা তিন করে বানিয়েছিলেন, তারা কোনক্রমেই এক হতে পারবেন না। অতএব, যখন এই নশ্বর দেহধারী প্রাণীকেও, তাদের ভিন্ন ভিন্ন দেহকে একত্রে মেশাবার পরেও, তারা এক হতে পারে না ; তখন যার মধ্যে মিশ্রণ ও ভিন্নতা বৈধ নয়, তা খৃষ্টানদের বিশ্বাস মতে কী করে এক হতে পারে ?

একথা বলা অসঙ্গত হবে না যে, খৃষ্টানদের এই তিন খোদা একটি তিন-মেম্বর কমিটির ন্যায়। এবং তাদের ধারণা মতে, প্রত্যেকটি আদেশ এই তিন-এর সর্বসম্মতিক্রমে জারি করা হয়, কিংবা মেজরিটি ভোটে জারি করা হয়, যেন খোদায়ী এক প্রকারের গণতান্ত্রিক সরকার। এবং গড (God) সাহেবেরও যোগ্যতা নেই যে, তিনি একাই রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। এবং তিনি কাউন্সিল-এর সিদ্ধান্তের উপরই নির্ভরশীল। সংক্ষেপে, এই হচ্ছে খৃষ্টানদের সেই মিশ্রিত খোদা, যে দেখতে চায় সে দেখে নিক।' – (আঞ্জামে আথম, পৃ. ৩৪–৩৬)।

(৭০)

'খৃষ্টধর্ম তৌহীদ থেকে রিক্তহস্ত এবং বঞ্চিত। বরং ঐ সকল লোক সত্য খোদা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজেদের জন্য এক নতুন খোদা বানিয়ে নিয়েছে, যে কিনা একজন ইসরাঈলী স্ত্রীলোকের পুত্র। কিন্তু, তাদের এই নতুন খোদা কি সেই রকম শক্তিমান, যেমন শক্তিমান আসল খোদা ? এই প্রশ্নের ফয়সালার জন্য

সাক্ষী তাঁর (যীশুর) নিজের ইতিহাস। কেননা, তিনি যদি শক্তিমান হতেন তাহলে ইহুদীদের হাতে মার খেতেন না। রোমান সালতানাত বা সরকারের কাছে তাঁকে সোপর্দ করাও যেত না। এবং ক্রুশেও তাঁকে বিদ্ধ করা যেত না। এবং যখন ইহুদীরা বলে ছিল যে, ক্রুশ থেকে নিজে নিজে নেমে এলে তারা তৎক্ষণাৎ ঈমান আনবে, তখন তৎক্ষণাৎ-ই তিনি নেমে আসতেন। কিন্তু, তিনি কোন অবস্থায়ই তাঁর শক্তি প্রদর্শন করেন নি, তাঁর মো'জেযা বা অলৌকিক ক্রিয়া তো দূরের কথা। অতএব, এটাই প্রমাণিত যে, তাঁর মো'জেযা অন্যসব নবীগণের মো'জেযার তুলনায় নিতান্তই স্বল্প ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি কোন খৃষ্টান ইলিয়াস নবীর মো'জেযা – যার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে বাইবেলে, এবং যার মধ্যে মৃতকে জীবিত করার কথাও আছে, – তার সঙ্গে মসীহ্ ইবনে মরিয়ম-এর মো'জেযার তুলনা করে, তাহলে তাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, ইলিয়াস নবীর মো'জেযাগুলি মর্যাদায় ও শক্তিতে ও সংখ্যায় মসীহ ইবনে মরিয়মের মো'জেযাগুলির চাইতে অনেক বেশী উন্নত ছিল।

হ্যাঁ, ইঞ্জিল বা সুসমাচারগুলিতে বার বার এই মো'জেযার উল্লেখ করা হয়েছে যে, যীশু মৃগী রোগীদের থেকে অশুভ আত্মা বের করে ফেলতেন। এবং এটাকে তাঁর একটা বড় মো'জেযা বলে গণ্য করা হয়। যা কিনা গবেষকদের কাছে একটা হাস্যকর ব্যাপার মাত্র। ইদানিংকালের গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, মৃগী মস্তিষ্কের কোন দুর্বলতার কারণে হয়, আবার কখনো কখনো মস্তিষ্কের কোন ক্ষতের কারণে হয়, কিংবা অন্য কোন রোগ থেকেও এই রোগ দেখা দেয়। কিন্তু, কোন গবেষকই একথা বলেননি যে, অশুভ আত্মা বা প্রেতাত্মার প্রভাবেও এই রোগের সৃষ্টি হয় . . . . মসীহ্-এর কোন মো'জেযায় কিংবা তাঁর জন্মের বিষয়টিতে এমন কোন অলৌকিকত্ব নেই যে, তার দ্বারা তাঁর খোদায়ী প্রমাণিত হয়। এই বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্যেই খোদাতায়ালা মসীহ্-এর জন্মের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ইয়াহ্ইয়া-এর জন্মের কথাও উল্লেখ করেছেন, যাতে করে সাব্যস্ত হয় যে, ইয়াহ্ইয়ার অস্বাভাবিক জন্মগ্রহণ করাটা তাকে মানুষ ছাড়া অন্য আর কিছু করেনি। তেমনিভাবে মসীহ্ ইবনে মরিয়ম-এর জন্মও তাঁকে খোদা বানায় নি। . . . . মসীহ্-এর কোন অতি-প্রাকৃতিক বা অলৌকিক শক্তি ছিল না। তিনি একজন দুর্বল মানুষই ছিলেন। মানবীয় দুর্বলতা ও অজ্ঞতাও ছিল তাঁর মধ্যে। ইঞ্জিল থেকেই জানা যায় যে, তাঁর গায়েব বা অদৃশ্যের কোন জ্ঞান ছিল না। কোননা, তিনি একটি ডুমুরের গাছের তলায় গিয়েছিলেন ফল খাবার জন্য, তিনি জানতেন না যে, ঐ গাছে কোন ফল নেই। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, কেয়ামত-এর খবর আমার জানা নেই। কাজেই, তিনি যদি খোদা হতেন, তাহলে নিশ্চয়ই

তিনি কেয়ামতের খবর জানতেন। একই ভাবে খোদায়ীর কোন গুণ-ই তাঁর মধ্যে ছিল না। এমন কোন কিছুই তাঁর মধ্যে ছিল না, যা অন্য কারো মধ্যেই পাওয়া যায় না। খৃষ্টানরা স্বীকার করেন যে, তিনি মারাও গিয়েছিলেন। আহা ! কত হতভাগা ঐ জাতি যাদের খোদা মারা যায় ! এই কথা বলা যে, পুনরায় তিনি জীবিত হয়েছিলেন, কোন সান্ত্বনার কথা হতে পারে না। যে মরে গিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, সে মারা যেতে পারে, তার আর জীবনের কি বিশ্বাস ?'

– (নসীমে দাওয়াত, পৃ. ১৭–২১)

(৭১)

'এমন খোদা কোন কাজে লাগবে, যে কিনা একজন মানুষের মতই বৃদ্ধ হয়ে যায় এবং তার যাবতীয় শক্তি বেকার হয়ে যায় ; কিংবা দীর্ঘ কাল অতিবাহিত হওয়ার কারণে তার সকল শক্তি অকেজো হয়ে পড়ে ! তাছাড়া, সেই খোদা দিয়ে কি হবে, যাকে খুঁটির সাথে বেঁধে দোর্রা না মারা পর্যন্ত, মুখের উপরে থু থু না ছিঁটা পর্যন্ত, এবং কিছুদিন হাজতে না রাখা পর্যন্ত এবং আখেরে ক্রুশে না লটকানো পর্যন্ত, তার নিজ বান্দাদের পাপ ক্ষমা করতে পারে না ? আমরা তো এই ধরনের খোদার উপরে খুবই অসন্তুষ্ট, যার উপরে ইহুদীদের ন্যায় একটা লাঞ্ছিত জাতি যারা শাসন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল তারাই বিজয় লাভ করেছিল! আমরা সেই খোদাকেই সত্য খোদা জানি যিনি মক্কার এক গরীব ও অসহায়কে নিজের নবী বানিয়ে আপন শক্তি ও বিজয়ের প্রখর জ্যোতিঃ প্রদর্শন করেছিলেন সেই যামানাতেই সারা জগতময়। এমন কি যে, যখন ইরানের সম্রাট আমাদের নবী সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামকে গ্রেফতার করার জন্য সৈন্য পাঠিয়েছিল, তখন সেই সর্বশক্তিমান খোদা তাঁর রসূলকে বলেছিলেন, সৈন্যদেরকে বলে দাও যে, আজ রাতে আমার খোদা তোমাদের খোদাকে হত্যা করেছেন।

এখন লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে, একদিকে এক ব্যক্তি খোদায়ীর দাবী করছে, এবং তার পরিণাম ফল এটাই হচ্ছে যে, রোমান সরকারের একজন সিপাই তাকে গ্রেফতার করে দু'ঘন্টার মধ্যে জেলখানায় বন্দী করছে ; এবং তার সারা রাত্রির দোয়াও কবুল হচ্ছে না। অপরদিকে, সেই এক ব্যক্তি যিনি শুধু রসুল হওয়ার দাবী করছেন, এবং খোদা তার প্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাটদেরকে ধ্বংস করে দিচ্ছেন। সত্যান্বেষীর জন্য প্রযোজ্য একটি খুব সহায়ক প্রবাদ হচ্ছে ঃ 'ইয়ারে গালেব শূ কে তা গালেব শূআ' – অর্থাৎ বন্ধুত্ব করতে হলে বিজয়ীর সঙ্গেই করো, যাতে তুমিও বিজয়ী হতে পার। আমরা সেই ধর্ম দিয়ে কি করবো, যে ধর্ম

মৃত। আমরা সেই কিতাব থেকে কী ফায়দা উঠাব, যে কিতাব মৃত। এবং সেই খোদা আমাদেরকে কী কল্যাণ, কী আশিস দান করবে যে খোদা মৃত ?' – (চশমা মসীহি, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ২১–২৩)।

(৭২)

'যে বিষয়ের দিকে তারা আহ্বান জানায়, তা অত্যন্ত নীচ ধারণা, এবং অত্যন্ত লজ্জাষ্কর আকিদা বা ধর্মবিশ্বাস। কেন, এই কথা কি যুক্তি-বুদ্ধির আলোকে গ্রহণযোগ্য যে, এক দুর্বল সৃষ্টি যার মধ্যে সমস্ত মানবীয় দুর্বলতাই বিদ্যমান – তাকে খোদা বলা যাবে ? যুক্তি কি একথা স্বীকার করতে পারে যে, সৃষ্টি তার আপন সৃষ্টিকর্তাকে কোড়া মারে – বেত্রাঘাত করে, এবং খোদার বান্দা তাদের খোদার মুখে থু থু নিক্ষেপ করে এবং তাঁকে পাকড়াও করে, এবং তাঁকে ক্রুশে লটকায় ? এবং খোদা স্বয়ং খোদা হয়েও তাদের মোকাবেলা করতে অপারগ হয় ? কেন, এই কথা কি কেউ বুঝতে পারবে যে, এক ব্যক্তি খোদা দাবী করার পরও সারারাত প্রার্থনা করে, অথচ তার সেই সব প্রার্থনাও মঞ্জুর হয় না ? কেন, কোন হৃদয় কি এই কথায় সান্ত্বনা লাভ করতে পারে যে, খোদাও দুর্বল শিশুর ন্যায় নয় মাস ধরে পেটের মধ্যে থাকবে এবং হায়েজ-এর রক্ত খাবে, এবং অবশেষে চেঁচাতে চেঁচাতে স্ত্রীলোকের লজ্জাস্থান দিয়ে জন্মলাভ করবে ? কেন, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি একথা স্বীকার করতে পারে যে, খোদা এক অনন্ত এবং অনাদি কালের পর দেহ ধারণ করেছেন ? এবং তারই একটা অংশ মানুষের আকৃতি প্রাপ্ত হয়েছে, আর একটা অংশ কবুতরের ? এবং এই দেহগুলোর মধ্যে তিনি চিরকাল ধরে আবদ্ধ থাকবেন ?' – (কেতাবুল বারিয়া, পৃ. ৮৬, ৮৭)।

কবিতা থেকে উদ্ধৃতি

কত উদ্ভাসিত আলো সেই আলোসমূহের উৎসের
সমস্ত জগৎ হয়ে ওঠছে আয়না সকলের নয়নের।
চাঁদকে কাল দেখে দেখে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম,
কেননা, তার মধ্যে কিছুকিছু সৌন্দর্যের চিহ্ন ছিল প্রিয়তমের।

সেই সৌন্দর্যের বসন্তের আবেগের স্ফূরণ ছিল এ প্রাণে, তাই
তুর্ক কিংবা তাতার-এর উল্লেখ আর করোনা আমার কাছে।

হে প্রিতম ! তোমার অনন্ত শক্তির আশ্চর্য প্রকাশ দিকে দিকে,
যেদিকে তাকাই দেখি শুধু তোমারই সাক্ষাতের পথ।
সূর্যের প্রস্রবণের তরঙ্গে তরঙ্গে তোমারই আগমন,
নক্ষত্রে নীহারিকায় তোমারই ঝলকের খেলা।

তুমি আপন হস্তে প্রতিটি আত্মার উপরে লবন ছিঁটিয়ে দিয়েছ,
কোলাহল উঠেছে তাই, প্রেমিকগণের ভালবাসার।

আশ্চর্য এক বৈশিষ্ট্য রেখেছ তুমি প্রতিটি অণুতে পরমাণুতে
কে করতে পারে পাঠ ভরা-রহস্যের সেই গ্রন্থসমূহ !
তোমার কুদরত-এর সীমা তো কেউ পেতে পারে না,
কী করে উন্মোচিত হবে এই সব রহস্যের জটিল-গ্রন্থি!

সকল সুন্দরতায় দেখি তোমারই রূপের অপরূপ কান্তি,
প্রত্যেক ফুল ও ফুল-বাগিচায় দেখি তোমারই প্রাণময়তার রঙ,
প্রত্যেক সুন্দরীর নিমীলিত নয়নে তোমারই প্রতিবিম্ব,
প্রত্যেক কেশবতীর কুঞ্চিত কেশদামের ইঙ্গিত তোমারই প্রতি।

অন্ধদের চোখের উপরে শত শত পর্দা পড়েছে,
নইলে তুমিই তো ছিলে কিব্‌লা কাফের মু'মিন সবারই।

হে প্রিয়তম ! তোমার প্রেমের চাউনী যেন শাণিত কৃপাণ
তাতে কাটা পড়ে তাবৎ পরকীয়া টানের চেতনা।

তোমার মিলনের তরে আমি মাটিতে মিশে গেছি
এতেও যদি বা কিছু উপশম হয় বিরহের যন্ত্রণার।

তোমাকে ছাড়া তো আমার একটি মুহূর্তও কাটে না
আমার প্রাণ নিভে নিভে যায়, যেমন রোগীদের চেতনা নিভে যায়।

তোমার গবাক্ষপথে ও কিসের কোলাহল ? শীঘ্র খবর নাও,
পাছে খুন না হয়ে যায় ওখানে কোন প্রেমের দিওয়ানা!
(সুরমা চশম আরিয়া, পৃ. ৪, মুদ্রণ ১৮৮৬)

(দুই)

'নেহী মাহ্ছুর হরগেজ রাস্তা কুদরত নুমাঈ কা,
খোদা কি কুদরতুঁ কা হছর, – দাওয়া হ্যায় খোদায়ী কা'।

কুদরত প্রদর্শনের পথ কখনই বিচ্ছিন্ন হয়নি,
খোদার শক্তিসমূহের ছিন্নতা, দাবী সে তো খোদায়ীরই।

(তিন)

'কুদরত ছে আপনি জাত কা দেতা হ্যায় হক্ ছবুত,
উছ বে-নিশাঁ কি চেহ্‌রা নুমায়ী এহী তো হ্যায়।
যেছ বাতকো কহে কে করোঙ্গা ই'য়ে ম্যায় জরুর,
টল্‌তি নেহী উওহ বাত খোদায়ী এহী তো হ্যায়'॥

শক্তি দ্বারা আপনার অস্তিত্বের প্রকাশ্য প্রমাণ দিয়ে থাকে,
সেই নিরাকারের চেহারার দর্শন তো এটাই।
যে বিষয়ে বলে সে করবো এ আমি অবশ্যই
টলে না সে কথা কভু, খোদায়ী তো এটাই।

(চার)

ওয়াহেদ হ্যায় লা-শারীক হ্যায় আওর লা-যওয়াল হ্যায়,
সব মউত কা শেকার হ্যায় উছকো ফানা নেহী।

একই তিনি অংশীবিহীন এবং অবিনশ্বর ;
সবই মৃত্যুর শিকার শুধু লয়হীন সে-ই নিরন্তর।

(পাঁচ)

যা কিছু আমার ছিল তা সবই হয়েছে এখন প্রিতমের,
হয়েছি এখন আমি প্রিতমের, প্রিতম হয়েছে আমার।
সেই, আল্লাহ্‌র শোকর ! আমি পেয়ে গেছি সেই মুক্তো অতুল,
আমার কি তাতে ? যদি হয় জাতির হৃদয় পিন্ডুলী হিংসার ?
– (ইযালা আওহাম, পৃ. ৩৫৮)

(ছয়)

প্রশংসা গীতি তাঁরই তরে যিনি সত্তা-চিরন্তন ;
তাহার সমান কেহ নাই আর, আমি তাঁর সন্ধানী
সবই হয় লয়, তিনি সর্বদা আছেন বিলক্ষণ
অপরের সনে মন দেয়া নেয়া মিথ্যা কাহিনী জানি।
সবাই তো পর কেবল তিনিই প্রাণের আপন জন,
তাই এ হৃদয়ে সুর জাগে 'তাঁরই সুব্‌হানা মাঁইয়ারানী'।

পবিত্র জানি পাক-কুদরত মাহাত্ম্য তাঁরই মাহাত্ম্যে মহীয়ান
সন্নিধানে যে যায় সে-ও জানি অবীর ভয়েতে বিভল কম্পমান
রহমত তাঁর সার্বজনীন কী-ই বা জানাব তার তরে শোকরিয়া
আমরা সবাই তাঁরই তো সৃষ্টি ভালবাসি তাঁরে হৃদয় সমর্পিয়া
অন্যের সনে করো না প্রণয়, নইলে ক্ষুব্ধ হবে আত্মাভিমানী
এই দিন তুমি মুবারক কর 'সুব্‌হানা মাঁইয়ারানী'

(সাত)

আওয়াজ আসছে ফোনগ্রাফে বারে বারে
খোদাকে খোঁজ হে প্রাণের ভেতরে নহেক অহংকারে।

পাক-পবিত্র প্রাণের সাধনা হবে না যতক্ষণ
ততক্ষণ তা জেনে রাখো সবই মূর্তি-পরিক্রমণ।
হৃদয় যদি না বেরিয়ে আসে সে মুর্দা গিলাফ থেকে,
কী লাভ তাহলে ! মিথ্যার সনে যুদ্ধ বজায় রেখে।

সে ধর্মই বা কি ! যাহার মধ্যে খোদার নেশান নেই,
নেই সত্যের সমর্থন আর ঐশী-মদদ নেই।
ধর্ম সে এক খেলাই, যদি না দৃঢ় বিশ্বাস রয়।
নূর থেকে দূর ? খোদা থেকে সে তো আগত ধর্ম নয়।

ইলাহী ধর্ম সেটাই, যা সেই খোদাকে দেখিয়ে দেয়।
সেই ধর্মের প্রয়োজন কি যা গিরো না ছাড়িয়ে দেয় ?

ওসব লোকেরা খাঁটি মারফতে শূন্যই থেকে গেছে,
প্রতিমা ভেঙে ফের প্রতিমারই গোলাম রহিয়া গেছে।

(আট)

আস্তানাতে তোমার আমি কোন সে পথে আসবো বলো,
সেই সেবাই বা কিবা যাতে তোমার সনে মিল্‌বো বলো।

তোমারই প্রেম সেই তো যাহা টানছে আমায় দিবস যামী।
খোদায়ী তো তাহাই যাতে এই খুদীকে মিটাই আমি।

ভালবাসা কেমন ! তাহা কাহার কাছে বলবো আহা !
সমর্পণে কী রহস্য ! কেমন করে বুঝাই তাহা।

এই হৃদয়ের তুফান বলো কেমন করে থামাই আমি,
তার চে' বরং ধূলি হয়ে শীর্ষে তারই উড়াই আমি।

কোথায় আমি কোথায় জগৎ মাঝখানে দূর অন্তহীন
পবিত্র সে দুষমনে মোর বিনাশ করে রাত্রিদিন।

(দ্রঃ - উর্দূ দুর্রে সমীন)